প্রচলিত হিন্দুধর্ম্ম।

বা

বেদ, পুরাণ, দর্শনশাস্ত্র ও তন্ত্রসঙ্গত

হিন্দুর মত, পূজার্চ্চা, অবতার, সম্প্রদায়, জাতিভেদ

ইত্যাদির বর্ণনা।

POPULAR HINDUISM.

COMPILED BY

REV. P. THOMAS BISWAS.

C M S Divinity School

CHRISTIAN LITERATURE SOCIETY,

CALCUTTA.

PRINTED BY A. C. MOOKERJEE, AT THE POST DISPATCH PRINTING

WORKS, 22 OLD BOYTOKHANA 2ND LANE

1895

1st Edition 1000] [Price One Annas

প্রস্তাবনা।

খ্রীষ্টীয়ান প্রচারকদিগকে প্রতিদিন হিন্দুদিগের নিকট ধর্ম্ম-প্রচার ও তাহাদের সহিত আলাপাদি করিতে হয়; হিন্দুদিগের আচারব্যবহার, রীতিনীতি, পূজা, অর্চ্চনা, দেবদেবী, ইহ-লোক ও পরলোক বিষয়ক জ্ঞান ও বিশ্বাস সম্বন্ধে প্রচারক ও মিশনারীগণের বিশেষ অভিজ্ঞ হওয়া আবশ্যক; তৎসম্বন্ধে নিশ্চিত জ্ঞান না থাকিলে অনেক সময়ে প্রচারকার্য্যে বিশেষ ব্যাঘাত ঘটিয়া থাকে। ইংরাজি ভাষাজ্ঞ ব্যক্তিদের পক্ষে এই জ্ঞান লাভ করা অপেক্ষাকৃত সহজ। উপরোক্ত বিষয় সমূহ সম্বন্ধে স্যর মনিয়ার উইলিয়াম্‌স, অধ্যাপক ম্যাক্সমূলার, ডাক্তার মরে মিচেল, রেবরেণ্ড মর্ডক্ ও রেবরেণ্ড উইলকিন্স প্রভৃতি অনেক অনেক মহাত্মা বহুপ্রকার গ্রন্থ লিখিয়াছেন; তাঁহাদের প্রণীত গ্রন্থাদি পাঠ করিয়া নিশ্চয় প্রতীত হয়, ইংরাজ-গণ এদেশের রীতিনীতির বিষয় যতদূর অনুসন্ধান পূর্ব্বক জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, দেশীয় খ্রীষ্টীয়ানদের কথা দূরে থাকুক, অনেক শিক্ষিত হিন্দুও তাহা জানেন না। খ্রীষ্টীয়ান প্রচারকের সাহা-য্যার্থে হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধীয় একখানিও উৎকৃষ্ট বাঙ্গালা গ্রন্থ নাই। যে যে স্থানে পরমার্থবিদ্যালয় আছে, তথায় হিন্দুধর্ম্মের বিষয়ে যে সকল শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহা ইংরাজি পুস্তকের সাহায্যে প্রদত্ত হইয়া থাকে। এই অভাব বিদূরিত করণার্থে কলিকাতা কেথিড্রেল ধর্ম্মবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত রেবরেণ্ড ডবলিউ, এইচ, বল্ মহোদয় আমাকে বঙ্গভাষায় এরূপ একখানি গ্রন্থ সঙ্কলন করিতে উপরোধ করেন, ও যে কয়েকখানি গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া তাহা লিখিতে হইবে, তাহাও তিনি নির্দ্দেশ করিয়া দেন। আমি তাঁহার অনুরোধ পরবশ হইয়া উপরোক্ত মহাত্মা-দের গ্রন্থাবলী অবলম্বন করিয়া 'প্রচলিত হিন্দুধর্ম্ম' নামে এই পুস্তকখানি সঙ্কলন করিতে প্রবৃত্ত হই। কিন্তু হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধীয় বিষয় ১৮ অতি বিস্তৃত, তৎসমুদয় ক্ষুদ্রায়ত গ্রন্থের মধ্যে

নিবদ্ধ করা এমন দুরূহ ব্যাপার যে, তাহা প্রায় অসাধ্য; তথাপি যতদূর সম্ভব সমস্ত বিষয় ইহাতে সংক্ষেপে অথচ পরিষ্কাররূপে বর্ণনা করিতে প্রয়াস পাইয়াছি।

হিন্দুদের প্রধান ধর্ম্মশাস্ত্র বেদ, বঙ্গভাষায় অনুবাদিত হওয়াতে মহৎ কার্য্য সাধিত হইয়াছে; বেদ অসাধারণ গ্রন্থ, এক শ্রেণীর সম্পত্তি হইয়া থাকাতে সাধারণ লোকে তৎসম্বন্ধে নিতান্ত অন্ধকারাচ্ছন্ন ছিল। কিন্তু বেদ কি, তাহা এক্ষণে হিন্দু, অহিন্দু সকলেই জানিবার বিশিষ্ট উপায় প্রাপ্ত হইয়াছে। বর্ত্তমান হিন্দুধর্ম্মের সহিত বেদের কোন সম্পর্ক প্রায় নাই, বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু ধর্ম্মব্যবসায়ীগণ নিরস্ত নহেন; তাঁহারা বেদ, গীতা, কাব্য, পুরাণ সমস্তের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা কল্পনা করিতে নিরতিশয় ব্যস্ত হইয়াছেন, সরল-প্রকৃতির কৃষক ও পশুপালকদের সরলতাব্যঞ্জক গীত ও প্রকৃতি-পূজা বর্ত্তমান বিজ্ঞান-প্লাবিত জগতের সম্মুখে আর শোভা পায় না; তাহাতে ঘোরার্থ আরোপ না করিলে ঋত্বিকবৃন্দের আর গুরুত্ব রক্ষা হয় না। কু-অভিলাষ, নিষ্ঠুরতা ও বাল-স্বভাব-সুলভ যে সকল ঐতিহাসিক ঘটনা হিন্দুদের শ্লাঘার বিষয় ছিল, বর্ত্তমান পাশ্চাত্য শিক্ষা ও ধর্ম্মজ্যোতি-প্রকাশে তাহা নিতান্ত তুচ্ছ ও বৃদ্ধা স্ত্রীলোকের কথিত গল্পবৎ প্রতীয়মান হয়।

বর্ত্তমান হিন্দুধর্ম্ম কি অদ্ভুত পদার্থ, তাহা অল্প কথায় বলিবার যো নাই; তাহাতে একেশ্বরবাদ, বহু-ঈশ্বরবাদ, দ্বৈতবাদ, অদ্বৈতবাদ, নিরীশ্বরবাদ প্রভৃতি যত প্রকার 'বাদ' আছে, তাহার কিছুই বাদ পড়ে নাই। তাহাতে বৈদিক, দার্শনিক, পৌরাণিক, যাবনিক, বৌদ্ধ, জৈন, অসভ্য জাতীয় সকল মতই স্থানপ্রাপ্ত হইয়াছে—হিন্দুধর্ম্মরূপ 'জু'র মধ্যে সকলই সংগৃহীত হইয়াছে। আথেনীর রাজপথে ভ্রমণকারী পথিক তথাকার দেবতার সংখ্যা দেখিয়া বিস্মিত হইতেন; কিন্তু ভারতবর্ষ এ বিষয়ে গ্রীশ, মিসর প্রভৃতি প্রতিমা-পূজক সকল দেশকেই পরাস্ত করিয়াছে। ২৮ কোটী লোকের ৩৩ কোটী দেবতা, প্রত্যেকের নাম একবার-মাত্র উচ্চারণ করিতে গেলে মনুষ্যে পরিমিত

পরমায়ু পর্য্যাপ্ত হয় না। হিন্দু যে জাতির পূজনীয় যাহাকে পাইয়াছে, তাহারই কাছে মস্তক বিনত করিয়া আপনার দেব-শ্রেণীর মধ্যে স্থান প্রদান করিয়াছে। পরস্পর-বিরুদ্ধ মতগুলি একই ধর্ম্মের মধ্যে স্থানপ্রাপ্ত হইয়াছে, ইহা বড়ই আশ্চর্য্য; ধর্ম্মযাজকগণ ধর্ম্ম বলিয়া যাহা দিয়াছেন, ভাল মন্দ বিচার না করিয়া উপাসক শিষ্যমণ্ডলী আপত্তিশূন্য হইয়া দেববাণীরূপে তাহা গ্রহণ করিয়াছে। তাঁহারা এক্ষণে অনায়াসে অভিমান করিয়া বলিতে পারেন যে, হিন্দুধর্ম্ম কি সঙ্কীর্ণ? ইহাতে না আছে কি? সত্য বটে, হিন্দুধর্ম্ম বহুবিষয়ে চিন্তিত ও ব্যস্ত হইয়া একই আবশ্যক বিষয়—"উত্তম অংশ" বিষয়ে অজ্ঞান রহিয়াছে। আহা! হিন্দুগণ যেন আপনাদের ধর্ম্মের মূর্ত্তি ও আন্তরিক শোচনীয় অবস্থা দেখিতে পায়, পথপ্রদর্শকগণ যেন তাহাদিগকে প্রকৃত 'পথ, জীবন ও সত্যকে' প্রদর্শন করেন, ইহাই পুস্তক-সঙ্কলকের হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা।

সমস্ত পুস্তকখানি লিখিত হইলে পর রেবরেণ্ড বল সাহেব অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাহা আনুপূর্ব্বিক দেখিয়া স্থানে স্থানে সংশোধন করিবার পরামর্শ দিয়াছেন, এজন্য তাঁহার নিকট বিশেষ বাধিত হইয়াছি। আমার সঙ্কলিত হস্তলিপিখানি পরিদর্শনার্থে শ্রীযুক্ত রেবরেণ্ড সি, এন, বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে দিয়াছিলাম, তিনি বিশেষ যত্ন ও পরিশ্রমসহকারে ইহা দেখিয়া দিয়াছেন। তাঁহার বহুমূল্য পরামর্শে ইহার সঙ্কলনকার্য্যে আমার বিশেষ উপকার হইয়াছে, এজন্য তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি। শ্রীযুক্ত বাবু রাসবিহারী চক্রবর্ত্তী মহাশয় বিশেষ কষ্ট স্বীকার পূর্ব্বক সমস্ত প্রুফ সংশোধনকার্য্যে সাহায্য করিয়া আমার বিশেষ উপকার করিয়াছেন, তাঁহারও নিকট কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ রহিলাম।

চার্চ্চ মিশনারী সোসইটীর
ধর্ম্মতত্ত্ববিদ্যালয়, কলিকাতা,
মার্চ্চ ১৮৯৫

পি, টমাস বিশ্বাস।

সূচীপত্র।

প্রচলিত হিন্দুধর্ম্ম।

হিন্দুদের ধর্ম্ম স্বভাব।

হিন্দুগণ আপনাদের ধর্ম্মবিশ্বাস অনুসারে জগতের মধ্যে অতি ধর্ম্মপরায়ণ লোক ; এমন কি, তাহাদের সম্বন্ধে বলিতে পারা যায় যে, "তাহারা ধর্ম্মসঙ্গত ভোজন করে, ধর্ম্মসঙ্গত পান করে, ধর্ম্মসঙ্গত স্নান করে, ও ধর্ম্মসঙ্গত পাপ করে।" যাহা হউক, ধর্ম্মের প্রতি তাহাদের যে বিশেষ মনোযোগ আছে, তাহা সত্য। জগতে আমাদের জীবন অতি অল্পকালস্থায়ী, অতিশয় দীর্ঘজীবীর পক্ষেও ইহা সত্য। অশীতি বর্ষ বয়স্ক ব্যক্তি আপনার পশ্চাদ্দিগে দৃষ্টি করিয়া দেখিতে পান, তিনি অল্পদিবস পূর্ব্বে শিশুমাত্র ছিলেন। পক্ষান্তরে, আমরা যে অনন্তকালের দিক দ্রুতগতিতে ধাবিত হইতেছি, তাহা বিবেচনা করিয়া দেখ, যে কোন মুহূর্ত্তে আমরা সেই অনন্তে প্রবেশ করিতে পারি। যে ব্যক্তি এক দিনের মধ্যে আপনার তাবৎ ধন ব্যয় করিয়া নিঃস্ব হইয়া পড়ে, তৎপরে জীবনের অবশিষ্ট কাল ক্ষুধা সহ্য করিয়া যাপন করে, তাহাকে অজ্ঞান বলা ন্যায়সঙ্গত। যে ব্যক্তি আপন ক্ষণবিধ্বংসী শরীরের প্রতি মনোযোগী হইয়া অনন্তকালস্থায়ী আত্মার সুখদুঃখের প্রতি নিশ্চেষ্টভাবে জীবন যাপন করে, তাহাকে নিতান্ত মূর্খ ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে ?

ধর্ম্ম অনুসন্ধানের আবশ্যকতা।

ভাল মন্দ দুই প্রকার মুদ্রা আছে, কোন ব্যক্তি যদি পরিশ্রমের ফলরূপে মেকি টাকা প্রাপ্ত হয়, তাহার সঞ্চিত মেকি টাকা বহুসংখ্যক হইলেও বাস্তবিক তাহার কোন মূল্য নাই। মেকি টাকানির্ম্মাতা ব্যক্তিগণ ভাল টাকা বলিয়া তাহা চালাইয়া থাকে। তাদৃশ দুষ্ট মনুষ্যগণ স্বার্থের জন্য অজ্ঞান লোকদিগকে প্রবঞ্চনা করণার্থে মিথ্যাধর্ম্ম কল্পন করিয়াছে।

জগতের মধ্যে অনেক ধর্ম্ম আছে, ভারতীয় একটী প্রবাদে বলে, "যত মুনি তত মত।" ধর্ম্ম সকল পরস্পর বিরুদ্ধ, এক ধর্ম্মে বলে, একমাত্র ঈশ্বর আছেন ; অন্য ধর্ম্মে বলে, তেত্রিশ কোটী দেবতা আছেন। কেহ বলে, মানুষের আত্মা ঈশ্বরের অংশ ; অন্যেরা বলে, জীবাত্মা সম্পূর্ণ বিভিন্ন। কোন ধর্ম্ম প্রতিমাপূজার অনুমোদন করে ; অন্য ধর্ম্মে তাহা নিষেধ করে। কোন ধর্ম্মে বলে, স্থানবিশেষে স্নান করিলে পাপ ধৌত হয় ; অন্য ধর্ম্মে বলে, তাহা নিষ্ফল। এইরূপ বিরুদ্ধ ধর্ম্মের সকল গুলিই সত্য হইতে পারে না। তবে কোন্‌টী সত্য ধর্ম্ম, তাহা পরীক্ষা করা আমাদের কর্ত্তব্য।

অনেকে বিনা অনুসন্ধানে অন্ধবিশ্বাসের অনুবর্ত্তী হইয়া পূর্ব্বপুরুষদের ধর্ম্ম যাজন করে। সাংসারিক বিষয়ে তাহারা বুদ্ধিমান। কেরাণী বেতনপ্রাপ্ত হইলে টাকাগুলি বেশ করিয়া গণিয়া বাজাইয়া দেখে, পাছে তাহাদের মধ্যে কোন মেকি টাকা থাকে। স্ত্রীলোকে বাজারে গিয়া একটী হাঁড়ি কিনিতে হইলেও তাহার মূল্য দিবার পূর্ব্বে বেশ করিয়া বাজাইয়া লয়। কিন্তু ধর্ম্ম সম্বন্ধে লোকে গড্ডলিকা-প্রবাহ ন্যায়ের অনুসরণ করে। কষ্টিপ্রস্তর-দ্বারা ভাল মন্দ মুদ্রার পরীক্ষা হয়। ভাল মন্দ ধর্ম্ম পরীক্ষা করিবার জন্য ঈশ্বর আমাদিগকে জ্ঞানরূপ কষ্টিপ্রস্তর দিয়াছেন, তাহা ব্যবহার না করিলে, আমাদিগকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে। পূর্ব্বপুরুষদের ধর্ম্ম সত্য বা মিথ্যা, গ্রহণযোগ্য কি না, যাহারা তাহা পরীক্ষা করিতে চাহে, এই পুস্তক তাহাদের সাহায্যার্থে লিখিত হইল।

হিন্দুদিগের ধর্ম্ম।

ভারতে শতাধিক জাতি বাস করিতেছে ; যে সকল লোকে ব্রাহ্মণদের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার পূর্ব্বক জাতিভেদের নিয়ম-পালন করিতে বাধ্য, হিন্দুধর্ম্ম সেই সকল জাতির ধর্ম্মবিশ্বাসের মিশ্রণ হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছে। "হিন্দুদিগের ধর্ম্ম যে এক," এই মতের বিরুদ্ধে মান্দ্রাজের চেন্সালরাও লিখিয়াছেন, "হিন্দুধর্ম্মের মধ্যে যে সকল বিভিন্ন প্রকার মতসংগ্রহ রহিয়াছে, তাহা বাস্তবিক

জগতের ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মের ন্যায় সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। ফলতঃ, হিন্দু-ধর্ম্মের কোন শিক্ষা একেশ্বরবাদ, কোন শিক্ষা নিরীশ্বরবাদ, কোন শিক্ষা সর্ব্বময়-ঈশ্বরবাদ বা অদ্বৈতবাদ, কোনটী বা বহু-ঈশ্বরবাদ; প্রকৃত পক্ষে হিন্দুধর্ম্মকে সর্ব্ব-ধর্ম্ম-সংগ্রহ বলা যায়।"

সকল প্রকার ধর্ম্মবিশ্বাস ও কার্য্য হিন্দুধর্ম্মের মধ্যে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহার মধ্যে নাস্তিকতা, ভূতপ্রেতের পূজা, মন্ত্রের ব্যবহার প্রভৃতি সকলই প্রচলিত রহিয়াছে।

মহাত্মা স্যর ল্যাল হিন্দুধর্ম্মকে সততচঞ্চল অসীম সমুদ্রের সহিত তুলনা করেন, তাহা অমূলক বিশ্বাস ও কল্পনাপ্রসূত মতরূপ বাত্যা নিপীড়িত হইয়া সতত ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হইতেছে।

আমরা বর্ত্তমান প্রচলিত হিন্দুধর্ম্ম লইয়া প্রথমে আলোচনা করিব। ইহাকে রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ ও তন্ত্রসঙ্গত ধর্ম্ম বলিয়া বুঝিতে হইবে। অন্যূন ২০ কোটী হিন্দু অর্থাৎ হিন্দুদের শতকরা ৯৯ জন এই প্রণালীর হিন্দুধর্ম্ম-পালন করিয়া থাকে। স্ত্রীলোকেরা সকলেই এই ধর্ম্ম-প্রণালী মান্য করে ও আপনাদের সন্তানবর্গকে তদনুসারে শিক্ষিত করিয়া থাকে। এই ধর্ম্ম-প্রণালীর মধ্যে আদিম-নিবাসীদের কুসংস্কারগুলিও বিবেচিত হইবে।

প্রচলিত হিন্দুধর্ম্ম।

"হিন্দু" নামক দক্ষিণ ভারতবর্ষের একখানি সুপ্রসিদ্ধ পত্রিকা সামাজিক ও ধর্ম্ম সংস্কার সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন—

"খ্রীষ্টীয়ান দেশ সমূহের ন্যায় আমাদের দেশেও নৈতিক ও ধর্ম্মভাব সকল আমাদের ঐশীতত্ত্ব হইতে উৎপন্ন; কিন্তু এই ঐশীতত্ত্ব ও ধর্ম্মভাব সমূহ বিশেষ প্রকারে ব্যাখ্যাত, পরিবর্ত্তিত ও সংশোধিত করা বিধেয়, অন্ততঃ সমাজের জ্ঞান ও বুদ্ধিবৃত্তি কালানুসারে যেরূপ উন্নত ও মার্জ্জিত হইয়া আসিতেছে, তদনুসারে ধর্ম্মসংস্কারের প্রয়োজন হইয়াছে। সুস্পষ্ট নীতিবিরুদ্ধ গর্হিত মত পুরাণে আছে বলিয়া শিক্ষিত হিন্দু-যুবকের নিকটে

উহার যথার্থতা প্রতিপাদন করা আর সম্ভব বোধ হয় না। হিন্দু-দেবদেবীর ইতিহাস-মধ্যে যে সকল কুসংস্কার ও অজ্ঞানতা-জনিত অসত্য কালক্রমে প্রবেশ করিয়াছে, তাহা সংশোধন করা আবশ্যক। এইরূপে আমাদের সাধারণ লোকদের নৈতিক বোধের উন্নতি হওয়া প্রয়োজন। পাকা হিন্দু মিথ্যাকথা, ভীরুতা, আত্ম-অবনতির অনায়াসে অনুমোদন করিবে, কিন্তু সমাজের প্রচলিত রীতি-পদ্ধতির কিঞ্চিৎ-মাত্র পরিবর্ত্তন করিলে, তাহা মহাপাতক জ্ঞানে দণ্ডিত করিয়া থাকে। এইরূপ নীতিবিরুদ্ধ ভাব সমাজের সজীবতাজ্ঞাপক নহে। তাদৃশ, আমাদের সৎকার্য্য, সামাজিক পার্থক্য, শিক্ষা ও সামাজিক উন্নতি পূর্ব্বকাল প্রচলিত ব্যবহার-সঙ্গত না হইয়া বরং বর্ত্তমান-কালের অনুরূপ সজীবতা সম্পন্ন হওয়া উচিত।"—জুন ১৮৮৭।

উপরোক্ত প্রস্তাবটি যে, সকল বুদ্ধিমান হিন্দুর অনুমোদনীয়, তাহাতে সন্দেহ নাই।

হিন্দুধর্ম্মের মধ্যে কিছু কিছু সত্য আছে, তাহা আনন্দ-সহকারে স্বীকার করি। ইহার ধর্ম্মগ্রন্থাবলীর মধ্যে উন্নত নীতিও বাছিয়া বাহির করা যায়। স্যর মনিয়ার উইলিয়মস্ "ভারত বিজ্ঞান" (Indian Wisdom) নামধেয় তদ্বিষয়ের একখানি উপাদেয় গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। ৺ডাক্তার জন মিউর সাহেবের 'সংস্কৃত লেখকগণের কাব্য অনুবাদ' নামক গ্রন্থও এই ধরণের পুস্তক, তাহার কোন কোন অংশ বহুমূল্য শিক্ষাপ্রদ। কিন্তু ইহা স্বীকার্য্য যে, হিন্দুদের পবিত্র গ্রন্থাবলীর মধ্যে ভ্রান্তি-সঙ্কুল সাতিশয় অনিষ্টকর শিক্ষা বহু-পরিমাণে রহিয়াছে, তদ্দ্বারা মানসিক, সামাজিক, নৈতিক ও ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় বিশেষ অনিষ্ট সাধিত হইতেছে। অতএব সংশোধনকারিদের এরূপ লক্ষ্য হওয়া উচিত যে, যাহা কেবল সত্য, তাহাই রাখিয়া সমস্ত মিথ্যা পরিহার্য্য বলিয়া যে কোন মূল হইতে হউক, যাহা ভাল, তাহা গ্রহণ করিতে হইবে। যদি কোন গৃহনির্ম্মাতা একটী সুবৃহৎ প্রাচীন গৃহ পরীক্ষা করিতে নিযুক্ত হয়, তবে সে একে একে তাহার সমস্ত অংশ পরীক্ষা করিয়া প্রত্যেক ভাগে কি করা

বিহিত, তাহা নিরূপণ করে, ও গৃহের সকল অংশের জীর্ণতা ব্যক্ত করে; সে তাহা ব্যক্ত না করিলে তাহার পরীক্ষা করণের কোন ফল হয় না। তাদৃশ হিন্দুধর্ম্ম সংস্কার করিতে হইলে যে সকল ভ্রষ্টতা হইতে তাহার মুক্ত হওয়া আবশ্যক, তাহা ব্যক্ত করা নিতান্ত প্রয়োজন।

হিন্দুধর্ম্মের প্রধান প্রধান অঙ্গ সমূহ ও তাহাতে যে সকল সুস্পষ্ট মন্দ বিষয় সকল রহিয়াছে, তাহাও এই পুস্তকে সংক্ষেপে দেখান হইবে।

বারাণসীর মহারাজার একটী পারিবারিক শ্লোক এই, "সত্যই শ্রেষ্ঠ উন্নত ধর্ম্ম।" স্বজাতির ভাল বা মন্দ প্রত্যেক বিষয়ই রক্ষা করিতে সচেষ্ট দেশহিতৈষী খ্যাত ব্যক্তি বাস্তবিক জাতীয় অনিষ্টসাধক ও প্রতারক, তাহার সন্দেহ নাই। সত্যানুসন্ধানই এরূপ পরীক্ষার লক্ষ্য হওয়া উচিত।

অনুসন্ধান আগাগোড়া হওয়া উচিত। কোন জীর্ণ ভবনের উপরিভাগ-মাত্র চূণকাম করিয়া বাসোপযোগী বলিয়া দেখান যাইতে পারে; কিন্তু যাহারা তাহাতে আশ্রয় গ্রহণ করে, প্রবল বাত্যা-প্রভাবে এক দিন তাহা তাহাদের পক্ষে সমাধি-ভবন বলিয়া গণিত হইবে।

ভারতবর্ষের নানা স্থানে প্রচলিত হিন্দুধর্ম্ম একরূপ নহে, দেবতা ও পূজার রীতি বিভিন্ন প্রকার দৃষ্ট হয়; তন্মধ্যে প্রসিদ্ধ গুলি বর্ণনা করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি।

ভূত-পূজা।

জগতের সর্ব্বাংশের অসভ্য জাতির মধ্যে ভূত-পূজা প্রচলিত আছে। ইহা আশিয়া মহাদেশের অধিকাংশ স্থানের প্রাচীন কুসংস্কার। সাইবিরিয়া হইতে সিংহল পর্য্যন্ত এই পূজা-পদ্ধতি অল্লাধিক পরিমাণে বিদ্যমান রহিয়াছে। ইহা পরাজয় করিতে বৌদ্ধ ধর্ম্ম হার মানিয়াছে। সিংহলবাসীগণ গৌতমের মত অপেক্ষা বহু পরিমাণে এই মতের অধীনস্থ। ব্রহ্মবাসী

উচ্চ-নীচ সর্ব্বসাধারণেই গোপনে ভূত-পূজাতে রত রহিয়াছে। এ বিষয়ে ভারতবর্ষের অবস্থা নিম্নে বর্ণিত হইতেছে।

ভারতবর্ষে প্রথমে অসভ্য জাতিগণ আসিয়া বাস করিয়াছিল; এখন পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের বনমধ্যে যে সকল জাতি বাস করে, তাহারা ইহাদেরই মত ছিল। বিজেতা আর্য্যদের অপেক্ষা তাহারা কৃষ্ণবর্ণ ছিল, তাহাদের ভাষা ও রীতিনীতি সম্পূর্ণ বিভিন্ন ছিল। কখন কখন তাহারা তমসাচ্ছন্ন নিশীথ সময়ে ঘোরতর উচ্চধ্বনি করত আপনাদের ভূসম্পত্তির অপহারকবর্গের উপর আক্রমণ করিত; এই সকল কারণে আর্য্যেরা তাহাদিগকে দানব নামে অভিহিত করিয়াছিল। কালক্রমে আর্য্য ও আদিম নিবাসীগণ বন্ধুভাবে পরস্পর মিলিত হইয়া গেলেও কাল্পনিক ভূতের ভয় মন হইতে বিদূরিত হইল না। সার মনিয়র উইলিয়ামস বলেন, "ভারতবাসিদের অধিকাংশ শৈশবাবস্থা হইতে শ্মশান ভূমিতে উপনীত হওয়া পর্য্যন্ত তাবৎ কাল ভূতাতঙ্কের পীড়ায় পীড়িত। ভূত, প্রেত, পিশাচ, দানব প্রভৃতি সর্ব্বদাই সকল স্থানে তাহাদের হিংসা ও বিপক্ষতা করণাভিপ্রায়ে; যাতনা, ক্লেশ, ক্ষতি, প্রদানার্থে; মহামারী, পীড়া দুর্ভিক্ষ, সঙ্কট উৎপাদনার্থে ও সকল প্রকার সৎকার্য্যে বিঘ্ন, হানি ও প্রতিবন্ধকতা সাধনার্থে নিরন্তর অপেক্ষা করিয়া রহিয়াছে। নিম্ন শ্রেণীর লোকের মনে মন্দাত্মার ভয় এত প্রবল যে, ভারতবর্ষের অনেক পল্লীর ঘরগুলি তাহারা দক্ষিণাভিমুখী করিয়া নির্ম্মাণ করিতে সাহস করে না, পাছে ভূতাত্মা সহজে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিতে পারিয়া তাহাদের অনিষ্ট সাধন করিতে সুবিধা পায়।"

লোকে ভাবে, অধিকাংশ ভূত অকালে বা অকস্মাৎ মৃত ব্যক্তিদের আত্মা, যাহারা জীবদ্দশাতে লোকদের উপর সচরাচর দৌরাত্ম্য করিত, তাহারা মরিয়া ভূত হইয়াছে। ত্রিবাঙ্কুরে এক জন বৃটিশ সৈনিক পুরুষ সাংঘাতিক আহত হইয়া প্রাণত্যাগ করেন, লোকে তাঁহার প্রেতাত্মার উপাসনা করিয়া থাকে। এমন কি, কোন মিশনরীর পত্নী পথে যাত্রার সময় ওলাউঠা

রোগে আক্রান্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করেন, তাঁহার মৃতশরীর কোন নির্জ্জন স্থানে সমাহিত করা হয়, লোকে তাঁহার পূজা করিতে আরম্ভ করিল; অগত্যা তাঁহার প্রোথিত শব তুলিয়া মাদ্রাজে আনিয়া সমাধিস্থ করিতে হইল।

লোকে বিশ্বাস করে যে, প্রসবান্তে পনর দিনের মধ্যে অশৌচাবস্থায় স্ত্রীলোকের মৃত্যু হইলে প্রেতিনী হইয়া নিকটে অবস্থান করে; অন্য প্রসূতিদিগকে সে পাইবে ভাবিয়া প্রসূতিগণ ভয়াকুলিত হয়।

স্যর মনিয়ার উইলিয়ামস এক স্থানে দেখিয়াছিলেন, লোকে এক জন গোপের প্রেতাত্মার উপাসনা করে, সে ব্যাঘ্রকর্ত্তৃক আহত হইয়া প্রাণ হারাইয়া তথায় ভূত হইয়া বাস করে। আর এক স্থানে এক জন কুম্ভকার মরিয়া ভূত হইয়া নিকটস্থ লোকের ভয়ের কারণ হইয়া উঠিয়াছে এইরূপে গোয়ালা ও কুম্ভকারেরা সেই সেই স্থানের লোকদের পুরোহিত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ত্রিচিন্নাপল্লীর জনৈক আত্মঘাতী দস্যু এমন বিখ্যাত ভূত হইয়াছে যে, লোকে আপনাদের শিশুদের নাম তাহার নামানুসারে রাখিয়া থাকে।

এই সকল ভূতাত্মাগণ মহা ক্ষমতাশালী, হিংসক ও বিঘ্নোৎপাদক, তাহারা শোণিত-মদ্য প্রভৃতি বলিদান ও বিশ্রী নৃত্যাদিপ্রিয়; কেহ ছাগ, কেহ বরাহ, কেহ কুক্কুটের বলিদান প্রয়াসী। পারিয়া ভূতগণ এইরূপ বলিদানের সঙ্গে সঙ্গে মদ্য পাইলে আনন্দিত হয়।

লোকে ভাবে, ভূতেরা বৃক্ষোপরি বাস করে, মনুষ্যের ন্যায় তাহারা শীতাতপ হইতে রক্ষিত হওনার্থে বৃক্ষাশ্রয় করিয়া থাকে। কোন কোন ভূত নির্জ্জন মরু প্রদেশে উর্দ্ধাধোস্থানে এদিকে ওদিকে ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়। কেহ বা নিবিড় ছায়াবৃত স্থানে লুকাইয়া থাকে। কখন কখন লোকে ভাবে, ভূতেরা গৃহমধ্যে বাস করে, ও দলের মধ্যে একটি, ভূতুড়িয়ার শরীর আশ্রয় করিয়া থাকে। কখন কখন ভূতে ভীরু লোকদিগকে ভয় দেখাইতে আনন্দিত হয়, অন্য কোন হানি করে না।

লোকে কখন বা রাত্রিতে কর্কশ শব্দ শুনিতে পায়, পরক্ষণেই প্রেতাত্মা প্রদীপ্ত-চক্ষু হায়েনা, বা কুকুর অথবা বিড়ালের বেশ ধারণ পূর্ব্বক পলায়ন করে, দেখিতে পাওয়া যায়। দিনের মধ্যে ও গ্রীষ্মকালে ঘূর্ণবায়ুর আকারে তাহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়, তখন তাহাদের গতির সম্মুখস্থিত শুষ্ক কাটি ও পাতা উর্দ্ধে উঠাইয়া তাহারা ক্রীড়া করিয়া থাকে।

নিদ্রিতাবস্থায় 'বুক চাপা' অবস্থাকে লোকে ভূতের কার্য্য জ্ঞান করে, ভূত নিদ্রিত ব্যক্তির বক্ষোপরি বসিয়া তাহার শ্বাসরোধ করিয়া থাকে।

দাক্ষিণ ভারতবর্ষে ভূত-পূজার দ্বিবিধ সার অঙ্গ, নৃত্য ও শোণিতযুক্ত বলিদানেব উপহার প্রদান। তৎসময়ে ভূত-নর্ত্তক এমন ভয়ানক পোষাক পরিধান করে যে, অজ্ঞান দর্শক তাহা দেখিয়াই ভয় করে; ঢোল, শিঙ্গা ও বিশেষরূপে ধনু নামক ভীষণ শব্দকারক যন্ত্রবাদন হইতে থাকে। এই শেষোক্ত যন্ত্র একটা বৃহদায়তন ধনু, তাহাতে ভিন্ন ভিন্ন আকারের অনেক গুলি ঘণ্টা সংযুক্ত থাকে, কয়েক জন মিলিয়া তাহা বাজায়, প্রত্যেক বাদক অন্য অপেক্ষা উচ্চধ্বনি করিতে সচেষ্ট হয়; অতএব এমন ভয়ানক কর্কশ শব্দে বাদ্য চলে যে, সহজেই বোধ হয়, তাহা ভূতদেরও কর্ণতৃপ্তিকর হইতেছে। প্রথমে মৃদুস্বরে বাদ্যধ্বনি হইতে থাকে, নর্ত্তক তৎসময়ে স্থিরভাবে দাঁড়ায়, অথবা নীরবে নড়িতে থাকে। বাদ্য ক্রমশঃ যতই দ্রুত হয়, নর্ত্তকও ততই উত্তেজিত হইয়া উঠে; কখন কখন সে আপনাকে আপনি কশাঘাত করিতে থাকে, অথবা ছিন্নমুণ্ড পশুর গলা স্বীয় মুখমধ্যে দিয়া তাহার রক্ত পান করিতে থাকে, অনন্তর ঘোররবে নাসিকাধ্বনি করিতে করিতে ও উন্মত্তভাবে লম্ফ দিতে দিতে চতুর্দ্দিকে ঘূরিতে আরম্ভ করে। তখন তাহাতে ভূত প্রবেশ করিয়াছে জানিয়া চারিদিকের লোক পীড়ার আরোগ্য-লাভ জন্য তাহার পরামর্শপ্রার্থী হয়, ও নানাবিধ উপহার তাহাকে প্রদত্ত হয়।

ভূতের ক্রোধ উপশমার্থে, অথবা তাহার ক্রোধ প্রযুক্ত যে

বিপত্তি ঘটিয়াছে, তাহা বিদূরিত করণার্থে বলিদান করা হইয়া থাকে। পিশাচ ভুতুড়িয়ার অথবা তাহার পুত্রের প্রাণ গ্রহণ করিতে চাহে; কিন্তু সামান্যরূপ ক্রিয়াকলাপ ও ভূতের প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও একটু গানদ্বারা তাহাকে সন্তুষ্ট করা যায় অথবা সে তৎপরিবর্ত্তে একটী ছাগের জীবন গ্রহণ করিয়াই তৃপ্ত হয়।

লোকে যেরূপ বিশ্বাস করে, সেরূপ অপকারকারী কোন প্রেতাত্মা নাই। অজ্ঞ পিতামাতারা আপনাদের সন্তানগণকে ভয় দেখাইবার জন্য যে সকল মিথ্যা কল্পনা করিয়া থাকে, ভূতের গল্পও তাহা ছাড়া আর কিছুই নয়। এইরূপ মিথ্যা ভয়ে হিন্দুদের মন সহজেই ব্যস্ত হয়।

ভূতপূজার অপকার।

ভূত-পূজা ও তাহার ক্রিয়াকলাপ লোকদের মন এত ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলে যে, যাহা তৎকালে উপকারী, তাহার প্রতি তাহাদেব মনোযোগ থাকে না। নাচে বা বলি-দানে বসন্ত-রোগাক্রান্ত কোন ব্যক্তিই আরোগ্যলাভ করিতে পারে না; সামান্য টিকা দেওয়ায় বিশেষ ফললাভ হয়, তৎ-প্রতি বরঞ্চ লোকের বিশেষ মনোযোগ করা মঙ্গলজনক। ওলাউঠা রোগেব সময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা, পরিষ্কার জল পান ও স্বাস্থ্যকর খাদ্যদ্রব্য ভোজন করা রোগ হইতে রক্ষিত হইবার বিশিষ্ট উপায়।

ভূতের উপাসনা করা মনুষ্যের পক্ষে অতিশয় অবনতির বিষয়; মনুষ্য ইহাতে ভূতের ন্যায় কলহপ্রিয়, জিঘাংসা-বৃত্তির বশীভূত ও তাহার ন্যায় স্বভাববিশিষ্ট হয়। একমাত্র ঈশ্বর পূজনীয়; তাঁহাকে দেয় সম্ভ্রম ভূতকে দেওয়া অতি গর্হিত কার্য্য, আপনাদের যথার্থ রাজাকে সম্ভ্রম না করিয়া যাহারা চোরের প্রতি সমাদর করে, ভূতোপাসকগণ ঠিক তাহাদের ন্যায়।

রক্ষক ও গ্রাম্য দেবতা।

লোকে বিশ্বাস করে, ভূত-প্রেতের কারণ যে সকল বিপদ ঘটে, রক্ষক দেবতারা তৎসমুদয় হইতে উদ্ধার করিয়া থাকেন। দেবতার বাসস্থান বা প্রতিরূপ কোন জীব বা স্থানকে গ্রাম্য-দেবতা বলিয়া লোকে পূজা করিয়া থাকে। অসভ্য আদিম-নিবাসিগণের মধ্যে এইরূপ পূজা প্রচলিত ছিল, অতঃপর ব্রাহ্মণেরা তাহা হিন্দুধর্ম্ম প্রণালীর অন্তর্ভূত করিয়া লইয়াছিল। সকল প্রকার ধর্ম্মপ্রণালী, রীতি ও ক্রিয়াকলাপ, কুসংস্কার প্রভৃতি হিন্দুধর্ম্মের অন্তর্গত করিয়া লওয়া ব্রাহ্মণদের চতুরতার পরিচায়ক, ইহা দ্বারা সকলের উপরে তাহারা আপনাদের প্রভুত্ব বিস্তার করিতে সক্ষম হইয়াছে।

ভারতবর্ষের প্রত্যেক গ্রামের ও প্রায় প্রত্যেক পরিবারের জন্য এক একটী রক্ষক দেবতা আছেন। তাহা বিশ্রীভাবে খোদিত বা গঠিত প্রস্তর বা কাষ্ঠবিশেষ; গ্রামের নিকটস্থ দেবতার জন্য নিরূপিত কোন স্থানে, কখন বা গৃহ-প্রবেশের দ্বার-দেশে লোকে এই দেবতা রাখিয়া থাকে। কখন কখন লোকে প্রস্তরের বা বৃক্ষের উপরে সিন্দুর দিয়া তাহাই দেবতা কল্পনা করিয়া লয়। নিম্নশ্রেণীর লোকে তাহাই প্রধান দেবতা বলিয়া পূজা করিয়া থাকে।

কখন২ দেখা যায়, লোকে একখানি প্রস্তরমাত্র লইয়া আপনা-দের গ্রামের দেবতা বলিয়া তাহার পূজা করিয়া থাকে। প্রস্তর-পূজা অতি প্রাচীনকালে প্রচলিত ছিল; ভাববাদী যিশায়াহের প্রায় ২৬০০ বৎসর পূর্ব্বে যিহুদীগণ যে, প্রস্তরের উদ্দেশে নৈবেদ্য উৎসর্গ করিত, তিনি তাহার উল্লেখ করেন। আরবীয় লোকেরা মহম্মদের পূর্ব্ব হইতে পাহাড় ও প্রস্তরের পূজা করিত; কাবার কৃষ্ণ প্রস্তর অদ্যাপি মুসলমানেরা অর্চ্চনা করিয়া থাকে।

আমেরিকার ইণ্ডিয়ান গোলাকৃতি কোন প্রস্তর দেখিলে কুড়াইয়া লয় ও আপনার গৃহের কিছু দূরে কোন একটী স্থানের তৃণাদি পরিষ্কার করিয়া তথায় প্রস্তরটী আপনার দেবতা বলিয়া

স্থাপন করে, ও তাহার উদ্দেশে তাম্রকূটের নৈবেদ্য উৎসর্গ করে ও বিপদমুক্ত হইবার জন্য তাহার কাছে প্রার্থনা করে। আমেরিকার কোন কোন অংশে তিন প্রকার প্রস্তরের পূজা হইয়া থাকে; প্রথমের পূজা সুফসলের জন্য, দ্বিতীয়ের, স্ত্রীলোকেরা যেন সকল বেদনা হইতে মুক্ত হয়; ও তৃতীয়ের, বৃষ্টিপ্রাপ্তির জন্য।

ভারতবর্ষের সকল স্থানেই প্রস্তরের পূজা প্রচলিত আছে, উপহারস্বরূপ তাহার উপরে সিন্দুব মাখান হইয়া থাকে। গ্রাম্য দেবতার কাছে, কোন মজুর প্রার্থনা করিতে গেলে এইরূপ বলে, "যদি তুমি আমাব অমুক কার্য্যে সাহায্য কর, তবে আগামী শনিবারে আমি তোমার উদ্দেশে এক পয়সার সিন্দুর নিবেদন কবিব।"

ষষ্ঠী।

ষষ্ঠী শিশু-রক্ষক দেবী, স্ত্রীলোকে তাহার উদ্দেশে মানত করিয়া নৈবেদ্য উৎসর্গ ও তাহাব পূজা করে। তাহার প্রতিরূপ একটা আগড়া প্রস্তরবিশেষ, তাহা মনুষ্য-মস্তকের ন্যায় বড়, কোন পবিত্র বৃক্ষের মূলে স্থাপিত থাকে।

আয়েনার।

আয়েনার শিব ও বিষ্ণুব পুত্ররূপে পরিচিত। দক্ষিণ ভারতবর্ষের চাষা লোকেরা তাঁহাকে আপনাদের ক্ষেত্র, ফসল ও পশুপালের রক্ষক জ্ঞান করে। যে সকল ভূত পীড়া ও শস্যাদি নাশক উৎপাত উৎপাদন করে, এই দেবতা তাহাদিগকে দূরীভূত করিয়া দেন। গ্রামের বাহিরে কোন নিকুঞ্জের মধ্যে সচরাচর আয়েনারের পবিত্র স্থান দৃষ্ট হয়। তাহার চারিদিকে মৃত্তিকানির্ম্মিত বিশ্রী আকারের ঘোটক নির্ম্মাণ করিয়া রাখে, সে গুলি বৃহদাকারের জীবিত ঘোড়ার ন্যায়; লোকে বিবেচনা করে, দেবতা তদুপরি চড়িয়া প্রহরী-কার্য্যে রত থাকেন। দেবতার দুই পত্নী উভয় পার্শ্বে আসীন থাকেন, তাঁহারা ভূত বিদূরিত করিতে বিশেষ পারদর্শী। আয়েনার ও তাঁহার স্ত্রীদের পূজাস্থানের নিকট দিয়া সন্ধ্যার পর কেহ যাতায়াত করে না; ক্ষেত্রের রক্ষাকার্য্যে

যখন এই দেবগণ ব্যস্ত থাকেন, তখন কোন লোক তাঁহাদের সম্মুখে পড়িলে ভূত বিবেচিত হইয়া নিহত হইবার অবস্থায় পতিত হয়।

পীড়া হইতে আরোগ্যলাভ করিলে অথবা কোনরূপ ধন-লাভ হইলে লোকে আয়েনারের পূজা স্থানে নূতন করিয়া মৃত্তিকার ঘোটক উপহার প্রদান করে, তাহা মানতের পূর্ণতা-প্রকাশক ধন্যবাদের উপহার। তৎকালে তাঁহার উদ্দেশে শূকর, ছাগ, মেষ, কুক্কুট বা অন্যবিধ জন্তুর রক্তপাত করিয়া দেবতার সন্তোষ সাধন করা হয়, কখন বা পক্ক খাদ্য ও তীব্র সুরার উপহারও প্রদান করা হয়।

হনুমান (বৃহৎ হনুধারী) দাক্ষিণাত্যে, মধ্যভারতে ও উত্তর ভারতের অনেক স্থানে সাধারণ গ্রাম্য দেবতা। জীবপূজার মধ্যে ইহার সম্বন্ধে বিশেষ বর্ণনা করা যাইবে।

মাতা দেবতা, আম্মা।

ভারতবর্ষের রক্ষক দেবতার প্রচলিত নাম 'মাতা,' দাক্ষিণাত্যে তাহাকে 'আম্মা' কহে। দেবীর ন্যায় দেবেরও নাম কল্পিত হইয়াছে, তাহারা ভূতের ক্ষমতা হইতে রক্ষা করিয়া থাকে। লোকে 'মাতার' পূজাতেই অধিক আসক্ত, তাঁহাকে অধিকতর শক্তিশালিনী ও কার্য্যকুশল জ্ঞান করে। নারী-হৃদয় প্রযুক্ত প্রার্থনা, তোষামোদ, নৈবেদ্যাদি দ্বারা অতি সহজে তাঁহার প্রসাদলাভ করা যায়; বিপত্তি হইতে মুক্ত করিতে মাতা সর্ব্বদা প্রস্তুত। কিন্তু তাঁহার প্রতি ভক্তিশীল না হইলে অথবা তাঁহার প্রাপ্য তাঁহাকে না দিলে তিনি অতি সহজে রাগান্বিতা ও প্রতিফলদায়িনী হইয়া অপকার করিতে প্রবৃত্তা হন।

কেবলমাত্র গুজরাট প্রদেশেই ১৪০ বিভিন্ন প্রকারের 'মাতা' আছেন, তদ্ভিন্ন আরও বহুতর প্রচলিত উপাস্য দেবী আছেন, তন্মধ্যে এক 'মাতার' নাম 'খোদিয়ার' অর্থাৎ অপকার। কোন প্রকার পীড়ার প্রাবল্য হইলে লোকে ভাবিয়া থাকে, দেবী খোদিয়ারকে নিয়মিত দিবসিক খাদ্য দেওয়া হয় নাই। এক 'মাতা' ওলাউঠা আনয়ন করেন, অন্য 'মাতা' তাহা নিবারণ

করেন। একজন কাশরোগ প্রদান ও নিবারণ করেন, কেহ বা ক্ষিপ্ত কুকুর শাসন করেন।

বসন্তরোগের দেবী-মাতা ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে নানা নামে পূজিতা হন। উত্তরাংশে তাঁহার নাম 'শীতলা দেবী' বা 'দেবী'; শীতলা শব্দের অর্থ, যিনি শীতল করেন। দক্ষিণ প্রদেশে তাঁহার নাম 'মরি-আম্মা' অর্থাৎ মৃত্যুর মাতা। সাধারণ লোকে বসন্তরোগকে 'আম্মার লীলা' কহিয়াথাকে, 'আম্মা রোগীতে লীলা করিতেছেন।'

চীনদিগেরও বসন্তরোগের একটী দেবতা আছে। ভূতপূর্ব্ব সম্রাটের যখন বসন্ত হইয়াছিল, তখন লোকে মহাসমারোহের সহিত পেকিন নগরস্থ রাজপথের উপর দিয়া বসন্তদেবের মূর্ত্তিকে বহন করিয়া বেড়াইয়াছিল, এমন কি, পীড়িত সম্রাটের গৃহমধ্যেও আনা হইয়াছিল। কিন্তু সম্রাটের মৃত্যুর পর দেবতার বিশেষরূপ লাঞ্ছনা করিয়া তাহার মূর্ত্তি চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া ফেলিয়াছিল।

অনেক স্থলে ব্রাহ্মণেরা স্থানীয় আম্মার প্রতিমূর্ত্তি কালীর প্রতিমূর্ত্তি দ্বারা প্রদর্শন করে। দক্ষিণে 'কালী আম্ম' ও 'মরি আম্মা' ওলাউঠার দেবী বলিয়া পূজিতা হয়। উত্তর প্রদেশে তৎসময়ে নূতন এক দেবী বলিয়া 'ওলাবিবির' পূজা হয়; ফাল্গুন মাস তাহার পূজার সময়।

এই সকল রক্ষাকারিণী দেবী নৈবেদ্য ও বলিদান প্রভৃতির দ্বারা নিত্য পূজিতা না হইলে, যে সকল উৎপাত হইতে তাহারা রক্ষা করিয়া থাকে, লোকে ভাবে, সেই সকল উৎপাত ঘটাইয়া তাহারা লোকের প্রাণনাশ করে। 'কালী আম্মা' ও 'মরি আম্মা' প্রভৃতি কোন কোন মাতা দুঃস্বভাব প্রেতিনী ভিন্ন আর কিছুই নয়।

বিশপ কল্‌ড্‌বেল বলেন, 'আম্মা ও মন্দাত্মাদের মধ্যে কোন বিশেষ পার্থক্য নাই, ভূতেরা যেমন উপাসকের শরীর ও মন আশ্রয় করে, আম্মারা সেরূপ আশ্রয় করে না, এইমাত্র প্রভেদ।

বসন্ত ও ওলাউঠা রোগে মৃত্যু সংখ্যা। ভারতবর্ষে এই কল্পিত বসন্তদেবীর বেদির উপরে বৎসরে বৎসরে প্রায় ২,৪০,০০০ লোকের জীবনোৎসৃষ্ট হয়; লোকে ভাবে, তিনি আমাদের জন্য এই রোগের বীজ ছড়াইয়া থাকেন। অজ্ঞান লোকেরা ভয় প্রযুক্ত আপন আপন সন্তানগণের টিকা দেয় না, তাহারা ভাবে, টিকা দিলে দেবীব ক্রোধে পড়িবে।

বসন্তরোগেব ন্যায় ওলাউঠা রোগেও প্রায় উক্ত সংখ্যক জীবন নষ্ট হয়; ইহা বাস্তবিক কোন দেবী বা পিশাচের কার্য্য নহে; ইহা নানাপ্রকাব পচা ময়লা হইতে উৎপন্ন বিষাক্ত বীজের ফল। টিকা দানে বসন্তবোগে যেমন ফললাভ হয়, ওলাউঠার নিবাবক এইরূপ কোন উপায় নাই, কিন্তু পরিষ্কাব পরিচ্ছন্ন অবস্থায় উত্তম খাদ্য, নির্ম্মল পানীয় জল, গরম কাপড়ের ব্যবহাব দ্বাবা অনেক পরিমাণে রোগ হইতে রক্ষা পাওয়া যায়।

মহামাবীর সময় রক্ষাকালীব পূজা দেওয়া অজ্ঞান লোকদের পক্ষে রক্ষার একমাত্র উপায়, তাহারা এমন বিবেচনা করে। শিক্ষিত লোকদেব কর্ত্তব্য, যেন তাঁহাবা অজ্ঞ লোকদেব এই কুসংস্কাব দূর কবিতে সচেষ্ট হন, টিকা দেওযাব প্রথা প্রচলিত করেন, নির্ম্মল জলের ব্যবস্থা করেন ও যাহাতে লোকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকে, তাহাব উপদেশ দেন।

ময়লাই বাস্তবিক 'মরি আম্মা' মৃত্যুর মাতা।

দেবরূপে পরিণত মানব।

পাঁচ শ্রেণীর মানুষ দেবতা হইয়া উঠিয়াছে, রাজা, যোদ্ধা, ব্রাহ্মণ, সাধু ও জ্ঞানী।

স্যর এ, সি, ল্যাল্ বলেন, "ভারতবর্ষে কোন মৃত ব্যক্তিব প্রতি সমাদর প্রদর্শন করিবার যে মূল কাবণ, তাহাই তাহাব দেবতারূপে পরিণত হইবার কারণ বলিয়া গণিত হয়। প্রথমতঃ কোন বিখ্যাত ব্যক্তির সমাধিস্থান নিরূপিত থাকে, তাঁহার

জন্মস্থান ও পিতৃকুলাদি নিকটবর্ত্তী প্রদেশে বিশেষরূপে পরিচিত। যদি নিজ গৃহে তাঁহার মৃত্যু ঘটিয়া থাকে, তবে তাঁহার আত্মীয়েরা তাঁহার উদ্দেশে একটী স্থান পবিত্র করে, তাহা আপনাদের অধিকারে রাখিয়া তাঁহার উদ্দেশে দত্ত উপহারাদি গ্রহণের অধিকারী হয়। লোকের বিশ্বাস মত ফল পাইলে উক্ত স্থান ক্রমশঃ বিখ্যাত হইতে থাকে। যদি উক্ত ব্যক্তি দেশভ্রমণ করিতে করিতে কোন পল্লীতে বা তীর্থস্থানে বাসস্থান নিরূপণ করেন ও আপনার কঠোর ব্রত ও দুঃখভোগ স্বীকার দ্বারা বিখ্যাত হইয়া উঠেন, অবশেষে সেই স্থানে পরলোকগমন করেন; তখন স্থানীয় লোকেরা আপনাদের মধ্যে এমন সাধু ব্যক্তির সমাধি চিহ্নিত রাখিয়া আপনাদিগকে সৌভাগ্যবান জ্ঞান করিয়া থাকে, ও তথাকার ভূস্বামী সমাধিস্থান আপনার অধিকারে রাখিয়া পবিত্র স্থানরূপে তাহা রক্ষা করিতে থাকে। কতককাল গত হইতে হইতে তাঁহার জীবনবৃত্তান্ত ঘোরাল হইয়া আইসে; তাঁহার উৎপত্তি ও জীবনী কাল্পনিক গল্পে রঞ্জিত হইতে থাকে, তাঁহার জন্ম ও মৃত্যু অস্বাভাবিক বলিয়া কল্পিত হয়, অথবা তাহাতে কোন কোন অস্বাভাবিক ঘটনা সংযোজিত হয়। পরবংশে তাঁহার জীবনের ঘটনামধ্যে বড় বড় দেবগণের নাম সংযোজিত হয়; ক্রমশঃ তাঁহার সম্বন্ধায় পরম্পরাগত বাক্য সকল অতিরঞ্জিত হইয়া গল্পাকারে পরিণত হইতে থাকে। অবশেষে লোকে তাঁহাকে বিষ্ণু অথবা শিবের অবতার বলিয়া ধরিয়া লয়। এইরূপে তিনি দেবতা হইয়া উঠিলন, ক্রমশঃ ব্রাহ্মণ তাঁহার উদ্দেশে একটী মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া তাঁহার পূজাদি স্থির করিয়া দেন।”

“প্রথম শ্রেণীর দেবতারও আদিম বৃত্তান্ত অতিশয় জটিল ইতিহাস বা গল্পপূর্ণ। এইরূপ দেবতা বা তাঁহার জন্য নিরূপিত স্থান যদি কাহারও রোগ আরোগ্যের (বিশেষরূপে স্ত্রীলোকের অথবা পশ্বাদির) কারণ স্বরূপ বিবেচিত হয়, তবে তাঁহার খ্যাতি অচিরকাল মধ্যেই চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়ে।”

অনেকানেক মৃত সাধু ও বীরগণের ভক্তবৃন্দের মধ্যে প্রতি-

হিংসা ও প্রতিযোগিতা ভাব উৎপন্ন হয়; বিশেষতঃ কেহ যখন বহুজনতার মন আকর্ষণ করিতে গিয়া মন্দির ও স্মরণস্তম্ভাদি কোন বিশেষ স্থানে নির্ম্মাণ করে, তখন এইরূপ বিবাদের বিশেষ সূত্র হইয়া উঠে।

দাক্ষিণাত্যের পান্ধারপুরে বিঠোবা নামক দেবতা সকলের প্রিয়পাত্র, তিনি একজন ব্রাহ্মণ ছিলেন, এক্ষণে কৃষ্ণের অবতার বলিয়া পূজিত হন। মহারাষ্ট্রীয় কবি তুকারাম এক্ষণে তাহাদের পূজনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। পুনার ১৫ ক্রোশ দূরবর্ত্তী জেজুরী নামক স্থানের খাণ্ডবা নামক রাজা শিবের অবতাররূপে পরিচিত হইয়াছেন। বালাজী নামক জনৈক ব্যক্তি বিষ্ণুর অবতার বলিয়া বিবেচিত হন, মান্দ্রাজের উত্তর পশ্চিমে তিরুপটি নামক স্থানে তাঁহার উদ্দেশে প্রতিষ্ঠিত একটী মন্দির আছে, প্রতিবৎসর সওয়া লক্ষ টাকা তাহার আয় হইয়া থাকে। এইরূপে রাম ও কৃষ্ণের সামান্য মানব পিতা মাতা হইতে উৎপত্তি হইলেও বিষ্ণুর অব-তারমধ্যে তাঁহারা প্রথম শ্রেণীস্থ বলিয়া পূজিত হন।

ভারতবর্ষের বীরপূজা পরিবর্ত্তনশীল; পূজকেরা অব্যবস্থিত-চিত্ত। মহাবীর, সাধু, ও মহাজ্ঞানীদের জন্য পূজার দিন নিরূপিত আছে। কালক্রমে তাহাদিগকে পশ্চাতে পড়িতে হয়, তাহাদের স্থান অন্য বীর, সাধু ও জ্ঞানীদের দ্বারা অধিকৃত হয়, তখন ইহাদের সমাদর পূর্ব্ববর্ত্তী বীর প্রভৃতিদের অপেক্ষা বেশী বলিয়া পরিগণিত হয়।

পূর্ব্বপুরুষদের পূজা।

হিন্দুরা বিশ্বাস করেন, কোন কোন মৃত ব্যক্তি মন্দভূত আকারে অবনত, অন্য কতকগুলি দেবতা রূপে উন্নত হয়। সাধারণের বিশ্বাস যে মৃত ব্যক্তি আপনার বংশীয় পরপর তিন পুরুষের নিকট খাদ্য গ্রহণ করিয়া থাকে, ও তাহারা আপনা-দের মৃত ব্যক্তির মঙ্গলার্থে তাহার উদ্দেশে সৎকার্য্য করিতে পারে।

পূর্ব্বপুরুষের পূজা প্রায় প্রত্যেক ধর্ম্মের অঙ্গ। ইহা চীন দেশের প্রধান কুসংস্কার; তথাকার পল্লীগ্রামের প্রত্যেক পরিবারের জন্য একটা করিয়া বেদি থাকে, তাহার সম্মুখে মৃত ব্যক্তির উদ্দেশে বিশেষ আদর প্রদর্শন করা হয়। পরিবারের মধ্যে কোন বিবাহ সংঘটন হইলে পূর্ব্বপুরুষের বেদির উপর তদ্বিষয়ক কাগজ রাখা হয়। চীনেরা বিশ্বাস করে, মৃত ব্যক্তিদের সুখ তাহার বংশীয়দের উপহারের উপর নির্ভর করে; যাহারা এইরূপ নৈবেদ্য উৎসর্গ করে, দেবগণ তাহাদের প্রতি প্রসন্ন হন। তাহারা বৎসরের মধ্যে একবার পূর্ব্বপুরুষদের কবরের নিকট তাহাদের পূজা করিয়া থাকে। তৎকালে তাহাদের মধ্যে ভোজ ও আমোদপ্রমোদ হয়, ও বহুপরিমাণে কাগজের মুদ্রা দগ্ধ করা হয়। ভারতবর্ষের রীতিও প্রায় এইরূপ; অধ্যাপক ভট্টাচার্য্য বলেন, "হিন্দুদিগের মনে পূর্ব্বপুরুষের পূজাই কোন না কোন আকারে হিন্দুধর্ম্মের আরম্ভ, মধ্য ও পরিণাম বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে।

শ্রাদ্ধ।

আত্মাকে একটী নূতন শরীর দান করা হিন্দু শ্রাদ্ধের উদ্দেশ্য। উপহার দান দ্বারা গত আত্মাকে শরীরী না করিলে তাহা অশুচি ও প্রেতাত্মা রূপী হইয়া ভূতাত্মাদের সহিত পৃথিবীতে বা আকাশরাজ্যে ভ্রমণ করিয়া বেড়ায় ও মন্দাত্মা বলিয়া আপনাকে ধিক্কার দেয় শরীর প্রাপ্ত হইলে তাহা প্রেতাত্মার অবস্থাইতে পিতৃ বা পূর্ব্বপুরুষের অবস্থান্বিত হয়; তজ্জন্য তাহার উদ্দেশে পিণ্ডদান করিতে হয়। প্রথম দিনের পিণ্ডদ্বারা আত্মার মস্তক গঠিত হয়, ২য় দিনের পিণ্ডে স্কন্ধ ও গলা, এই রূপে ক্রমে সমস্ত শরীর রচিত হয়। দশম দিনে এই নবশরীরে ক্ষুধার উদ্রেক হয়। একাদশ ও দ্বাদশ দিনে তাহা পেটুকের ন্যায় উৎসৃষ্ট খাদ্য ভক্ষণ করে; তদ্দ্বারা ত্রয়োদশ দিনে যমপুরীতে যে ভয়ানক যাত্রা করিতে হইবে, তজ্জন্য বলপ্রাপ্ত হয়।

গরুড় পুরাণ মতে মৃতপাপী মনুষ্যকে ৮৬০০০ যোজন পথ ভ্রমণ করিতে হয়, ইহার মধ্যপথে শত যোজন প্রস্থ অতি গভীর

বৈতরণী নদী, তাহাতে শোণিত প্রবাহিত হয়; হাঙ্গর কুম্ভীরাদি সামুদ্রিক ভীষণাকার জীবে তাহা পূর্ণ, উপরিভাগ অসংখ্য শকুনী ঘন মেঘাকারে অন্ধকারাচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। দণ্ডাজ্ঞা-প্রাপ্ত সহস্র সহস্র আত্মা তাহার তীরে কম্পিত কলেবরে দাঁড়াইয়া আছে, তাহারা তীব্র পিপাসার জ্বালায় পাদদেশ দিয়া প্রবাহিত শোণিত পান করিতে যায়, অমনি পিচ্ছলিয়া তন্মধ্যে পতিত ও বৈতরণীর ভীষণ তরঙ্গে নিমগ্ন হইয়া তাহারা অচিন্ত্য যন্ত্রণাস্থান নরকের গভীরতম প্রদেশে চিরকালের জন্য প্রয়াণ করে।

এই ভয়ানক নরকদায় হইতে নিষ্কৃতি লাভের উপায় স্বরূপে অপরদিকে হিন্দুর শিক্ষা এইরূপ যে, কোন কোন প্রকার ধর্ম্ম কার্য্য করিলে ও ব্রাহ্মণকে দান করিলে পাপের ভয়ানক দণ্ড ও যমের হস্ত হইতে মুক্তি পাওয়া যায়। তৎসময়ের জন্য ব্রাহ্মণ পিতৃস্থানীয় হন, যাহা কিছু ব্রাহ্মণের পোষণ ও উপকারার্থে প্রদত্ত হয়, তাহা পিতৃপুরুষের পুষ্টিসাধক ও উপকারজনক গণিত হয়। শ্রাদ্ধকর্ত্তা ব্যক্তি নৈবেদ্য প্রদান দ্বারা কেবল পিতৃপুরুষের উপকার করে, তাহা নয়, বরং তদ্দ্বারা নিজেরও উপকার করে ও পুণ্য সঞ্চয় করিতে সক্ষম হয়। নিঃসন্তান ব্যক্তির শ্রাদ্ধ করণার্থে কোন পুত্র না থাকাতে তাহাকে ‘পুৎ’ নামক নরকে নিমগ্ন হইতে হয়। এই নরক হইতে রক্ষা করে বলিয়া সন্তানকে পুত্র বলা যায়।

প্রতি দিনই শ্রাদ্ধ করা যাইতে পারে, বিশেষতঃ সন্তানের নামকরণ কালে, নূতন গৃহবাসের আরম্ভ প্রভৃতি উৎসবের সময়ে শ্রাদ্ধ করা হিন্দুধর্ম্মসঙ্গত কার্য্য।

শ্রাদ্ধের অনুবর্ত্তী দরিদ্রতা। লোকে বৃটিশ্ গবর্ণমেণ্টের উপর দোষারোপ করিয়া এদেশীয়দিগের দরিদ্রতার অভিযোগ করে; কিন্তু তাহাদের পাগলামী জনক রীতি প্রযুক্তই অধিকাংশ দরিদ্রতা ঘটিয়া থাকে। পরিবারের মধ্যে মৃত বৃদ্ধ ব্যক্তিদের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়াতে বহু পরিমাণে অর্থব্যয় হয়। পঞ্জাবে গড়ে এই কার্য্যের জন্য ৫০০ টাকা ব্যয় হইয়া থাকে।

স্যর মনিয়র্ উইলিয়ামস্ বলেন, "বাঙ্গালা দেশের কোন সম্পন্ন ব্যক্তি আপন পিতার মৃত্যুর পর তাহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ও তৎসম্বন্ধীয় অন্যান্য ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য অন্ততঃ ছয় বা সাত হাজার টাকা ব্যয় না করিলে তাহাকে সপরিবারে চির-নিন্দা ভোগ পূর্ব্বক প্রায় সমাজচ্যুত হইয়া থাকিতে হয়। এমন ঘটনা উপলক্ষে বাঙ্গালার অনেক রাজা ও উচ্চ পরিবারস্থ ভূস্বামীগণকে বহু অর্থ ব্যয় করিয়া অবশিষ্ট জীবন দরিদ্রাবস্থায় অতিবাহন করিতে হইয়াছে। একটী শ্রাদ্ধে পনেরো লক্ষ টাকা পর্য্যন্ত ব্যয় করা হইয়াছে, এরূপ উদাহরণ পাওয়া যায়। এই রাশীকৃত টাকা অধিকাংশ অসার ব্রাহ্মণ, অলস পণ্ডিত, অসবদ্ধ গোঁড়া ভক্ত ও অকর্ম্মণ্য পরিব্রাজক, যোগী ও সন্ন্যাসীর জন্য অপব্যয় করা হয়।"

পাটনা নগরের ২৭ ক্রোশ দক্ষিণে স্থিত গয়া নগর হিন্দুর প্রধান শ্রাদ্ধক্ষেত্র। তথাকার শ্রাদ্ধ এমন ফলদায়ক, যে মৃত আত্মীয় যেখানেই থাকুক, তাহার উদ্দেশে গয়াতে শ্রাদ্ধ করিলে সে একেবারেই বিষ্ণুর স্বর্গ-বৈকুণ্ঠধামে স্থান প্রাপ্ত হয়। তথা-কার ব্যয় অত্যন্ত অধিক; পূর্ণ ফল প্রাপ্তির জন্য প্রায় শতাধিক বিভিন্ন স্থানে নানাবিধ ক্রিয়াকলাপ করিতে হয়। গয়াওয়াল দুর্দ্ধর্ষ, লোভী ব্রাহ্মণগণকে বহু পরিমাণে তাহাদের পাওনা দিতে হয়; ধনী লোকেরা ইহার জন্য বহুমুদ্রা দিতে বাধ্য হয়।

শ্রাদ্ধ উপলক্ষে উচ্চহারে সুদ দিয়া লোকে ঋণ করিয়া থাকে। হিন্দুদের নিকট মুদ্রা সঞ্চিত হইলে তাহারা অলঙ্কার নির্ম্মাণ করিয়া থাকে, এইসকল অলঙ্কার বন্ধক রাখিয়াও তাহারা উচ্চহারে সুদদিয়া ঋণ করে।

এই বহু ব্যয়সাধ্য কুরীতি দেশের লোকদের সামাজিক অবস্থার উন্নতির পক্ষে বাস্তবিক প্রতিবন্ধক, আর তাহা ভার-তের পবিত্র প্রাচীন গ্রন্থাবলীরও অনুমোদনীয় নহে, কোথায়ও তদ্বিষয়ক বিধি দৃষ্ট হয় না।

শ্রাদ্ধ দুর্নীতি। দারিদ্র্য প্রাপ্তি আশঙ্কাও এই সকল দুর্নী-তিতে অতিশয় মন্দ ফল ফলিতেছে। কত নিষ্কর্ম্মা অলস

আপনাদের জীবনোপায়ের জন্য কোনরূপ পরিশ্রম না করিয়া কেবল শ্রাদ্ধ খাইয়া আপনাদের উদরপূর্ত্তি করে। ইহার দ্বারা লোকের মনে অনিষ্ট জনক ভ্রান্ত বিশ্বাস উৎপাদন করা হয়; ফলতঃ লোকে ভাবে—আপনাদের কার্য্যগুণে না পারিলেও মৃত্যুর পরে অন্যের নৈবেদ্য দ্বারা পরকালে মঙ্গল লাভ করিতে পারিবে, জঘন্য নিকৃষ্ট পাপপূর্ণ জীবন যাপন করিলেও কোন ক্ষতি নাই, যদি অলস ব্রাহ্মণদের পরিতোষার্থে, বিশেষরূপে গয়াতে পিণ্ডদানের জন্য প্রচুর সম্পত্তি রাখিয়া যাইতে পারে, তবে তাহার জন্য আর কোন ভয় নাই; এইরূপে লোকে ইহাতে পাপ করিবার প্রবৃত্তি প্রাপ্ত হয়। অপরদিকে নিঃসন্তান ব্যক্তি অকারণে নরকে পতিত হইবার ভয়ে ম্রিয়মাণ হয়। সমস্ত জগতের বিচারকর্ত্তা ন্যায়সিদ্ধ কার্য্যই করিবেন। মনুষ্য আপন কার্য্যের জন্য পুরস্কৃত বা দণ্ডিত হইবে; কিন্তু অন্য ব্যক্তির কার্য্যের জন্য কোনরূপ ফলাফল তাহাকে ভোগ করিতে হয় না।

শ্রাদ্ধ করিবার রীতি ব্রাহ্মণদিগের কল্পিত কৌশল। অজ্ঞান আগুপ্রত্যয়ী হিন্দুদিগের অর্থ গ্রহণার্থে তাহারা ধর্ম্মের ভাণ দেখাইয়া এই কুরীতির আবিষ্কার করিয়াছে। শোক-কাতর ব্যক্তিদিগের মনে তাহারা ইচ্ছামত কার্য্য করিতে সক্ষম হইয়া এই উপায়ে তাহাদের টাকা অপহরণ করিয়া থাকে।

পূর্ব্বপুরুষদিগকে স্মরণ করা আমাদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম, কিন্তু ভাবী জীবনে তাঁহাদের যে সুখ দুঃখ ঘটে, তাহা তাঁহাদের আত্মকার্য্যের উপর নির্ভর করে; আমরা নৈবেদ্যাদি উৎসর্গ করিয়া তাঁহাদের কোন উপকার করিতে পারি না। উত্তর পুরুষগণ সদাচার দ্বারা আপনাদের পূর্ব্ব পুরুষগণের প্রতি উৎকৃষ্ট সমাদর প্রদর্শন করিতে পারে।

উদ্ভিদপূজা।

উদ্ভিদপূজা অতি প্রাচীন কালীয় কুসংস্কার। হিন্দুমতানুসারে দেব, দানব, মানব ও [illegible] উদ্ভিদরূপে জন্ম

গ্রহণ করিতে পারে। মনু বলেন, (১; ৪৯) "উদ্ভিদ সকল বিবেকসম্পন্ন ও সুখদুঃখবোধে ভূষিত।"

বৈদিককালে সোম বৃক্ষ সুরারস প্রদান করিত বলিয়া দেবতাস্বরূপে বিবেচিত ও পূজিত হইত। হিন্দুরা তুলশী বৃক্ষকে অতি পবিত্র জ্ঞান করিয়া থাকে। এই বৃক্ষের কল্পিত উৎপত্তি সম্বন্ধে নানা গল্প প্রচলিত আছে; একটী বিবরণ এইরূপ যে, দুগ্ধ সমুদ্রের মন্থনদ্বারা তুলশী বৃক্ষের উৎপত্তি হইয়াছে। অন্য একটী এই, তুলশী নাম্নিকা এক স্ত্রী বিষ্ণুর পত্নী হইবার আশয়ে কঠোর তপস্যা করিয়াছিল, তাহা শুনিয়া বিষ্ণুপত্নী লক্ষ্মী অভিসম্পাত দ্বারা তাহাকে তুলশী বৃক্ষরূপে পরিণত করে, এই জন্য সে দেবীরূপে পূজিতা হইযা থাকে। তাহার নিকট এইরূপ প্রার্থনা করা হয়, "তুলশীর মূল সমস্ত পবিত্র তীর্থভূমি, যাহার কেন্দ্রস্থলে সমস্ত দেবলোক আছেন ও উচ্চ শাখাতে সমস্ত বেদ রহিয়াছে, আমি সেই তুলশীর পূজা করি।"

তুলশী।

তুলশী বিশেষরূপে হিন্দু স্ত্রীলোকদের দেবতা। সম্ভ্রান্ত লোকদের উঠানের মধ্যে ইষ্টক নির্ম্মিত একটী বেষ্টিত স্থানে তুলশীচারা রাখিয়া থাকে। অনেক স্ত্রীলোকের পক্ষে তুলশীবৃক্ষ বেষ্টন করা ও তাহার নিকট প্রার্থনা উচ্চারণ করা অথবা নৈবেদ্য উৎসর্গ করা একমাত্র ধর্ম্ম বলিয়া গণিত, আর এই কার্য্যের প্রধান উদ্দেশ্য সন্তান কামনা। তাহারা ১০৮ বার তুলশী প্রদক্ষিণ করিয়া থাকে; দক্ষিণ পার্শ্ব হইতে প্রদক্ষিণ করিতে হয়, বাম পার্শ্বে প্রদক্ষিণ করিলে সমস্ত ফলে বঞ্চিত হয়।

মধ্যে মধ্যে তুলশী বৃক্ষের সহিত বিষ্ণুর প্রতিরূপ শালগ্রাম শিলার বিবাহ দেওয়া হয়, এই কার্য্যে সহস্র সহস্র মুদ্রার অপব্যবহার হইয়া থাকে। একবার এই বিবাহ উপলক্ষে মহা সমারোহ হইয়াছিল, তাহাতে ৮ হস্তী, ২০০ উষ্ট্র ও ৪০০ অশ্ব ব্যবহৃত ও সেই পরিমাণে অর্থের অপব্যয় হইয়াছিল।

পিপল বা অশ্বথ বৃক্ষ অতি পবিত্র বলিয়া মান্য; কেহ কেহ

বলে যে, এই মহীরুহ ব্রহ্মার সত্ত্ববিশিষ্ট ; কোন কোন ঘটনা উপলক্ষে এই বৃক্ষকে ব্রাহ্মণ রূপে পবিত্র সূত্রে ভূষিত করা হয়। অন্যেরা এমনও বলিয়া থাকে যে, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব এই মহা-বৃক্ষের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছেন। লোকে বিশ্বাস করে, যে আত্মা সকল ইহার শাখায় বসিতে ও তাহার পত্রাবলীর শব্দ শুনিতে আনন্দিত হয়।

পিপল।

বিল্ব।

তৃতীয় স্থলে হিন্দুর সম্মুখে বিল্ব-বৃক্ষ পবিত্র বলিয়া মান্য, তাহার পত্র শিবের লিঙ্গ ও বৃষের সম্মুখে উৎসৃষ্ট হইয়া থাকে।

নিম্ব।

নিম্ব বৃক্ষও পবিত্র, দ্বারের উপরে নিমপত্র ঝুলাইয়া রাখা হয়, তদ্দ্বারা পৈশাচিক অশুচি শক্তি হইতে রক্ষা পাওয়া যায়, লোকের মনে এইরূপ বিশ্বাস আছে।

কুশ।

তৃণের মধ্যে কুশ অতি পবিত্র ; সমস্ত ধর্ম্ম কার্য্যে তাহার ব্যবহার হয়। তাহা ভূমি পবিত্র করে, তদ্দ্বারা সর্ব্বাপেক্ষা পবিত্র আসন প্রস্তুত হয়, যাহাতে তাহা স্পর্শ করা যায়, তাহাই পবিত্র হইয়া উঠে। তাহা অঙ্গুলিতে জড়াইয়া সর্ব্বপ্রকার সৎ-কার্য্যে ব্রতী হওয়া যায়। ইহা প্রায় গোময়ের সমান পবিত্র বলিয়া গণ্য।

ইতর প্রাণীর পূজা।

মনুষ্য পশুর পূজা করে, ইহা অপেক্ষা শোচনীয় দৃশ্য আর কি হইতে পারে ? তথাপি পৃথিবীর সর্ব্বাংশেই অসভ্য ও অর্দ্ধ-সভ্য জাতিগণের মধ্যে জীব-পূজা প্রচলিত হইয়া রহিয়াছে।

হিন্দুরা বিশ্বাস করে, মনুষ্য চৌরাশী লক্ষ বিভিন্ন প্রকার প্রাণীর মধ্য দিয়া গত হয়। পণ্ডিত বা সাধু ব্যক্তির আত্মা সামান্য মক্ষিকার দেহ দ্বারাও আবৃত হইতে পারে। অজ্ঞান

হিন্দুরা বিশ্বাস করিয়া থাকে যে, পশু পক্ষীরা অর্থবোধক ভাষা কহিতে সক্ষম। পুনর্জন্মের এইরূপ বিশ্বাস বশতঃ অনেক হিন্দু কোন প্রকার জীব বধ করে না।

লোকে ভয় প্রযুক্তও জন্তুর পূজা করিয়া থাকে। কোন কোন বন্যজাতি ব্যাঘ্রকে দেবতা জ্ঞানে পূজা করে। সর্পের পূজা অতি সাধারণ, সর্প অতি নিঃশব্দে মনুষ্যের নিকটবর্ত্তী হয়; ইহাদের কোন কোন জাতির ঈষৎ দংশন দ্বারা তৎক্ষণাৎ মৃত্যু সংঘটিত হয়। বৎসর বৎসর এদেশে প্রায় কুড়ি হাজার লোক সর্প দংশনে প্রাণ হারায়। বিষধর গোক্ষুরা সর্পকে লোকে পূজা করিয়া থাকে। বিষ্ণু যখন সৃষ্টির মধ্যবর্ত্তী কালের বিরাম সময়ে নিদ্রা যান, তখন সহস্র-মস্তক-ধারী 'শেষ নাগ' তাঁহার আসন ও চন্দ্রাতপরূপে পদর্শিত হয়। সাধারণ লোকে বিশ্বাস করে, এই নাগ আপনার একটী মস্তক নাড়িলে পৃথিবীতে ভূমিকম্প হইয়া থাকে। কোন কোন স্থানের স্ত্রীলোকেরা সর্পবিবর সমীপে যাইয়া সর্পের উদ্দেশে আহ্বান ও প্রার্থনা করিয়া থাকে, ও দুগ্ধ, ডিম্ব প্রভৃতি তাহার উদ্দেশে উৎসর্গ করে। পশ্চিম আফ্রিকার কাফ্রি জাতির মধ্যে সর্পের পূজা বাহুল্যরূপে প্রচলিত আছে।

ব্যাঘ্র ও সর্প।

বোধ হয়, মনুষ্যের আকৃতির সহিত হনুমানের অনেক সাদৃশ্য আছে বলিয়া লোকে তাহা পবিত্র জ্ঞান করে। আদিম অধিবাসীগণ ব্যাঘ্রের পূজার ন্যায় হনুমানেরও পূজা করিত, পরে ব্রাহ্মণেরা তাহাদের এই রীতি আপনাদের পূজা পদ্ধতির মধ্যে গ্রাহ্য করিয়াছে। অনেক স্থানে হনুমান সাধারণ গ্রাম্য দেবতা বলিয়া মান্য; লোকে বলে,—বানরপত্নীর গর্ভে পবন বা বায়ুদেবের ঔরসে হনুমানের উৎপত্তি হয়। হনুমান ইচ্ছামত আকার পরিগ্রহ করিতে সক্ষম, পাহাড়, পর্ব্বত উৎপাটন ও ও স্থানান্তর করিতে, সূর্য্যকে বাহুর মধ্যে রাখিয়া বিদ্যুতের ন্যায় নিক্ষেপ করিতে পারক। শুরসী নামা রাক্ষসী একদা হনু-

হনুমান।

মানকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছিল, তাহাতে হনুমান আপন কলেবর এত বৃহদাকার করিয়াছিল, যে শূরসীকে আপন মুখ শত যোজন বিস্তৃত করিতে হয়, তৎক্ষণাৎ হনুমান ক্ষুদ্র বৃদ্ধাঙ্গুলির আকারে পরিণত হইয়া তাহার গ্রাস মধ্যে গিয়া অনায়াসে দক্ষিণ-কর্ণ-বিবর হইয়া বহির্গত হয়।

কোন কোন জন্তু অতিশয় উপকারী বলিয়া পূজিত হয়, গোজাতি এই শ্রেণীর অন্তর্গত।

ভারতবর্ষে ধর্ম্ম সংস্কার লইয়া হিন্দুদের মধ্যে খুব আন্দোলন চলিতেছে, গাভী সম্বন্ধীয় বিষয় তাহাদের একটী প্রধান আলোচ্য বিষয়। বৈদিক কালে গোমেধ যজ্ঞ প্রচলিত ছিল, কাহারও মৃত্যু হইলে তাহার সঙ্গী হইবার জন্য একটী গাভীকে বধ করিবার রীতি ছিল। গাভীমাংস ইচ্ছামত সকলেই ভোজন করিত, এমন কি, অতিথির একটী সংজ্ঞা 'গোঘ্ন।' কেহ কেহ বলে, গাভী সত্য সত্য বধ করা হইত না, কিন্তু অথর্ব্ববেদে স্পষ্ট উল্লেখ আছে, কে হত গাভীর কোন্ অংশ পাইবার অধিকারী। অনেকে বলিয়া থাকে, হত গাভীকে পুনরায় জীবন দান করা হইত, কিন্তু তাহা হইলে হত পশুর মাংস ভোজনের পর তাহাকে জীবন দেওয়া হইত!

গাভী।

আজ কাল গোমাংস ভক্ষণ হিন্দুর পক্ষে অতি ভয়ানক কার্য্য, তাহারা এই শব্দও উচ্চারণ করিতে ঘৃণা করে। গোহত্যা লইয়া অনেকবার দাঙ্গা হাঙ্গামা হইয়া থাকে। শিকজাতি আপন কন্যা সন্তান হত্যা করণাপেক্ষা গোবধ গুরুতর অপরাধ বলিয়া গণনা করে।

গাভী হইতে দুগ্ধ লব্ধ হয়, এই জন্য ভারতবর্ষে ইহার এত আদর। ভগবতীর বার্ষিক পূজা নিরূপিত আছে, লোকে গাভীকে লক্ষ্য করিয়া এইরূপ প্রার্থনা করে, "মাতঃ, আমাদের প্রতি প্রসন্ন হও, প্রচুর শস্য প্রদানে আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ কর। আমাদের ভূমিতে প্রচুর পরিমাণে ফসল উৎপন্ন হউক; আমরা তোমার বিনীত উপাসক।"

প্রাচীন মিশরীয় লোকেরা জীবজন্তুর পূজার জন্য প্রসিদ্ধ ছিল; তাহারা অতিশয় আদর পূর্ব্বক বৃষের পূজা করিত; তাহাদের জন্য সুদৃশ্য মন্দির নির্ম্মিত ছিল, সহস্র সহস্র লোক বৃষের সেবাতে নিয়োজিত থাকিত। পূজনীয় বৃষের মৃত্যু হইলে অতি বৃহদাকারের সমাধি মন্দিরে তাহা রক্ষিত হইত, ও তৎকালে সমস্ত মিশর তাহার জন্য শোক প্রকাশ করিত। কিন্তু হিন্দুরা জন্তুপূজার সর্ব্বাপেক্ষা অবনতি অবস্থায় আনীত হইয়াছে; গোময় পর্য্যন্ত তাহারা পবিত্র বলিয়া গণনা করে, গোমূত্র পবিত্র জলের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা পবিত্র, তাহা পাপও দূর করিতে পারে; যাহা কিছু গোবর বা গোমূত্রস্পৃষ্ট হয়, তাহাই পবিত্র হইয়া উঠে। গোময়ভস্ম এমন পবিত্র বিবেচিত হয়, যে পাপীর উপরে তাহা ছিটাইলে সে সাধু হইয়া উঠে। কোন হিন্দু সমুদ্র পার হইয়া ইংলণ্ডে গেলে অপবিত্র গণিত হয়, কিন্তু গাভী হইতে উৎপন্ন পঞ্চগব্য ভোজন দ্বারা তাহার সেই অপবিত্রতার দূরীকরণ হয়।

বৃষ।

কৃষিকার্য্যের জন্য বৃষ বিশেষ উপকারী, গাভীর পর তাহা পূজনীয় বলিয়া বিবেচিত হয়, আরও তাহা শিবের বাহন বলিয়া প্রসিদ্ধ। তেলুগু কবি বিমানা বলেন, "মনুষ্যেরা প্রস্তর নির্ম্মিত ষণ্ডের সম্মুখে সমাদর পূর্ব্বক প্রণিপাত করে, কিন্তু জীবিত ও গমনশীল ষণ্ডকে লগুড়াঘাত করে।"

বিড়াল।

বিড়াল ষষ্ঠীর বাহন, ষষ্ঠী পাছে কুপিতা হন, এই ভয়ে কোন হিন্দুনারী বিড়ালের অপকার করিতে সাহসী হয় না।

বাজপক্ষী।

বাজপক্ষী বিষ্ণুর বাহন গরুড়ের প্রতিরূপ, তজ্জন্য অতি পবিত্র বলিয়া গণিত হয়। খণ্ড খণ্ড মাংস তাহার উদ্দেশে ঊর্দ্ধে নিক্ষিপ্ত হয়, তাহা সর্প বিনষ্ট করিয়া থাকে; এই কারণেই প্রাচীন মিশরীয়েরা আইসিস্ পক্ষীর পূজা করিত।

অস্ত্রাদির পূজা।

বলিদানের উপকরণ যন্ত্রাদির উদ্দেশে বেদে সঙ্গীতের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। বলিদেয় পশু বদ্ধ করিবার হাড়িকাটের নিকট "ধন ও সন্তান" বৃদ্ধির জন্য প্রার্থনা করা হইত। তীরের উদ্দেশে এরূপ সঙ্গীত আছে, "হে মন্ত্রতীক্ষ্ণবাণ, তুমি নিক্ষিপ্ত হইলে শত্রুর দিকে ধাবিত হও, কোনও শত্রুকে ছাড়িও না।" ছাতার প্রতি বিশেষ আদর প্রদর্শিত হইয়াছে—"আমরা তাহাকে তুচ্ছ করি না, তাহা উন্নত শ্রেণীস্থ, আমরা নিশ্চিতরূপে কাষ্ঠবিনির্ম্মিত অস্ত্রের সমাদর করি, হাতা আকাশমণ্ডল স্থাপন করিয়াছে।" হিন্দু আপন উপজীবিকার জন্য যে কোন পদার্থের নিকট উপকার পায়, তাহাই তৎসময়ের জন্য তাহার দেবতা হইয়া উঠে। দিনবিশেষে সূত্রধার আপন বাটালী, মুদ্গর প্রভৃতি অস্ত্রের উদ্দেশে, কৃষক তাহার লাঙ্গলাদির উদ্দেশে, মৎস্যজীবী আপন জালের, লেখক লেখনীর ও গৃহিণী আপন ধামা, কাঠা প্রভৃতি গৃহসামগ্রীর উদ্দেশে প্রার্থনা করিয়া থাকে। ঠগ্‌জাতীয় দস্যু কালীর নাম করিয়া, যদ্দ্বারা পথিকের প্রাণসংহারে কৃতকার্য্য হইত, সেই পরশুর পূজা করিত।

নদী ও জলপূজা।

হিতকর ব্যক্তি বা বস্তুর প্রতি আদর প্রদর্শন করা মানব মনের স্বভাবসিদ্ধ ইচ্ছা। মিশরের উর্ব্বরতা নীল নদীর উপরে নির্ভর করে, এই জন্য প্রাচীনকালে তাহা দেবতারূপে পূজিত হইত। বৈদিককালে আর্য্যজাতি ভারতবর্ষের মধ্যভাগ পর্য্যন্ত অগ্রসর হয় নাই; এই হেতু বেদের সঙ্গীত মধ্যে কেবল মাত্র দুইবার গঙ্গার নামোল্লেখ হইয়াছে; কিন্তু বেদে সিন্ধু অতি বিখ্যাত নদী ও সরস্বতী তাহাদের পূর্ব্বদেশীয় শত্রুগণের হস্ত হইতে রক্ষাকারিণী দেবী বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে গঙ্গা নদীকে অন্য সমস্ত নদী

অপেক্ষা পবিত্র বলিয়া গণ্য করা হয়। লোকে বলে, গঙ্গা বিষ্ণুর পদাঙ্গুলি হইতে নির্গত হইয়াছে, ও সাধু ভগীরথের তপস্যা প্রভাবে রাজা সগরের ষষ্ঠি সহস্র ভস্মীভূত পুত্রকে পূত করণার্থে ভূতলে আনীত হয়; কিন্তু গঙ্গা স্বর্গ হইতে পৃথিবীতে আসিতে কোপান্বিত হওয়াতে শিব তাহার পতনের ভয়ানকত্ব হইতে পৃথিবীকে রক্ষা করণাভিলাষে তাহাকে নিজ জটামধ্যে ধারণ করেন।

গঙ্গা।

লোকে গঙ্গাকে লক্ষ্য করিয়া এইরূপ প্রার্থনা করিয়া থাকে,—"মাতঃ গঙ্গে, তোমার চরণে প্রণত হই, সেবকের প্রতি সদয় হও। তোমার গুণ বর্ণনে কে সক্ষম? নরাধম, অসংখ্য দুষ্কৃতিকার যদি একবার 'গঙ্গা' নাম উচ্চারণ করিতে পারে, সে আপন সমস্ত পাপ-মুক্ত হইয়া দ্যুলোকের সাধুরূপে পরিণত হয়।" এই কারণেই গঙ্গাতীরে অসংখ্য মন্দির, স্নানাগার ও সিঁড়ি নির্ম্মিত হইয়াছে, বহুসংখ্যক পুরোহিত তাহার তীরদেশে অবস্থিত হইয়া স্নানকারিদিগের গাত্রে নামাবলীর ছাপ প্রদান করিয়া থাকে; দেশের সর্ব্বত্র গঙ্গাজলের ব্যবসায় নিয়ত পরিচালিত হইতেছে।

অগ্নিপুরাণে উল্লেখ আছে—"যাহারা গঙ্গাজলে শরীরের অর্দ্ধাংশ নিমগ্ন রাখিয়া প্রাণত্যাগ করে, তাহারা সহস্র সহস্র কাল পরম সুখী ও ব্রহ্মার সদৃশ হইবে।" এই কুসংস্কার বশতঃ বঙ্গদেশে অতি নিষ্ঠুর আচরণের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। মরণাপন্ন ব্যক্তিকে লোকে গঙ্গাতীরে লইয়া যায়, পরে তাহাকে তীরদেশে সংস্থাপিত করিয়া বেষ্টন করত চীৎকার পূর্ব্বক নাম বিশেষ উচ্চারণ ও ক্রন্দনাদি দ্বারা মুমূর্ষু ব্যক্তির অশান্তি উৎপাদন করে। মৃত্যুর কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে আবার তাহাকে গঙ্গাজলে আনিয়া তাহার শরীরের অর্দ্ধাংশ নিমজ্জিত করিয়া রাখে, ও তাহার মুখে মধ্যে মধ্যে গঙ্গার কর্দ্দম ও জল দিতে থাকে। এইরূপ নিষ্ঠুর প্রক্রিয়া দ্বারা তাহার মৃত্যু সময়ের পূর্ব্বেই আনয়ন করে। কখন কখন লোকে গঙ্গাতীরে অনেক

দিন থাকিয়া যায় ; কিন্তু গঙ্গাযাত্রী হইয়া আরোগ্যলাভ করিলে তাহাদের আত্মীয়বর্গ তাহাদিগকে গৃহমধ্যে গ্রহণ করিতে অস্বীকার করে বলিয়া, তাহারা গৃহপ্রত্যাবর্ত্তন করিতে অনিচ্ছুক হইয়া গঙ্গাতীরবর্ত্তী প্রদেশে বাস করে। মরণাপন্ন ব্যক্তির ক্লেশ উপশম করিবার জন্য সর্ব্বপ্রকারে তখন চেষ্টা করাই বিহিত ; কিন্তু ভ্রান্ত মতের বশবর্ত্তী হইয়া লোকে তাহার যাতনার বৃদ্ধিই করিয়া থাকে। অনেকের জীবন এইরূপে নষ্ট করা হয় ; কখন বা পীড়িত ব্যক্তির সম্পত্তির অধিকারী হইবার বাসনায় ইচ্ছাপূর্ব্বক তাহার প্রাণসংহার করা হয়।

হিন্দু জননী পূর্ব্বে বলিদান স্বরূপে আপন দুগ্ধপোষ্য জীবিত শিশুকে গঙ্গাব সাগর সঙ্গমস্থলে নিক্ষেপ করিত। এই নিষ্ঠুর কুপ্রথা নিবারণার্থে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টকে সাগর দ্বীপে প্রহরী নিযুক্ত কবিতে হইয়াছে। গঙ্গার নিকটবাসী প্রচ্ছন্ন রাক্ষসরূপী ব্রাহ্মণগণ নদীব এই পবিত্রতা কল্পনা কবিয়া লাভবান হইয়া থাকে। দক্ষিণ প্রদেশীয় ব্রাহ্মণেবা লোকদিগের বিশ্বাস জন্মায় যে, প্রত্যেক দ্বাদশ বৎসরে একবাব গঙ্গার জল মান্দ্রাজ প্রদেশের কুম্বাকোনম্ সরোবরে আসিয়া থাকে, এই বিশ্বাসেব বশবর্ত্তী হইয়া লক্ষ লক্ষ লোক সেই বৎসবে ঐ পঙ্কিল জলে স্নান করিতে গিযা থাকে।

নর্ম্মদা। নর্ম্মদা (আশীষদাতা) নদীর তীরবাসীগণ গঙ্গা অপেক্ষাও তাহার মাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়া থাকে। কথিত আছে যে, নর্ম্মদা রুদ্র দেবের ঘর্ম্ম হইতে উৎপন্ন, ফলতঃ গঙ্গাতে একবার স্নান করিলে সমস্ত পাপ ধৌত হয় ; কিন্তু নর্ম্মদার দর্শন মাত্রেই পাপ রাশী দূরীভূত হইয়া যায়। গঙ্গার কেবল উত্তর তীরে মৃতদেব দাহকার্য্য ফলদায়ক, কিন্তু নর্ম্মদার উভয় তীরেই তৎকার্য্য সুফলের সহিত সাধিত হয়। এইরূপ গোদাবরী, কাবেরী প্রভৃতি অন্যান্য নদীরও অল্পবিস্তর পরিমাণে পবিত্রতা কল্পিত হইয়াছে। পুরাণের মধ্যে 'মাহাত্ম্য' নামক পর্ব্ব সন্নিবিষ্ট করা গিয়াছে, তন্মধ্যে জলের পবিত্রতাসাধক ধর্ম্মের বর্ণনা আছে।

অপর দিকে, কর্ম্মনাশা নামক যে নদী আসিয়া গঙ্গাতে পতিত হইয়াছে, তাহার সম্বন্ধে লোকে ভাবে, যে তাহা এমন অপবিত্র, যে তাহার জল স্পর্শ করিবামাত্র সঞ্চিত পুণ্য নষ্ট হইয়া যায়।

কোন পবিত্র নদীর উৎপত্তি স্থান হইতে সমুদ্র সঙ্গম পর্য্যন্ত সমস্ত স্থান পদব্রজে ভ্রমণ করা অতিশয় পুণ্যকর কার্য্য বলিয়া গণিত হয়।

কোন কোন কূপও নদীর ন্যায় পবিত্র বলিয়া বিবেচিত হয়। ইউরোপ দেশেও পূর্ব্বে লোকের এইরূপ কুসংস্কার ছিল, অদ্যাপি কোন কোন লোকের একপ বিশ্বাস আছে। লোকে এমন কূপের জলপান অথবা তাহাতে স্নান করিয়া তথায় এক খণ্ড বস্ত্র বা কিছু মুদ্রা দিয়া থাকে।

জ্ঞানকূপ।

ভারতবর্ষের মধ্যে বেনারস নগরে এইরূপ দুইটী কুণ্ডকে লোকে অতিশয় পবিত্র জ্ঞান করিয়া থাকে। একটীর নাম 'জ্ঞানকূপ,' লোকে বিশ্বাস করে, শিব তন্মধ্যে বাস করেন। এই ভ্রমাত্মক জ্ঞানের বশবর্ত্তী হইয়া লোকে তাহার অধোদেশে বাসকারী দেবের উদ্দেশে পুষ্প ও অন্যান্য উপহার উৎসর্গ করিয়া থাকে, এইরূপে প্রতিদিনের নিক্ষিপ্ত পুষ্পাদি পচিয়া তাহা হইতে অতি ঘৃণিত দুর্গন্ধ বাহির হয়।

মুক্তিক্ষেত্র।

বেনারসের মণিকর্ণিকার কুণ্ড আরও পবিত্র বলিয়া বিবেচিত হয়। কাশীখণ্ডে বর্ণনা আছে যে, স্বয়ং বিষ্ণু নিজের লোহচক্রদ্বারা তাহা খনন করেন, ও জলের পরিবর্ত্তে নিজ শরীরের ঘর্ম্মদ্বারা তাহা পূর্ণ করেন। মহাদেব কূপের প্রতি দৃষ্টি করিয়া তন্মধ্যে দশ কোটী সূর্য্যের সৌন্দর্য্য দেখিতে পান, তিনি তাহাতে মহা আনন্দিত হইয়াছেন, এমন অবস্থায় তাঁহার কর্ণচ্যুত একটী কর্ণকুণ্ডল তন্মধ্যে পতিত হয়, তাহাতেই কূপের এই নামকরণ হইয়াছে। ইহার অন্য বহুতর নামের মধ্যে 'মুক্তি-ক্ষেত্র' অন্যতম একটী নাম। ইহার চারিদিকে প্রস্তরের

ধাপ গঠিত আছে, কূপের জলের গভীরতা দুই, তিন ফিট মাত্র, তাহাতে লক্ষ লক্ষ যাত্রী, কেহ কেহ ক্ষতযুক্ত, কেহ বা কদর্য্য ও মলিন অবস্থায় স্নান করিয়া থাকে, তাহাতে এত দুর্গন্ধ হয় যে, চতুর্দ্দিকস্থ বায়ুরাশি পর্য্যন্ত তদ্দ্বারা কলুষিত হইয়া যায়। যাত্রীগণ এই কদর্য্য জলে নামিয়া আপাদমস্তক ডুবাইয়া থাকে, ও স্নান করিতে করিতে কতকগুলি বাক্য উচ্চারণ করিতে থাকে। লোকে বিশ্বাস করে, এই দুর্গন্ধময় জলে স্নাত হইলে আত্মা সমস্ত পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া নির্ম্মল ও পবিত্র হয়। এইরূপে অনেকে যাবজ্জীবনের কৃত পাপ, অপরাধ এক মুহূর্ত্তে ধৌত করিবার বাসনায় তথায় গিয়া থাকে।

হিন্দুরা বিশ্বাস করে, গঙ্গাতে বা তৎসদৃশ পবিত্র নদীতে স্নান করিলে পাপ ধৌত হয়, এই বিশ্বাস নিতান্ত ভ্রান্ত ও যুক্তি-বিরুদ্ধ; মনে কর, তুমি কতকগুলি অপরিষ্কৃত বস্ত্র একটী সিন্দুকের মধ্যে বদ্ধ করিয়া তাহার উপরিভাগ ভালরূপে ধৌত করিলে, তাহাতে ভিতরের মলিন বস্ত্রগুলি কি পরিষ্কৃত হইতে পারে? মনুষ্যের পাপ-মালিন্য ধৌত করিতে হইবে, পাপ শরীরের উপরি-ভাগে থাকে না, কিন্তু তাহা অন্তঃকরণের মধ্যে থাকে, গঙ্গাজল তাহা স্পর্শও করিতে পারে না। আরও বিবেচনা করিয়া দেখ, কোন ব্যক্তি তোমার সম্পত্তি অপহরণ করিবার পর দৌড়িয়া গিয়া গঙ্গাতে ডুব দিল, পরে তুমি তাহাকে চোর বলিয়া ধরিলে, তাহাতে সে যদি বলে, আমি গঙ্গাস্নান করিয়া পাপ-মুক্ত হইয়াছি, তুমি কি তাহার কথা গ্রাহ্য করিয়া তাহাকে নিষ্পাপ জ্ঞান করিবে? কখনই নয়; বরঞ্চ তুমি ভাবিবে, যে চোর তোমাকে অজ্ঞান মনে করিয়া গঙ্গা-স্নানের মিথ্যা আপত্তি দ্বারা আপনাকে পাপ-মুক্ত বলিয়া দেখাইতেছে।

গঙ্গাতীর-বাসী কত প্রবঞ্চক প্রতিদিন গঙ্গাস্নান করিয়াও লোকদিগকে চারিদিকে ঠকাইয়া থাকে। কত দুশ্চরিত্র লোকে গঙ্গাতীরে থাকিয়াও কত প্রকার ঘৃণিত পাপে লিপ্ত রহিয়াছে, অথচ প্রতিদিন গঙ্গাস্নান করিতে ত্রুটি করে না! বেনারসের গঙ্গাপুত্র ব্রাহ্মণেরা দৌরাত্ম্য ও মিথ্যাকথার জন্য বিশেষ

প্রসিদ্ধ। স্বর্গে প্রবেশ করিবার মিথ্যা ভরসাতে যাহারা জীবনের শেষ মুহূর্ত্তে গঙ্গাতীর-বাসী হয়, হায়! তাহাদের অবস্থা নিরতিশয় শোচনীয়! "দক্ষিণ হস্তে মিথ্যা ধারণপূর্ব্বক" তাহারা মৃত্যুর ক্রোড়ে শয়ন করে।।

জীবিত-মনুষ্য ঈশ্বররূপে পূজিত।

ব্রাহ্মণেরা, ব্রহ্মার মুখ হইতে উৎপন্ন, আপনাদের সম্বন্ধে এরূপ বলিয়া থাকে। মনুর মতানুসারে ব্রাহ্মণ প্রথমজাত, বেদের যথার্থ অধিকারী, ও সমস্ত সৃষ্টির প্রধান। জগতের তাবৎ বস্তু বাস্তবিক ব্রাহ্মণের সম্পত্তি। ব্রাহ্মণের প্রসাদাৎ অন্য প্রাণী আপন আপন জীবন ভোগ করিতে পায়। তাহার শরীরের প্রত্যেক অংশে পরাক্রম ও মহিমা নিবাস করে; তাহার দক্ষিণ-কর্ণে গঙ্গা থাকেন, তাহার মুখ ঈশ্বরেরই মুখ, দুগ্ধবতী গাভী তাহার শরীরের লোম। মনু আরও দৃঢ়রূপে কহেন,—"ব্রাহ্মণ শক্তিমান ঈশ্বর, সে শিক্ষিত বা অশিক্ষিত অথবা কোন নিকৃষ্ট কার্য্যে নিযুক্ত হউক, সে শ্রেষ্ঠ দেবতা।" "কেবল জন্মদ্বারাই ব্রাহ্মণ দেবগণ কর্ত্তৃক ঈশ্বররূপে পূজিত।" ব্রাহ্মণেরা দেবগণকেও ভয় দেখায়, পদাঘাত ও অভিসম্পাত করে।

ব্রাহ্মণের ক্ষতিকারক ব্যক্তিকে মনু এইরূপ ভয় দেখান, "যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণকে আঘাত করিবার ইচ্ছায় অধমতাপূর্ব্বক আক্রমণ করে, সে শত বর্ষ পর্য্যন্ত তামিস্র নরকে ঘূর্ণিত হইবে; এবং কেহ ইচ্ছাপূর্ব্বক ক্রোধ-পরবশ হইয়া তৃণদ্বারাও যদি ব্রাহ্মণকে আঘাত করে, তাহাকে অশুচি জন্তুর গর্ত্তে একবিংশ বার জন্মগ্রহণ করিতে হইবে।

ব্রাহ্মণের অপরাধ যত বড়ই হউক, কোন অবস্থাতেই রাজা তাহার প্রাণদণ্ড করিতে পারেন না; অপরাধ অতি গুরুতর হইলে তাহার সমস্ত সম্পত্তি তাহাকে দিয়া নির্ব্বাসন দণ্ডবিধান করিতে পারেন।

অন্যদিকে ব্রাহ্মণকে দান করা মনুর মতে অতি পুণ্যকার্য্য

বলিয়া গণিত; "মনুষ্য গাভী বিক্রয় করিলে নরকস্থ হইবে; ব্রাহ্মণকে গাভী দান করিলে দাতা স্বর্গবাসের যোগ্য হইবে।" যদি দশহরার যোগে ব্রাহ্মণকে সমস্ত একটী গ্রাম দান করা হয়, তাহা হইলে দাতা দশ লক্ষ গুণে সূর্য্য অপেক্ষা প্রভাবান্বিত হইবে, সে দশ লক্ষ কুমারী, রথ ও বহুমূল্য মণিমুক্তা সমেত পাল্কী প্রাপ্ত হইবে, এবং ঐ গ্রামে যতসংখ্যক মৃত্তিকারেণু আছে, তত বৎসর সে স্বীয় জনকের সহিত স্বর্গবাসের অধিকারী হইবে।

পুরাণের মধ্যে ব্রাহ্মণকে সম্ভ্রম করিবার এইরূপ পুরস্কার প্রতিজ্ঞাত হইয়াছে—"যে কোন ভদ্র ব্যক্তি ব্রাহ্মণকে বিষ্ণু জ্ঞানে প্রণাম করে, সে দীর্ঘ-জীবন, বহুপুত্র, খ্যাতি ও উন্নতি লাভ করে, কিন্তু যে অজ্ঞান ব্যক্তি পৃথিবীতে ব্রাহ্মণকে প্রণাম না করে, কেশব আপন চক্রদ্বারা তাহার প্রাণ সংহার করিতে ইচ্ছা করেন।" "ব্রাহ্মণকে প্রদক্ষিণপূর্ব্বক যে ভদ্র ব্যক্তি তাঁহার পূজা করে, সে সপ্তদ্বীপ পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিবার ফল প্রাপ্ত হয়।

ব্রাহ্মণের উচ্ছিষ্টাংশ কেহ মস্তকে করিয়া বহন করিলে, সে সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হয়, তদ্রূপ ব্রাহ্মণ যে জলে আপন দক্ষিণ পদের বৃদ্ধাঙ্গুলি মগ্ন করে, সেই জল পান করিলে সেই ফললাভ হয়; তদ্বিষয়ক উক্তি, যথা, "সমস্ত পবিত্র স্রোত সমুদ্রে গমন করে, সমুদ্র মধ্যস্থ তাবৎ পবিত্র স্রোত ব্রাহ্মণের দক্ষিণ পদে স্থিত।"

প্রায় হিন্দুমাত্রেরই এক এক জন গুরু আছেন, আর হিন্দুরা গুরুদেব নিকট এরূপ উপদেশ পায় যে, দেবগণকে অসন্তুষ্ট করা শ্রেয়, তথাপি গুরুর অসন্তোষভাজন হওয়া উচিত নয়। কেহ দেবতাকে অসন্তুষ্ট করিলে গুরু তাহার জন্য অনুরোধ করিয়া দেবতার প্রসাদ লাভ করিতে পারেন, কিন্তু গুরুকে বিরক্ত করিলে কে তাঁহার ক্রোধ শান্তি করিবে? গুরুর অভি-শাপ দ্বারা নরকের অকথ্য যাতনা ভোগ হয়; এই কারণে সচরাচর দৃষ্ট হয়; কোন ব্যক্তি আপন গুরুর দেখা পাইলে তাঁহার পদতলে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাতপূর্ব্বক গুরুর পদধুলি মস্তকে ধারণ করে।

গুরু কোন ব্যক্তিকে শিষ্যরূপে দীক্ষিত করণকালে তাহার কর্ণে সংক্ষিপ্ত মন্ত্র দান করেন, শিষ্য তাহা কখনই অন্য ব্যক্তির নিকট ব্যক্ত করিতে পারে না, তাহাকে অতি ভয়ানক শাস্তির ভয় দেখান হয়। শিষ্য এই অব্যক্ত অর্থবিশিষ্ট শব্দের মন্ত্র অন্ততঃ প্রাতঃ ও সন্ধ্যাতে পুনরুক্তি করিতে আদিষ্ট হয়। কিন্তু মন্ত্রের উচ্চারণেই অনেক ফললাভ হয়, এই বিশ্বাসপ্রযুক্ত অনেকে দিনে ১০৮ বার তাহা পুনরুক্তি করিয়া থাকে। গুরু বৎসরে এক বা অধিক বার শিষ্যবাড়ী দর্শন দিয়া থাকেন, তাঁহাকে মহা-সমাদরের সহিত আহ্বান করিয়া তাঁহার বার্ষিক তাঁহাকে দিতে হয়।

কোন কোন বৈষ্ণব সম্প্রদায় আপন আপন দলস্থ আচার্য্যকে দেবতার রূপান্তর (সর্ব্বদেবময়) বিবেচনা করিয়া থাকে। কোন কোন অনভিজ্ঞ গোঁড়া বৃদ্ধ আপনাকে জগৎগুরুরূপে পরিচয় দিয়া থাকে। শিষ্যদিগকে দীক্ষাকালে কখন কখন বিষ্ণুর চক্র ও শঙ্খদ্বারা তাহাদের গাত্রে দাগিয়া দেয়।

বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে বল্লবাচার্য্য দল কদাচারের চূড়ান্ত সীমাতে উপনীত হইয়াছে, উপযুক্ত স্থানে ইহাদের বিষয় বর্ণিত হইবে, এখানে এইমাত্র বলিয়া শেষ করা যাইতেছে যে, তাহাদের মহারাজা খ্যাত পুরোহিতেরা স্ত্রীপুরুষের ভক্তবৃন্দ কর্তৃক ঈশ্বর বা ঈশ্বরের অবতার বলিয়া পূজিত হয়।

পাপিষ্ঠ মর্ত্ত্যের ঐশ্বরিক সম্ভ্রম দাবি করিবার যে কোন মূল নাই, তাহা সুস্পষ্ট বোধগম্য। নীচকুলজাত কোন অযোগ্য প্রতারক ব্যক্তিকে যাহারা রাজকীয় সম্মান দেয়, ইহারা তাহাদের ন্যায় নির্ব্বোধের কার্য্য করে। ঈদৃশ কার্য্যে পুরস্কার-প্রাপ্তির পরিবর্ত্তে তাহারা অতি ভয়ানক দণ্ডের যোগ্য হয়।

এক্ষণে আমরা প্রধান প্রধান হিন্দুদেবগণের বিষয় সংক্ষেপে—বর্ণনা করিব।

ব্রহ্ম (নির্গুণ)।

হিন্দুমতে অনন্ত শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে নির্গুণ বা সর্ব্বগুণবর্জিত বলিয়া বর্ণনা করে, তাঁহাকে ব্রহ্ম (ক্লীব) বলে। বহুকাল নিশ্চেষ্ট থাকিবার পর তিনি অহঙ্কার বা আত্মতত্ত্ব প্রাপ্ত হইলেন; তাঁহাতে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ গুণ (সত্ত্ব শব্দে সত্য, দয়া, ভক্তি, ন্যায়, ধর্ম্ম পবিত্রাদি; রজঃ শব্দে রাগ, দ্বেষাদি অভিলাষ; ও তমঃ শব্দে সংহারক গুণ, অন্ধকার বুঝায়) বিকসিত হইল। ব্রহ্ম বারিরাশির উপর একটী স্বর্ণডিম্ব সংস্থাপন করিয়া তদুপরি সমস্ত বৎসর উত্তাপ দান করিলেন, তাহা হইতে সর্ব্ব পদার্থের সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা (পুংলিঙ্গ) উৎপন্ন হইলেন।

আদিকারণ যে একমাত্র পরমব্রহ্ম, হিন্দুরা সকলেই তাঁহাকে স্বীকার করিলেও, তাঁহার উদ্দেশে কোন মন্দির প্রতিষ্ঠা করে না, অথবা তাঁহার পূজার জন্য কোন প্রকার ক্রিয়াকলাপের বিধি নাই।

ব্রহ্মা।

ঋগ্বেদের অপেক্ষাকৃত আধুনিক গীতাবলীর মধ্যে ও অথর্ব্ব বেদে সৃষ্টিকর্ত্তার নাম বিশ্বকর্ম্মা, হিরণ্যগর্ভ ও প্রজাপতি বলিয়া উল্লেখ হইয়াছে। বেদে কি ব্রাহ্মণে ব্রহ্মা নামের উল্লেখ নাই।

জাতিভেদ সম্বন্ধে প্রচলিত হিন্দু মত এই যে, চতুর্ব্বিধ জাতি যথাক্রমে ব্রহ্মার মুখ, বাহু, উরুদেশ ও পদ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

প্রাচীন গ্রন্থে ব্রহ্মার শূকর মূর্ত্তি প্রদর্শিত হয়, তিনি উক্ত মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া বারিধি তলস্থ মৃত্তিকা উত্তোলন করিয়াছেন। তাঁহার বরাহমূর্ত্তি ধারণের অন্যরূপ কথাও প্রচলিত আছে। মহাভারতে লিখিত আছে, বিষ্ণুর নাভিদেশে জাত কমল হইতে ব্রহ্মার উৎপত্তি হইয়াছে। বরাহ অবতারও বিষ্ণুর উপরে আরোপিত হয়। বৈষ্ণবপ্রধানেরা শিব অপেক্ষা ব্রহ্মার

প্রাধান্য স্বীকার করে ও বলে, শিব ব্রহ্মার ললাটদেশহইতে উৎপন্ন হইয়াছেন। শৈবেরা আবার তদ্বিরুদ্ধে মহাদেবকে ব্রহ্মার সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া বর্ণনা করে, এবং ব্রহ্মা শিবলিঙ্গ পূজাকারী ও শিবের সারথী রূপে প্রদর্শিত হন।

কল্পিত স্রষ্টা ব্রহ্মার সম্বন্ধে অতি অশ্লীল উপাখ্যান আছে। তিনি সময়ে সময়ে উন্মত্ত হন, তাঁহার পঞ্চ মস্তক ধারণ করিবার উপাখ্যান অতি কদর্য্য, উল্লেখযোগ্য নহে। কথিত আছে, শিব নিজ বামহস্তের একটী নখপ্রহারে ব্রহ্মার পঞ্চম মস্তক ছেদন করেন। মিথ্যা সাক্ষীরূপে ব্রহ্মা তিনবার মিথ্যা বলিয়া কামধেনু ও কেতকী বৃক্ষকে সাক্ষী করিয়াছিলেন। এই কারণে দেবগণ ব্রহ্মাকে অভিসম্পাত করিয়া মর্ত্তালোকে তাঁহার পূজা রহিত করিয়া দিয়াছেন। ভারতবর্ষের মধ্যে রাজপুতানার পুষ্কর নামক স্থানে বোধ হয়, ব্রহ্মার উদ্দেশে একমাত্র মন্দির প্রতিষ্ঠিত আছে।

বিষ্ণু।

ঋগ্‌বেদের নিরুক্ত টীকাতে অগ্নি, ইন্দ্র ও সূর্য্য তিন প্রধান দেব বলিয়া ব্যক্ত হইয়াছেন। বিষ্ণু প্রথম শ্রেণীস্থ দেব বলিয়া গণিত নহেন। তিনি তিনটী মাত্র পাদবিক্ষেপে আকাশমার্গ ভ্রমণ করেন বলিয়া অন্য সকল দেবগণ হইতে প্রসিদ্ধ; ইহা সূর্য্যের উদয়, মধ্যাহ্ন ও অস্তকাল রূপেও ব্যাখ্যাত হয়। বেদ মধ্যে কখন কখন তাঁহাকে ইন্দ্রের সঙ্গীরূপে দৃষ্ট হয়। মনুতে প্রায় তাঁহার নামোল্লেখ নাই, অন্ততঃ প্রধান দেব বলিয়া কোথায়ও উল্লেখ নাই। কোন কোন গ্রন্থে তাঁহাকে অদিতির পুত্রদের মধ্যে একজন বলা হয়; অদিতি দক্ষের মাতা ও কন্যা উভয়রূপে বর্ণিত হয়।

কালক্রমে বিষ্ণুর উপাসকেরা হিন্দু দেবগণের মধ্যে বিষ্ণুকে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিয়াছে। মনু ব্রহ্মাকে নারায়ণ বলেন, কারণ নার অর্থাৎ জলমধ্যে, অয়ন (গতি) প্রথমে যিনি করিয়াছি-

লেন। বরাহ ও কূর্ম্মের ইতিহাস লইয়া বিষ্ণুর উপাসকেরা আপনাদের দেব বিষ্ণুকে এই নাম দিয়াছে। তাঁহার চিত্র 'শেষ' নাগের উপর নিদ্রিত ও জলরাশির উপরে ভাসমান মানবরূপে প্রদর্শিত হয়। বিষ্ণুপুরাণে বিষ্ণুর সম্বন্ধে এইরূপ বর্ণনা আছে,—"জগতের উৎপত্তি বিষ্ণু হইতে হইয়াছে, জগত তাঁহাতে অবস্থিত, তিনি ইহার স্থিতি ও লয়ের কারণ, তিনিই জগত।" তৎসম্বন্ধীয় একটী সঙ্গীতের আরম্ভ এইরূপ,—"অপরিবর্ত্তনীয়, পবিত্র, অনন্ত মহান, একমাত্র সার্ব্বত্রিক প্রকৃতিধারী, সর্ব্বোপরিবস্ত বিষ্ণুর মহিমা হউক, তাঁহাতেই হিরণ্যগর্ভ (ব্রহ্মা), হরি ও শঙ্কর (শিব), বিশ্বের স্রষ্টা, রক্ষক ও বিনাশক আছেন।"

বিষ্ণু অনেকবার অবতীর্ণ হইয়াছেন, ফলতঃ জগতের কোন মন্দের নিরাকরণ অথবা কোন সৎকার্য্যের সাধন তাঁহার এই নানা অবতারের উদ্দেশ্য। সচরাচর লোকে বিষ্ণুর দশ অবতারের কথা বলে; কিন্তু ভাগবত পুরাণে তাঁহার দ্বাবিংশতি অবতারের কথা লেখা আছে, আরও বলে, বাস্তবিক অবতারের সংখ্যা অগণ্য। আমরা নিম্নে বিষ্ণুর অবতারগুলি সংক্ষেপে বর্ণনা করিব।

বৈষ্ণবেরা শালগ্রামের পূজা করিয়া থাকে। কথিত আছে, তুলশী বৃক্ষরূপে পরিণত হইলে বিষ্ণু তাঁহাকে এই সান্ত্বনাবাক্য কহেন যে, আমি শালগ্রাম শিলা হইয়া তোমার নিকটে থাকিব। শালগ্রাম প্রস্তরীভূত শম্বুকবিশেষ, গণ্ডকী নদীতে তাহা পাওয়া যায়। পূজনীয় বস্তুরূপে যেন পরিণত হয়, তজ্জন্য শালগ্রাম শিলার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিতে হয় না, তাহা স্বয়ম্ভু শ্রেণীর অন্তর্গত, স্বাভাবিক রূপে দেবত্ব প্রাপ্ত।

বিষ্ণু সম্বন্ধে এইরূপ ইতিহাসও পাওয়া যায়,—দুগ্ধসমুদ্র মন্থনের পূর্ব্বে বিষ্ণু দৈত্যগণের নিকট অমৃতের অংশ দানের প্রতিজ্ঞা করেন। কিন্তু পরে তাহাদিগকে বিমোহিত করণার্থে তিনি সুন্দরী স্ত্রী মূর্ত্তি ধারণ করেন। অনন্তর তাহাদের একজন অমৃত পান করিতে উদ্যত হইলে তিনি আপন চক্র দ্বারা তাহার শিরশ্ছেদন করেন। শিবকে প্রবঞ্চনা করণাশয়ে তিনি মোহিনীর

মূর্ত্তি ধরিয়াছিলেন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর অত্রিপত্নীর প্রতি অসদাচরণ করাতে তাহা দ্বারা ক্ষুদ্র শিশুরূপে পরিণত হইয়াছিলেন। ভৃগুমুনির পত্নীর তপস্যা ভঙ্গ করণার্থে বিষ্ণু তাহার মস্তক ছেদন করেন, তাহাতে ভৃগুর শাপে তাঁহাকে সপ্তবার মৃত্যুশীল রূপে জন্মগ্রহণ করিতে হয়।

অবতার।

হিন্দুগণ ঈশ্বরত্বে ত্রিমূর্ত্তি বিশ্বাস করিয়া থাকে, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব এই তিন ব্যক্তি এই ত্রিমূর্ত্তিতে বর্ত্তমান। স্বতন্ত্ররূপে ব্রহ্মার পূজা প্রায় অপ্রচলিত হইয়াছে। এক্ষণে দুই শ্রেণীর উপাসক দৃষ্ট হয়, শৈব ও বৈষ্ণব। ভারতবর্ষের প্রায় সর্ব্বস্থানেই শিবোপাসকগণ পাওয়া যায়, কিন্তু শিবলিঙ্গের উদ্দেশে প্রতিষ্ঠিত মন্দির ব্যতীত শিবের জন্য স্বতন্ত্র মন্দির প্রায় দৃষ্ট হয় না। শিবের পত্নী কালী, দুর্গা ভবানী প্রভৃতি শক্তির উপাসক শাক্তগণ শিবের প্রতিও প্রগাঢ় ভক্তি প্রদর্শন করে। কিন্তু অন্যান্য শিবোপাসকদের সংখ্যা অনেক কম; তাহারা প্রধানতঃ ভিক্ষোপজীবি সন্ন্যাসী, গোসাঞী, যোগী প্রভৃতি নামে দেশমধ্যে ভ্রমণ করিয়া থাকে। শিবের কোন কোন অবতারের নাম শুনা যায়, কিন্তু তাহারা তত প্রসিদ্ধ নয়।

ত্রিমূর্ত্তির তৃতীয় ব্যক্তি লয়কারী বা পুনর্সৃষ্টিকর্ত্তা অথবা পরম যোগী বলিয়া পরিচিত, কিন্তু তিনি লোকের নিকট অতি ভয়ানক ঈশ্বর বলিয়া বিদিত। সাধারণ লোকে শিব অপেক্ষা কোমল প্রকৃতির ঈশ্বর অপেক্ষা করে; ভয় ও কম্পে নয়, কিন্তু ভক্তি ও প্রেমমার্গ দিয়া যাঁহার নিকটবর্ত্তী হওয়া যায়, মানবমন এমন ঈশ্বরের সেবায় অধিক অনুরাগী হয়। যিনি মনুষ্যের প্রয়োজন ও অভাব পূরণ করিতে সহানুভূতি প্রকাশ করেন, ভূতের হস্ত ও পরাক্রম হইতে উদ্ধার করিতে সমর্থ; মনুষ্য তাঁহাকেই চাহে।

ত্রিমূর্ত্তির দ্বিতীয় ব্যক্তিতে ঈদৃশ সদয় ঈশ্বরের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে; ফলতঃ বিষ্ণু মনুষ্যের অভাব মোচন, পরীক্ষায়,

দুঃখ ও বিপদে তাহার সহিত সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া মানব-জাতির প্রতি আপন প্রেম দেখাইয়াছেন। তাঁহাকেই বহুসংখ্যক লোকে ত্রাণকর্ত্তা, রক্ষক ও সহায় রূপে বিশ্বাস করিয়া থাকে। কিন্তু বিষ্ণু অবতার না হইয়া এইরূপ সাহায্য প্রদান করেন নাই, তিনি এজন্য নানা অবতার গ্রহণ করিয়াছেন।

হিন্দু-ধর্ম্মরূপ অভিনয়ের কৌশল কিঞ্চিৎ অবধান করিলে, বেশ বোধগম্য হইয়া আইসে, তাহার কার্য্যবিধি বহুসংখ্যক, অনুবর্ত্তী ক্রিয়াকলাপ গুলি পূর্ব্ববর্ত্তী অপেক্ষা যুক্তি ও সুকৌশল-সম্পন্ন। এই প্রকরণে আমরা যাহা বর্ণনা করিব, তাহা নিত্য পরিবর্ত্তনশীল বলিয়া দেখিতে পাইব, ইহাতে ত্রিমূর্ত্তির শিক্ষা তমসাচ্ছন্ন ও লুপ্ত প্রায় হইয়াছে, এবং তাহার দ্বিতীয় ব্যক্তির বিবিধ অবতারের বর্ণনা মুখ্য স্থানীয় হইয়াছে।

ঋগ্বেদের বর্ণনায় বিষ্ণু শব্দে সূর্য্যের আকৃতি অথবা সর্ব্ব-স্থলভেদী কিরণ বুঝাইত (বিষ ণু = যিনি বিশ্ব ব্যাপেন)। তাঁহার বিষয়ে বর্ণনা করা হয় যে, তিনি তিন পাদবিক্ষেপে বিশ্বের সপ্ত-লোক বিচরণ করিয়া সকলকে আপনার ধূলায় (কিরণে) আবৃত করিয়া দেন।

মনুতে (১; ১০) পরমাত্মাকে নারায়ণ নামে অভিহিত করা হইয়াছে; নারায়ণ শব্দের অর্থ যিনি জলের মধ্যে গতিবিধি করেন; তদনুসারে তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি সহস্রশির শেষনাগের উপরে স্থিত ও জলরাশির উপরে ভাসমানরূপে প্রদর্শিত হয়। কিন্তু বিষ্ণু দীপ্তি, উত্তাপ বা জলরাশির উপরে ভাসমান থাকেন, তদ্দ্বারা এইরূপ জ্ঞান লব্ধ হইয়াছে যে, ঐশ্বরিক সর্ব্বব্যাপী পুরুষ কার্য্যোপলক্ষে সৃষ্ট সজীব বা নির্জীব প্রাণীর মধ্যে প্রবেশ করিতে পারেন; এইরূপে তিনি গঙ্গা প্রভৃতি নদীমধ্যে, তুলসী প্রভৃতি উদ্ভিদমধ্যে, মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ প্রভৃতি প্রাণীমধ্যে এবং অবশেষে মনুষ্যেরও মধ্যে আপনার সত্ত্ব প্রবেশ করাইতে পারেন, ও করিয়া থাকেন।

বিষ্ণুর মনুষ্যাবতারের কথা সম্ভবতঃ ব্রাহ্মণেরা বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের কার্য্য দেখিয়া কল্পনা করিয়াছেন। ফলতঃ, বুদ্ধ আশ্চর্য্য-

রূপে বৈরাগ্য, আত্মত্যাগ, উদ্যোগ, যত্ন ও সরলতা দ্বারা বহুসংখ্যক লোককে আপনার অনুগামী করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তাঁহার অমায়িকতা, সুমিষ্ট বাক্‌কৌশল ও প্রচলিত ব্রাহ্মণ-প্রধান ধর্ম্মের বিরুদ্ধতা সম্বন্ধে তাঁহার অকাট্য যুক্তিগর্ভ উপদেশ সহস্র সহস্র জনগণকে তাঁহার চারিদিকে একত্র করিয়াছিল। বুদ্ধই বৌদ্ধ-ধর্ম্মের কেন্দ্রস্বরূপ ছিলেন। কিন্তু মৃত্যু তাঁহার অস্তিত্ব লোপ করিয়াছিল, তাঁহার শিক্ষার সার সম্পূর্ণ অস্তিত্বলোপ। তাঁহার দগ্ধ শরীরের অবশিষ্টাংশ তাঁহার অনুগামীদের স্মরণীয় ও পূজ্য বস্তু হইয়া দাঁড়াইয়াছিল; ভারতের সর্ব্বাংশেই এই সকল অবশিষ্টাংশ প্রদর্শনের স্থান নিরূপিত হইয়াছিল, ও বুদ্ধ যে যে স্থানে অবস্থানাদি করিয়াছিলেন, তাহা তীর্থক্ষেত্ররূপে পরিণত হইল, কারণ তাঁহার শিষ্যবৃন্দ তাঁহার স্মরণচিহ্ন সমুদয়কে তাঁহারই ন্যায় সম্মান দিতে লাগিল। এইরূপ অবস্থা দেখিয়া ব্রাহ্মণেরা বুঝিতে পারিয়াছিল, যে কেবল অস্থি, বস্ত্র প্রভৃতি অবশিষ্টাংশগুলি চিরস্থায়ী হইতে পারে না, আর তাহা সর্ব্বকালে মানবাত্মাকে তৃপ্ত করিতেও পারে না; অধিকন্তু যে ব্যক্তি মরিয়া বিলুপ্ত হইয়াছেন, তাঁহাকে পূজা করিয়া কোন ফল নাই, কালে লোকে ইহাও বুঝিতে সক্ষম হইবে; অতএব তাহারা লোকদের প্রয়োজনানুরূপ বিশ্বাসের ও ভক্তির পদার্থ স্বরূপে মহাভারত ও রামায়ণ বীররসকাব্য বর্ণিত ক্ষত্রিয় কুলজাত রামচন্দ্র ও কৃষ্ণকে বিষ্ণুর অবতার রূপে প্রদর্শন করিলেন, তাঁহাদিগকে ব্রাহ্মণেরা আপনাদের দেবতা সূর্য্য ও চন্দ্রবংশোদ্ভব বলিয়া দেখাইলেন। এইরূপেই বিষ্ণু মানবাবতার গ্রহণ করিয়াছেন, ইহা হিন্দুধর্ম্মের শিক্ষা রূপে সকলের নিকট প্রচারিত ও গৃহীত হইয়া আসিতেছে।

হিন্দুদিগের ধর্ম্ম, নীতি, বিদ্যা প্রভৃতিতে ব্রাহ্মণেরা যেমন আপনাদের সুকৌশলসম্পন্ন বিদ্যা প্রয়োগ করিয়াছেন, অবতার সম্বন্ধীয় শিক্ষাতেও তেমনি তাঁহারা আপনাদের সুবিধার পথ অবারিত রাখিয়া অতি বর্ণনার ত্রুটি করেন নাই। জগতকে কোন ভয়ানক বিপত্তি হইতে রক্ষা করণার্থে, বিশেষরূপে দৈত্য

দানব প্রভৃতি কোন কোন মন্দাত্মা যখন অপরিসীম ক্ষমতার অধিকারী হইয়া দেবতা ও মানবগণের প্রতি অত্যাচারের কারণ হইয়া উঠে, তখনই বিষ্ণু ব্রহ্মাণ্ডের রক্ষার্থে অবতীর্ণ হইতে প্রসন্ন হন। এই প্রকার অবতার পাঁচ বিভিন্ন প্রকারের কল্পিত হইয়াছে।

১মতঃ। পূর্ণ মনুষ্যাবতার, যথা বিষ্ণু পূর্ণ মনুষ্য রূপ ধারণ করিযাছিলেন।

২য়। আংশিক মনুষ্য অবতার, যাহাতে অর্দ্ধেক ঐশ্বরিক সত্ত্ব প্রবিষ্ট ছিল, রামাযণের রামচন্দ্রের অবতারে বিষ্ণু আপনার অর্দ্ধাংশ তাঁহাতে দিয়াছিলেন।

৩য়। চতুর্থাংশের অবতার, রামের ভ্রাতা ভরতে বিষ্ণুর চতুর্থাংশ ছিল।

৪র্থ। অষ্টমাংশের অবতার, রামচন্দ্রের অপর ভ্রাতৃদ্বয় লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্নের মধ্যে বিষ্ণুর অষ্টমাংশ ছিল।

৫মতঃ। মনুষ্য, ইতর প্রাণী ও নির্জীব পদার্থের মধ্যে ঐশ্বরিক গুণ প্রবিষ্ট করিয়া আংশিক দেবত্ব প্রদান করা বিষ্ণুর আংশিক অবতার বুঝায়। বর্ত্তমান কালেও বিষ্ণু মনুষ্য বিশেষকে বিশেষ বিশেষ ক্ষমতা ও গুণবিশিষ্ট করিযা থাকেন, এমন মনুষ্যগণ মৃত্যুর পর বিষ্ণুর আংশিক অবতার বলিয়া দেবস্বরূপে পূজিত হন। এইরূপে সহস্র সহস্র ব্যক্তি বিষ্ণুর অবতার বলিয়া বর্ত্তমান হিন্দু সম্প্রদাযের নিকটে পূজনীয় গণিত হইয়াছে। কোন ক্ষমতাপন্ন ধর্ম্মশীল ব্যক্তি সমাজে শিক্ষাদাতা বা সংস্কারক রূপে কার্য্য করিতে গিযা বিশেষ উদ্যোগ ও ভক্তি প্রদর্শন করিলে, হয তাঁহার জীবৎকালে, না হয়, তাঁহার মরণের পর তাঁহার অনুগামী শিষ্য ও ভক্তগণ কর্ত্তৃক দেবরূপে পূজিত হইয়া থাকেন। বুদ্ধ নিজে যদিও তৎকালপ্রচলিত হিন্দুধর্ম্মের প্রবল শত্রু ছিলেন, ও স্বকীয় শিক্ষা দ্বারা হিন্দুধর্ম্মের মূলে আঘাত করিয়া তাহার বিরুদ্ধে অনেকাংশে কৃতকার্য্যও হইয়াছিলেন; তথাপি ব্রাহ্মণেরা তাঁহাকে লইয়া বিষ্ণুর এক অবতার বলিয়া হিন্দুর উপাস্য দেবশ্রেণীর মধ্যে স্থান প্রদান করিয়াছেন।

ফলতঃ, বিষ্ণু মনুষ্যগণকে প্রতারণা ও দেবগণের ভক্তবৃন্দকে বিধর্ম্মাক্রান্ত করিয়া তাহাদের ক্ষমতা হ্রাস করণাভিপ্রায়ে বুদ্ধ রূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন! তদ্রূপ চারি শত বৎসর পূর্ব্বে চৈতন্য একজন ভক্তিপূর্ণ উপদেষ্টা জাতিভেদ শৃঙ্খল হইতে হিন্দু সমাজকে মুক্ত করণার্থে সমতা প্রচারে ব্রতী হইয়া আপনাকে কৃষ্ণের ভক্ত দাস ব্যতীত আর কিছুই বলেন নাই; কিন্তু তাঁহার শিষ্যমণ্ডলী তাঁহাকে কৃষ্ণের শ্রেণীতে উপবিষ্ট করাইয়া তাঁহার পূজা করিয়া থাকে। এইরূপে কেশবচন্দ্র সেনের অনুগামী ভক্তবৃন্দ কয়েক বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার প্রতি এত মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল, যে তাহারা কেশবকে সম্বোধন কালে যে সকল শব্দ প্রয়োগ করিত, তাহা কেবল ঈশ্বরেরই প্রতি প্রযুক্ত হইতে পারে। তাহারা কেবল সাধারণ মত ভয় করিয়া কেশবকে দেবশ্রেণীতে বসাইতে পারে নাই; তথাপি তাহার ভবিষ্যৎ উপায় কেশবের ভক্তগণ এক প্রকার স্থির করিয়া রাখিয়াছে; ফলতঃ, কেশব স্বীয় উপাসনা মন্দিরের যে মঞ্চোপরি উপবেশন করিয়া শিক্ষাদান করিতেন, অদ্যাপি কেহ তদুপরি আসীন হইতে পারে না, কেশব শরীরে না হউক, আত্মাতে এখনও উক্ত আসনে আসীন হইয়া স্বীয় পরিচর্য্যা কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছেন, কৈশব দলের মনে ঈদৃশ কুসংস্কার বদ্ধমূল হইয়া আসিতেছে। কালে মৃত কেশবের অদৃষ্ট এমন অনুকূল হইতেও পারে, যে তিনি হিন্দু দেবশ্রেণী মধ্যে স্থান প্রাপ্ত হইবেন, তাহাতে বৈচিত্র কি!! রামকৃষ্ণ পরমহংস নামে অপর এক মর্ত্ত্য ইতিমধ্যে দেবত্বপ্রাপ্ত বলিয়া অনেকের মন অধিকার করিয়া বসিয়াছেন!! কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা কৌতুকের বিষয় এই যে, বিষ্ণু ভক্তগণকে ভ্রান্ত করণাভিপ্রায়ে বুদ্ধ রূপে অবতীর্ণ হইয়া তাহাদিগকে বিপথগামী করিয়াছিলেন। এমন প্রতারণাকারী অবতার সমূহের উপর ভ্রান্ত মনুষ্য কিরূপে আত্মিক ও পারলৌকিক মঙ্গলের জন্য নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারে? হা কুসংস্কার-তমসাচ্ছন্ন ভারতবাসি! কতকাল আর এরূপে স্বার্থপরায়ণ ব্রাহ্মণদের হাতে প্রবঞ্চিত হইয়া আপনার ধন ও

জীবন সমস্তই বিসর্জ্জন দিতে থাকিবে? অতি সহজে তুমি আপনার সৃষ্টিকর্ত্তাকে সৃষ্টি করিয়া থাক, মনের মত ঈশ্বর গঠন করিয়া যে সে মর্ত্ত্যকে অমরত্ব পরিধান করাইতেছ; স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতালে সূর্য্য, চন্দ্র, নক্ষত্র, দেব দানব মানব, পশু পক্ষী কীট, দারু, প্রস্তর, পর্ব্বত প্রভৃতি আর কিছুই বাকী রাখ নাই, সকলেরই নিকট প্রণত হইয়া সৃষ্টিকর্ত্তারই প্রাপ্তব্য সৃষ্ট পদার্থকে প্রদান করিয়া ভ্রমে আপনাকে পরিতৃপ্ত বোধ করিতেছ!!

আমরা নিম্নে বিষ্ণুর দশ অবতারের কথা সংক্ষেপে বর্ণনা করিতেছি।

মানবজাতির আদিপুরুষ মনুকে সার্ব্বত্রিক জলপ্রলয় হইতে রক্ষা করণার্থে বিষ্ণু মৎস্যাবতার হইয়াছিলেন। ইনি ব্রহ্মার পৌত্র ব্যবস্থাপ্রণেতা মনু নহেন; কিন্তু বৈবস্বত মনু, বর্ত্তমান মনুষ্য জাতির আদিপুরুষ ছিলেন। সমস্ত বিশ্ব যখন পাপভ্রষ্ট হইয়াছিল, তখনও মনু তপস্যাপরায়ণ ধার্ম্মিক ব্যক্তি ছিলেন। এইজন্য ভগবান তাঁহার উপর সদয় হইয়া জাহাজ নির্ম্মাণ করিতে আদেশ প্রদান করেন; তাহাতে যখন সমস্ত বিশ্ব প্রলয় দ্বারা বিনষ্ট হইবে, তখন যেন তিনি অন্য সপ্ত ঋষি ও প্রত্যেক অপর্যাপ্ত বীজ লইয়া স্বনির্ম্মিত জাহাজে রক্ষা প্রাপ্ত হন। প্রলয়ের বন্যা উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে মনু জাহাজে আরোহণ করেন, ও বিষ্ণু তখন মৎস্য রূপ পরিগ্রহ করিলেন, এবং নিজ মস্তকে বৃহৎ এক শৃঙ্গ ধারণ পূর্ব্বক রজ্জু দ্বারা তাহাতে জাহাজ বন্ধন করিয়া রাখিলেন; এই অবতার-মৎস্য জাহাজ টানিয়া কোন পর্ব্বতময় বন্ধুর স্থানে নিরাপদে রাখিয়াছিলেন।

১ম। মৎস্যাবতার,

মৎস্য অবতারের অন্য কারণ এইরূপ বর্ণিত আছে যে, বিষ্ণু মনুকে রক্ষা করণের পর মৎস্যাবতার হইয়া হয়গ্রীব নামক দানবকে বিনাশ করিয়াছিলেন। কোন কল্পের শেষে ব্রহ্মা যখন নিদ্রিত হইয়াছিলেন, তখন হয়গ্রীব বেদ অপহরণ করিয়া মনুষ্যকুলকে অজ্ঞানতা ও অধর্ম্মে পাতিত করিয়াছিল, বিষ্ণু তাহাকে সংহার পূর্ব্বক বেদোদ্ধার করেন।

এই অবতারের তৃতীয় ইতিহাস অন্য প্রকার—মহাভারতের বাণপর্ব্বে 'ব্রহ্মা মৎস্যাবতার হইয়াছিলেন' এরূপ লেখা আছে।

মহাপ্রলয়ে কতক বহুমূল্য পদার্থ সমুদ্রগর্ভে পতিত হইয়াছিল, তাহা উদ্ধারের জন্য বিষ্ণু এই অবতার গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি কূর্ম্ম হইয়া দুগ্ধ সমুদ্রের তলদেশে অক্ষকীলক রূপে অবস্থান করিলেন ও নিজ পৃষ্ঠোপরি মন্দর গিরি ধারণ করিয়া রহিলেন, তাহার চতুর্দ্দিকে মহানাগ বাসুকীকে রজ্জুবৎ জড়াইয়া একদিকে দেবগণ ও অপরদিকে দৈত্যগণ উক্ত গিরি দ্বারা দুগ্ধসমুদ্র মন্থন করিতে লাগিলেন; তাহাতে চতুর্দ্দশ প্রকার বহুমূল্য পদার্থ উত্থিত হয়; যথা, ১ অমৃত, ২ অমৃতের পাত্রধারী দেবগণের চিকিৎসক ধন্বন্তরি, ৩ সৌভাগ্য ও সৌন্দর্য্যের দেবী লক্ষ্মী, ৪ সুরাদেবী, ৫ চন্দ্র, ৬ সুন্দরী নারীরত্নের প্রতিরূপ উপদেবী রম্ভা, ৭ আদর্শ অদ্ভুত অশ্ব উচ্চৈঃশ্রবা, ৮ কৌস্তুভ নামক আশ্চর্য্য মণি, ৯ পারিজাত নামক বাঞ্ছনীয় ফলপ্রদায়ক বৃক্ষ, ১০ প্রচুরদুগ্ধা পূর্ণা সুরভি গাভী, ১১ হস্তীজাতির আদর্শ ঐরাবত, ১২ শঙ্খ, তন্নিনাদে বিজয়লাভ নিশ্চিত, ১৩ ধনু, তাহা অভ্রান্ত ছিল, ১৪ বিষ।

২য়। কূর্ম্ম,

বাঞ্ছিত অমৃত উত্থিত হইলে অসুরগণকে বঞ্চনা করণাভিপ্রায়ে বিষ্ণু মোহিনী বেশ পরিগ্রহ করেন, তাহারা বাস্তবিক প্রবঞ্চিত হইয়া মোহিনীমূর্ত্তি-ধারী বিষ্ণুর পশ্চাৎ ধাবিত হয়, এই অবকাশে দেবগণ অমৃত পান করিয়া অমর হইয়া উঠিলেন।

বরাহ, এবারে বিষ্ণু হিরণ্যাক্ষ দৈত্যরাজের হস্ত হইতে পৃথিবীকে উদ্ধার করণার্থে বরাহরূপে (শক্তির প্রতিরূপ) অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। দৈত্য পৃথিবীকে ধরিয়া সমুদ্রগর্ভে নিমগ্ন করিয়াছিল; তখন বিষ্ণু বরাহরূপ পরিগ্রহ করিয়া অতল সমুদ্রগর্ভে ডুব দিয়া সহস্র বর্ষ পর্য্যন্ত উক্ত দৈত্যের সহিত সংগ্রাম করিয়া তাহাকে নিহত ও পৃথিবীকে পুনরুত্তোলিত করিলেন। প্রাচীন

৩য়। বরাহ,

উপাখ্যান অনুসারে বিশ্ব জলপূর্ণ ও পৃথিবী তাহার অধোভাগে নিমগ্ন বলিয়া বর্ণিত হয়, তখন ঐশ্বরিক বরাহ আপন দন্ত দ্বারা তাহা উত্তোলন করেন।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই তিন অবতারের ইতিহাসেই জলপ্রলয়ের ঘটনা বিবৃত হইয়াছে।

৪র্থ। নৃসিংহ,

হিরণ্যকশিপু নামক মহাদৈত্য ব্রহ্মার বরে অতিশয় অত্যাচারী হইয়া উঠিয়াছিল, ফলতঃ, ব্রহ্মা তাহাকে বর দিয়াছিলেন যে, সে দেবতা মানব বা জন্তুর হস্তে নিহত হইবে না। এই বরের গুণে সে ত্রিজগত জয় করিয়া অতিশয় অত্যাচার করিতে আরম্ভ করে, ও দেবতাদের প্রাপ্য বলিদানের অধিকার অন্যায় পূর্ব্বক গ্রহণ করে। তাহার ধার্ম্মিক পুত্র প্রহ্লাদ বিষ্ণুর প্রতি ভক্তিমান হইয়া তাঁহার প্রশংসা ও স্তব করিতে নিরস্ত হয় নাই। ইহাতে দৈত্যরাজ রাগান্ধ হইয়া বিষ্ণুভক্ত তনয়ের বিনাশার্থে কৃতসংকল্প হইয়াছিল, তখন বিষ্ণু প্রস্তর-বিনির্ম্মিত স্তম্ভ ভেদ করিয়া নৃসিংহ রূপে দৈত্যের সম্মুখীন হইয়া তাহাকে খণ্ডবিখণ্ড করিলেন।

৫ম। বামন,

উপরোক্ত চতুর্ব্বিধ অবতারের ঘটনা সত্যযুগে সংঘটিত হয়। বলিরাজা স্বর্গমর্ত্ত্য ও পাতালের রাজত্ব অধিকার করিয়াছিল; বিষ্ণু তাঁহাকে অধিকার চ্যুত করণাভি-প্রায়ে ক্ষুদ্রকায় বামনরূপে উপস্থিত হইয়া বলির নিকটে ত্রিপাদ পরিমিত ভূমি যাচ্ঞা করেন; তাঁহার অকিঞ্চিৎকর প্রার্থনা বিনা আপত্তিতে গ্রাহ্য হইলে বিষ্ণু দুই পাদবিক্ষেপে স্বর্গ ও পৃথিবী অধিকার করিলেন; কিন্তু তৎপ্রতি সদয় হইয়া পাতা-লের উপরে আর তৃতীয় পাদবিক্ষেপ করিলেন না, তাহা বলির অধিকারেই রহিল।

ত্রেতাযুগে বিষ্ণু ভৃগুর বংশে জমদগ্নির পুত্ররূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ক্ষত্রিয়গণ গর্ব্বান্ধ হইয়া শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ কুলের

৬ষ্ঠ। পরশুরাম (কুঠার-ধারীরাম),

উপরও কর্ত্তৃত্ব বিস্তার করিয়াছিল, তাহারা বেদসঙ্গত কার্য্যের বিরোধী হইয়া স্বেচ্ছাচারে প্রবৃত্ত হয়, একারণ ধরা ক্ষত্রিয়শূন্য করণাভিপ্রায়ে বিষ্ণু পরশুরাম নামে অবতার হইয়া একবিংশ ব ব পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয়া করেন।

এ অবতারের অন্য কারণ এইরূপ কথিত হয়, ক্ষত্রিয়গণ পরশুরামের পিতাকে বধ করিয়াছিল বলিয়া তিনি পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয়া করিতে সঙ্কল্প করিয়া একবিংশ বার ক্ষত্রিয় জাতির শোণিতে পৃথিবী প্লাবিত করেন, ও তাহাতে পাঁচটী হ্রদ পরিপূরিত করিয়াছিলেন। কতকগুলি ক্ষত্রিয় শিশু অপর জাতির মধ্যে সংগোপনে রক্ষিত হইয়া তাঁহার কোপ হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছিল, ও কিছুকাল পরে তাহারা যোদ্ধা হইয়া উঠে; কিন্তু তিনি একে একে তাহাদিগকেও বিনষ্ট করিয়া ক্ষত্রিয় পুরুষ মাত্রকেই নিঃশেষ করেন। এই সুযোগে ব্রাহ্মণেরা ক্ষত্রিয় নারীগণকে লইয়া সহবাস করিতে লাগিলেন।

ব্রাহ্মণদের সুবিধার জন্য নিষ্ঠুরতার সহিত এইরূপ সমস্ত একটী জাতি নাশ করা ঈশ্বরাবতারের কার্য্য নহে। পরশুরামকে প্রতিহিংসার অবতার আখ্যা প্রদান করা অসঙ্গত নয়।

৭ম। রামচন্দ্র,

'সূর্য্যবংশীয় অযোধ্যার রাজা দশরথের পুত্র ক্ষত্রিয় ছিলেন। তিনি মহাকাব্য রামায়ণের বীর; লঙ্কাধিপতি রাক্ষসচূড়ামণি রাবণের পরাক্রমে স্বর্গ, মর্ত্ত্য নরক অস্থির হইয়াছিল, তাহার নিধনার্থে বিষ্ণু ত্রেতাযুগের শেষভাগে রামরূপে অবতীর্ণ হইয়া লঙ্কার রাক্ষসকুল ধ্বংস করিয়াছিলেন। বাল্মিকি নারদকে জিজ্ঞাসা করেন, "সমস্ত ভূতলের মধ্যে কে সর্ব্বাপেক্ষা সাহসী ও শ্রেষ্ঠ মনুষ্য।" তদুত্তরে নারদ অযোধ্যাধিপতি দশরথ-তনয় রামের নাম ও ইতিহাস উল্লেখ করেন। বাল্মিকি তাহা লইয়া সুললিত কবিতায় রামায়ণে বর্ণনা করিয়াছেন। এই গ্রন্থ সম্বন্ধে এইরূপ উক্তি আছে, "যে কেহ এই জীবন-প্রদ

রামায়ণ পাঠ ও আবৃত্তি করে, সে আপনার সমস্ত পাপের মোচন প্রাপ্ত হয়, ও স্ববংশে উচ্চতম স্বর্গের অধিকারী হইয়া উঠে।

হিন্দু সাহিত্যে সীতার চরিত্র অতি শ্রেষ্ঠ, রামের চরিত্র কোন অংশে তাহার তুল্য না হইলেও তাঁহার স্বভাবে বিশেষ সৌন্দর্য্য দৃষ্ট হয়। রামায়ণের মধ্যে কতকগুলি উৎকৃষ্ট বিষয়ের বর্ণনা আছে, কিন্তু বহুসংখ্যক অসঙ্গত ও বিরুদ্ধ বর্ণনা তন্মধ্যে পাওয়া যায়। ইহাতে দেবতা বা অর্দ্ধদেবতাগণের আকার প্রকার ও কার্য্যাদির বিষয় যেরূপ বর্ণনা আছে, তাহা অতি ভয়ানক, বিশ্রী ও নিতান্ত অবিশ্বাসজনক; ইহা দেব, দানব, রাক্ষস, হনুমান, বহুমস্তকধারী অদ্ভুতাকার জীবের বর্ণনায় পূর্ণ। অশিক্ষিত হিন্দুর মন এমন নিতান্ত অসঙ্গত ও অদ্ভুত বিষয়ও বিশ্বাস করিতে কুণ্ঠিত নহে।

যে কালে রামায়ণ লেখা হইয়াছিল, তখন ভারতবর্ষে রাজপথ বা রেলওয়ে ছিল না, অতএব লেখক লঙ্কার বর্ণনা করিতে গিয়া আপন কবিকল্পনাকে যথেচ্ছানুসারে ধাবিত হইতে দিবার সুবিধা পাইয়াছেন। লঙ্কা এক্ষণে ইংলণ্ডেশ্বরীর অধীন, রামায়ণে বর্ণিত ইতিহাস কল্পিত গল্প ভিন্ন আর কিছুই নয়, তাহা সুস্পষ্ট দৃষ্ট হয়।

রামচন্দ্রের ইতিহাস পাঠে তাঁহাকে মানব-বীর ভিন্ন ঈশ্বর বলিয়া কোন মতে বিশ্বাস করা যায় না; বুদ্ধি ও ক্ষমতাতে তিনি মানবীয় সীমা অতিক্রম করেন নাই, যাহা কিছু মানবাতীত বলিয়া বোধ হয়, তাহা কবির কল্পনা ভিন্ন আর কিছু নয়। তাঁহার ইতিহাসে এমন সকল বর্ণনা আছে, যাহা ঈশ্বরের যোগ্য হইতে পারে না।

কৃষ্ণ ভারতবর্ষের দেবগণের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। দ্বাপর যুগের শেষাংশে চন্দ্রবংশে বসুদেব ও দেবকীর অষ্টম পুত্র রূপে বিষ্ণু জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। দুরাত্মা রাজা কংসের বিনাশ সাধন করা বিষ্ণুর এ অবতারের উদ্দেশ্য ছিল।

৮ম। কৃষ্ণ,

কৃষ্ণের জীবনের শেষাংশের ইতিহাস মহাভারতের শেষভাগে বর্ণিত হইয়াছে; কিন্তু কৃষ্ণের ইতিহাস বর্ণনা করা মহাভারত কাব্যের উদ্দেশ্য নয়, তিনি উক্ত কাব্যের প্রধান নায়ক নহেন, ফলতঃ, পাণ্ডবগণই মহাভারতের বীর, কৃষ্ণ তাঁহাদের প্রধান সহায় ও মন্ত্রণাদাতারূপে বর্ত্তমান ছিলেন। তাঁহার দেবত্ব-প্রাপ্তি নির্ব্বিবাদে সকলের অনুমোদিত নহে। তাঁহার যৌবন কালীয় কার্য্য ও লীলাদি মহাভারতে পাওয়া যায় না, কিন্তু হরিবংশে, পুরাণে, ও বিশেষরূপে ভাগবতপুরাণের ১০ম খণ্ডে বিস্তৃতরূপে বর্ণিত হইয়াছে, তাহা হইতে আমরা কৃষ্ণের বিষয়ে এইরূপ জানিতে পারি।

যযাতির পুত্রদ্বয় যদু ও পুরু চন্দ্রবংশের দুই প্রসিদ্ধকুলের প্রতিষ্ঠাতা। এই যদুবংশীয় বসুদেবের রোহিণী ও দেবকী নাম্নী দুই পত্নী। দেবকীর পিতৃব্যপুত্র দুরাচার কংস মথুরার রাজা ছিল, তাহার সম্বন্ধে এইরূপ দৈববাণী হইয়াছিল যে, দেবকীর গর্ভজাত পুত্র তাহার বিনাশ সাধন করিবেন। তজ্জন্য কংস বসুদেব ও দেবকীকে কারারুদ্ধ রাখিয়া দেবকীর গর্ভজাত ছয় পুত্রের প্রাণনাশ করেন। সপ্তম পুত্র বলরামের জন্ম হইবামাত্র বসুদেব তাহাকে রোহিণীর ক্রোড়ে দিয়া তাহারই গর্ভজাত বলিয়া তাহার প্রাণরক্ষা করেন। অষ্টম পুত্র কৃষ্ণবর্ণ কৃষ্ণ বক্ষো-পরি 'শ্রীবৎস' চিহ্ন ধারণ পূর্ব্বক দেবকীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার জন্মের পরক্ষণেই বসুদেব শিশুকে লইয়া মথুরা হইতে পলায়ন করেন ও দেবগণের প্রসাদে কৃতকার্য্য হইয়া গোপ-নন্দ ও তাহার পত্নী যশোদার হস্তে কৃষ্ণকে সমর্পণ করিয়া যশো-দার নবপ্রসূত কন্যা লইয়া দেবকীর ক্রোড়ে অর্পণ করেন। নন্দ শিশু কৃষ্ণকে লইয়া প্রথমে গোকুল বা ব্রজধামে কিছুকাল অবস্থান করিয়া পরে বৃন্দাবনে প্রস্থান করেন। বলরাম ও কৃষ্ণ তথায় একত্র অবস্থান ও বাল্যকাল যাপন করেন, গোপ বালকদের সঙ্গে বনে ও প্রান্তরে একত্রে ক্রীড়াদি করিতেন। বাল্যকালেই কৃষ্ণ কালীয় নাগ বিনাশ করেন, গোপীগণকে ইন্দ্রের কোপ হইতে রক্ষা করণার্থে গিরিবর গোবর্দ্ধনকে অঙ্গু-

লির অগ্রভাগ দিয়া উত্তোলন কবিয়া গোপিনীদের আশ্রয় স্থান করিয়া দিয়াছিলেন। কৃষ্ণেব প্রবৃত্তি অনুসাবে গোপীগণ গোবর্দ্ধনেব পূজায় বত হইযাছিল, ইহাতে ইন্দ্র বাগান্বিত হইযা তাহাদিগকে বন্যা ও বৃষ্টি দ্বাবা সংহাব কবিতে মনস্থ কবিয়াছিলেন, এমন অবস্থায় কৃষ্ণ উক্ত আশ্চর্য্য উপায অবলম্বন করিয়া তাহাদিগকে বাঁচাইয়াছিলেন। কৃষ্ণ এই গোপপত্নী ও কন্যাগণেব সঙ্গে সর্ব্বদাই ক্রীডায় বত থাকিতেন; তাহাদেব মধ্যে আটজন, বিশেষরূপে রাধা, তাঁহাব প্রিবতমা ছিল। কংসকে বিনাশ কবণেব পর মথুবাবাসী সকলকে লইয়া গুজবাট প্রদেশে প্রস্থান কবেন, ও তথায দ্বাবকাপুবা নির্ম্মাণ কবিয়া বাস কবেন।

কৃষ্ণেব ইতিহাস বাস্তবিক বিস্ময়কব বলিতে হইবে, সাধাবণ মর্ত্ত্য একটী বীব তিনি ছিলেন; ক্রমশঃ তাঁহার ভক্তবৃন্দেব দ্বাবা প্রধান দেবরূপে পবিণত হইযা উঠিয়াছেন।

বিষ্ণুপুবাণে বর্ণিত আছে, পৃথিবী গাভী রূপে বিষ্ণু সমীপে উপস্থিত হইয়া কংসেব দৌবাত্ম্য উল্লেখ কবেন, তাহাতে দেবশ্রেষ্ঠ আপনাব শ্বেত ও কৃষ্ণবর্ণ দুইটী কেশোৎপাটন কবিয়া দেবগণকে কহিলেন, 'আমাব এই কেশদ্বয় পৃথিবীতে গিয়া তাহাব দুঃখেব ভার লাঘব কবিবে।' ঐ শ্বেতবর্ণ কেশ বলবাম ও কালটী কৃষ্ণ হইযাছিলেন।

কৃষ্ণেব ইতিহাস মহাভাবত, ভাগবতপুবাণ ও অন্য গ্রন্থে বিস্তৃতরূপে বর্ণিত হইয়াছে। ভাগবতপুবাণেব দশম খণ্ড প্রেমসাগব নামে হিন্দী ভাষাতে অনুবাদিত হইয়াছে।

কৃষ্ণের ইতিহাসেব অনেক প্রচলিত গল্প আছে; তিনি নবনীত চোর ছিলেন ও তাহা গোপনার্থে মিথ্যা কথা বলিতেন। গোপীগণেব সহিত তাঁহাব কদাচারেব অনেক বর্ণনা পাওযা যায়; তাঁহাব শ্রেষ্ঠা প্রণয়িনী বাধা আযানঘোষ নামক গোপের পত্নী; পবপত্নীব সহিত তিনি প্রেমলীলা কবিতে বিশেষ আনন্দ অনুভব করিতেন। কথিত আছে, কৃষ্ণেব ১৬১০০ পত্নী ও ১৮০০০০ পুত্র ছিল।

হরিবংশে তাঁহার বৃত্তান্ত লিখিত আছে। যাদবগণ সমুদ্র-তীরস্থ দ্বারকার নিকটবর্ত্তী পিণ্ডারক নামক তীর্থস্থানে প্রয়াণ করেন। তাঁহারা আপনাদের পরিবার ও সহস্র সহস্র সভাসদ নাগরিককে সঙ্গে লইয়া তথায় গিয়াছিলেন। স্নান, ভোজন, পান ও নৃত্য-গীতাদিতে তাঁহারা মহানন্দে দিন যাপন করিতে লাগিলেন। দগ্ধ মহিষমাংস তাঁহাদের প্রধান ভোজনোপকরণ ছিল। তাঁহারা পঞ্চবিধ তীব্র সুরা এত অধিক পান করিয়াছিলেন যে, কেহ স্খলিত-পদ, কেহ ভূতলশায়ী, কেহ বা সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িলেন; তখন স্ত্রীপুরুষ, সভাসদ প্রভৃতি সকলে একসঙ্গে নৃত্য করিতে লাগিলেন, ঋষিবর নারদ আসিয়া এই আমোদ ও নৃত্যে যোগ দিলেন। মাতালদের কার্য্যের পরিণাম যেরূপ হয়, এখানে তাহাই ঘটিয়াছিল। এই প্রমত্ত দল ক্রমে২ পরস্পর কলহ ও যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল; কৃষ্ণ প্রথমতঃ তাহাদিগকে নিবারণ করিতে চেষ্টিত হইয়াছিলেন, কিন্তু অকৃতকার্য্য হইয়া শেষে ক্রোধাবেশে তাহাদের সহিত যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়া একে একে যাদবগণের অনেককে ও নিজ পুত্রগণকে সংহার করিলেন। বংশের মধ্যে কেবল তিনি ও বলরাম অবশিষ্ট রহিলেন। বলরাম নিজ মুখনির্গত সর্পদষ্ট হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। কৃষ্ণের বিষয়ে কথিত আছে, তিনি একদা দুর্ব্বাসা মুনির আতিথ্য করেন, তাঁহার পরিবেশনকালে মুনির পাদদেশে পতিত একটী অন্ন কৃষ্ণ অপসারণ না করাতে মুনি অভিসম্পাত করেন যে, তাঁহাকে পাদদেশে আহত হইয়া মরিতে হইবে। কৃষ্ণ যখন কোন বৃক্ষতলে ধ্যান-মগ্ন ছিলেন, তখন জনৈক ব্যাধ মৃগভ্রমে তীরবিদ্ধ করিয়া তাঁহার প্রাণ সংহার করে।

মহাভারতে কৃষ্ণকে মহাবীর বলিয়া দেখান হইয়াছে। কৃষ্ণ যখন অর্জ্জুনকে সঙ্গে লইয়া শিবের নিকট দিব্যঅস্ত্র যাচ্ঞা করিতে গিয়াছিলেন, তখন, কথিত আছে যে, "তিনি স্বীয় স্বর, মন, জ্ঞান ও কার্য্যে শিবের অর্চ্চনা করিয়াছিলেন।" আর এক স্থলে এইরূপ লেখা আছে, "মাধব পূর্ণ সহস্র বৎসর তপস্যা করিয়া বরদাতা শিবের তুষ্টিসাধন করিলেন।" আবার মহা-

ভারতের অন্য স্থলে, কৃষ্ণ যেমন শিবের, তেমনি শিবও কৃষ্ণের স্তব করে। এইরূপ বিরুদ্ধতা দৃষ্টে, ইহা অতি স্পষ্ট প্রতীত হয় যে, এই সকল বাক্য ভারতবর্ষে শিবের পরিবর্ত্তে কৃষ্ণের উপাসনা প্রচলিত হইলে পর, নিশ্চয়ই মহাভারত মধ্যে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে।

ভাগবতগীতায় কৃষ্ণ বলেন, "হে ভরতবনয়, পৃথিবীতে যখন কর্ত্তব্যকার্য্যের শৈথিল্য ও অধর্ম্মের প্রাবল্য ঘটে, তখনই সতের রক্ষার্থে ও দুষ্কর্ম্মীবর্গের বিনাশার্থে আমি জন্ম-পরিগ্রহ করি; নরগণকে কর্ত্তব্য-জ্ঞান দেওনার্থে আমি সকল কালেই উৎপন্ন হইয়া থাকি।"

অবতারের কারণ বলিয়া উপরোক্ত বাক্যে যাহা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তদ্দ্বারা কৃষ্ণের জীবনী বিচার করিলে তাঁহার ঈশ্বরাবতারের দাবি খণ্ডিত হয়। ভাগবত-পুরাণে যে কৃষ্ণের চরিত্র বর্ণিত আছে, তাঁহারই সংহারার্থে ভাগবতগীতা-বর্ণিত কৃষ্ণের অবতারের আবশ্যকতা দৃষ্ট হয়।

কৃষ্ণের চরিত্র যেরূপে বর্ণিত হইয়াছে, তদ্দ্বারা হিন্দু যুবকের চরিত্র কলুষিত ও নীতি দূষিত হইবারই বিলক্ষণ সম্ভাবনা। কৃষ্ণকে বাস্তবিক কুঅভিলাষ চরিতার্থের প্রত্যক্ষ অবতার বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

অনেকে কৃষ্ণকে বিষ্ণুর অবতার না বলিয়া স্বয়ং বিষ্ণুই বলিয়া থাকে, তাহারা বলরামকে কৃষ্ণের স্থলে বিষ্ণুর অষ্টম অবতার কল্পনা করে।

ব্রাহ্মণেরা বৌদ্ধগণকে হিন্দু দলভুক্ত করণার্থে বুদ্ধকে বিষ্ণুর এক অবতার বলিয়া কল্পনা করিয়াছে। বৌদ্ধগণকে লাভ করিবার অভিপ্রায়ে বৌদ্ধরূপ পরিগ্রহ করিয়া ব্রাহ্মণেরা ভারতের বৌদ্ধধর্ম্ম প্রায় বিলুপ্ত করিয়াছে, অতি অল্পসংখ্যক জৈন নামক বৌদ্ধসম্প্রদায় ব্রাহ্মণদের এই কৌশলে সম্মতি প্রদান না করিয়া ভারতে বৌদ্ধধর্ম্মের অস্তিত্ব রক্ষা করিয়া আসিতেছে। বিষ্ণুর এই অবতারের কারণ এইরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে যে, বিষ্ণু এই চতুর্থ যুগে নাস্তিক

৯ম। বুদ্ধ।

দার্শনিকের রূপ ধারণ পূর্ব্বক দৈত্য, দানব ও ভ্রষ্ট মানবগণকে ভ্রান্ত করিয়া দেবগণের অস্তিত্ব অস্বীকার করিতে, জাতিভেদ প্রথা অমান্য করিতে ও বেদ শাস্ত্র তুচ্ছ করিতে প্রবৃত্তি ও শিক্ষা দেন, তদ্দ্বারা তাহারা আপনাদেরই বিনাশ সাধন করিয়াছিল ; ফলতঃ বিষ্ণুই সকলকে এইরূপ ভ্রান্ত ও বিনাশের পাত্র করিয়া তুলেন! ব্রাহ্মণেরা অন্যান্য স্থলে যেরূপ আপনাদের প্রাধান্য রক্ষার্থে অপর অপর ধর্ম্মাবলম্বীদের আরাধ্য বস্তু ও ব্যক্তিকে হিন্দুধর্ম্মের পবিত্র, আরাধ্য দেবশ্রেণীর মধ্যে স্থান দিয়াছে, বুদ্ধ সম্বন্ধেও তাহাই করিয়াছে। আজকাল অনেকে খ্রীষ্টকেও বিষ্ণুর এক অবতার বলিয়া গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

বুদ্ধের সংক্ষিপ্ত জীবন ও শিক্ষা আমরা স্বতন্ত্ররূপে পরে বর্ণনা করিব।

বর্ত্তমান কলিযুগের অবসানে যখন সকলে ধর্ম্মহীন হইয়া পড়িবে, তখন এই অবতারের উদয় হইবে। তৎপূর্ব্বে ধন ও ধর্ম্ম লুপ্ত হইবে লোকে রাজগণের গুরুভার বহনে অক্ষম হইয়া পর্ব্বতের উপত্যকা প্রদেশে আশ্রয় লইবে, ও বন্য মধু, ফল, মূল, ফুল, পত্রদ্বারা জীবন ধারণ করিবে। ২৩ বৎসরের অধিক পরমায়ু কাহারও হইবে না, তখন বিষ্ণু যোদ্ধার বেশ ধারণ করিয়া আসিবেন, সহস্র ব্রাহ্মণ তাঁহার সঙ্গে আসিবে তাহারা বিরোধী ও ধর্ম্মহীনদিগকে নিঃশেষে সংহার করিবে। অনন্তর বিষ্ণু নূতন সৃষ্টি করিয়া পুনরায় পবিত্র বা সত্যযুগ স্থাপন করিবেন। অনেকে বলেন, কল্কি আকাশমার্গে শ্বেত অশ্বোপরি উপবিষ্ট ও ধূমকেতুর ন্যায় উজ্জ্বল অসি হস্তে ধারণ করত সুপ্রকাশ হইবেন। কখন কখন ইহার নাম অশ্বাবতারও বলিয়া থাকে।

১০। কল্কি,

কিন্তু এই সত্যযুগও চিরস্থায়ী নয়, আবার একে একে অন্য সকল যুগ সত্যযুগের অনুগামী হইবে; পরবর্ত্তী যুগ পূর্ব্ববর্ত্তী অপেক্ষা হীন ও মন্দ হইতে থাকিবে।

হিন্দুরা কাল চারি ভাগে বিভক্ত করে, ১ম, কৃত বা সত্যযুগ, তাহা ১৭,২৮,০০০ বৎসর পরিমিত কাল স্থায়ী ছিল। ২য়,

ত্রেতা, ইহার পরিমাণ ১২,৯৬,০০০ বৎসর। ৩য়, দ্বাপরযুগ ৮,৬৪,০০০ বৎসর পরিমিত ও ৪র্থ, কলিযুগ ৪,৩২,০০০ বৎসর স্থায়ী হইবে। এই সমস্ত কালের সহস্র গুণ সময়ে এক কল্প গণিত হয়, তাহা ব্রহ্মার এক দিন। ব্রহ্মার পরমায়ু এক শত বৎসর, তাহার এক এক বৎসর তাঁহার ৩৬০ দিনে হইয়া থাকে।

শিব।

ভারতবর্ষের উত্তরাংশে বৈষ্ণবদের সংখ্যা অধিক, দক্ষিণে শৈবদিগের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অধিক। ১৮৮১ অব্দের জন-সংখ্যায় তথায় শৈব-সংখ্যা ১,৫৫,০০,০০০ ও বৈষ্ণব-সংখ্যা ১,০৫,০০,০০০ গণিত হইয়াছিল।

বেদে শিবের নামও পাওয়া যায় না; কিন্তু তাঁহার সম্ভ্রমার্থে তাঁহাকেই বেদের রুদ্র বলা হয়। বেদে রুদ্রকে উচ্চরাবী ভীষণ-দেব, মরুতের পিতা বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। কখনও তাঁহাকে মনুষ্য ও পশুর সংহারক দেব, কখন বা তাঁহাকে আরোগ্যকারী হিতসাধক বলিয়া বিবেচনা করা হয়।

রামায়ণে শিব মহাদেব নামে পরিচিত, কিন্তু তাঁহার পদ বিষ্ণুর নীচে দেখান হইয়াছে। মহাভারতে বিষ্ণুর উপরেই শ্রেষ্ঠ সম্ভ্রম আরোপিত হইয়াছে, কিন্তু স্থলবিশেষে শিবের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করা হইয়াছে। এইরূপ বিরুদ্ধ দাবি ও মত সম্মি-লিত করিতে গিয়া কখন বা শিব ও বিষ্ণুকে একই অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে।

শৈব পুরাণে শিবের শ্রেষ্ঠত্ব ব্যক্ত আছে, এবং তাঁহার মাহাত্ম্য-প্রকাশক বহুসংখ্যক গল্পেরও উল্লেখ আছে। লিঙ্গ পুরাণে লিখিত আছে—শিব ব্রহ্মাণ্ড হইতে নিজ স্বরূপ গ্রহণ করিয়া আপনার বামপার্শ্ব হইতে বিষ্ণু ও লক্ষ্মীকে, ও দক্ষিণ-পার্শ্ব হইতে ব্রহ্মা ও সরস্বতীকে উৎপন্ন করিয়াছেন। শিব নর-কঙ্কাল ও মুণ্ড-বিনির্ম্মিত মালা গলে ধারণ করেন ও হস্তে একটী

মুণ্ড বহন করেন। তৎসম্বন্ধে শৈব পুরাণের উক্তি এইরূপ,—প্রত্যেক কল্পের শেষে শিব অন্যান্য সৃষ্টির সঙ্গে ব্রহ্মা ও বিষ্ণুকে সংহার করেন; কিন্তু তিনি তাঁহাদের অস্থি ও মুণ্ড লইয়া মাল্য-রূপে ব্যবহার করেন, আর যে নরমুণ্ড তিনি হস্তে ধারণ করেন, তাহা ব্রহ্মার মধ্যখানের মস্তকাস্থি। তিনি ব্রহ্মার মধ্যশিরঃ ছেদন করিয়াছিলেন, এই জন্য শিবের 'কপালী' নামকরণ হই-য়াছে। শিব নিজ শরীরে যে ভস্ম লেপন করেন, তাহার গল্প এইরূপ,—পুরাকালীয় কোন এক কল্পের অবসানে শিব স্বীয় মধ্যাক্ষি নিঃসৃত অগ্নিস্ফুলিঙ্গ-দ্বারা ব্রহ্মা ও বিষ্ণুকে ভস্ম করিয়া ফেলেন, অনন্তর সেই ভস্ম তিনি স্বীয় শরীরের ভূষণরূপে ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন; এই কারণে শৈবেরা বলিয়া থাকে, "পবিত্র ভস্মবিহীন কপাল সৌন্দর্য্যবর্জ্জিত।"

বৈষ্ণব ও শৈবদিগের মধ্যে আপনা আপন দেবের প্রাধান্য লইয়া অনেকবার বিবাদ ঘটিয়াছে।

শিবপত্নী পার্ব্বতী স্বামীর কদাচার ও বেশ্যাসক্তির জন্য অনেকবার তিরস্কার করিয়াছেন। মাদক সেবনদ্বারা তিনি পত্নীর প্রায় সর্ব্বনাশ করিতেন, দিবারাত্র মাদক সেবনে চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া থাকিতেন। তিনি অত্রি মুনির সম্মুখে উলঙ্গ হইয়া নৃত্য করাতে মুনির অভিসম্পাতে তাঁহার এমন লজ্জাকর দুর্দ্দশা ঘটে যে, তাহা ব্যক্ত করাই লজ্জাজনক। তিনি মোহিনীর প্রতি এতদূর কুঅভিলাষ-পরায়ণ হইয়াছিলেন যে, তাঁহাকে একবার-মাত্র সম্ভোগ করিতে ইচ্ছুক হইয়া আপনার তপস্যালব্ধ তাবৎ পুণ্য ও বর হইতে বঞ্চিত হইতে প্রস্তুত ছিলেন। দক্ষ শিবের সঙ্গে আপন কনিষ্ঠা তনয়ার বিবাহ দেন; কিন্তু পরে জামাতাকে ভস্মমাখা শ্মশানবাসী, নৃমুণ্ডমালাধারী ভিক্ষুক দেখিয়া রাগান্বিত হইয়া উঠেন। একদা রাজা দক্ষ মহাযজ্ঞ করিয়াছিলেন, শিব-পত্নীও তাহাতে উপস্থিত হন, দক্ষ কন্যার হীনবেশ ও জামা-তার কদাচার বশতঃ কন্যাকে তিরস্কার করেন; তাহাতে তিনি অগ্নিতে পতিতা হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। তাহাতে শিব মহাকোপান্বিত হইয়া ত্রিনেত্রধারী বীরভদ্র নামক দৈত্যকে

উৎপন্ন করেন ও তদ্দ্বারা দক্ষের যজ্ঞনষ্ট ও শিরশ্ছেদন করেন। অনন্তর ব্রহ্মা ও বিষ্ণু আসিয়া শিবের চরণে পতিত হইয়া তাঁহার স্তব আরম্ভ করেন, তাঁহাদের প্রার্থনাতে শিব ক্রোধ সম্বরণ করিয়া দক্ষের স্কন্ধদেশে অজামস্তক বসাইয়া তাহাকে পুনর্জীবিত করেন। এই গল্প অন্য প্রকারেও বর্ণিত হইয়াছে; হরিবংশে বিষ্ণুর মাহাত্ম্য-প্রকাশার্থে লিখিত আছে, যজ্ঞনষ্ট হইলে ও দেবগণ পলায়ন করিলে পর, বিষ্ণু আসিয়া শিবের গলা টিপিয়া তাহাকে এমন দৃঢ়রূপে ধরিলেন যে, অবশেষে শিব ক্ষান্ত হইয়া বিষ্ণুকে প্রভু স্বীকার করেন।

নিতান্ত অসভ্য ব্যতীত আর সমস্ত জাতীয় লোকে আপনাদের শরীরের যে অংশ আচ্ছাদন করিয়া থাকে, নির্লজ্জ শৈবদের কাছে তাহাই পূজনীয় পদার্থ; স্ত্রীলোকেরা অবাধে ঈদৃশ লজ্জাকর লিঙ্গ-প্রতিকৃতির পূজা করিতে কুণ্ঠিত হয় না; ইহাতে তাহাদের নীতি কতদূর কলুষিত, তাহা অনুমান করিতে পারা যায়।

শৈব সন্ন্যাসীগণ আপনাদের দেবতার অনুকরণ করিয়া থাকে, তাহারা ভারতবর্ষের মধ্যে অতি অধম লোক। হিন্দুদিগকে সাধারণতঃ আপনাদের ব্যবহারে ও পরিচ্ছদে পরিচ্ছন্ন বলিতে হইবে; কিন্তু এই সন্ন্যাসীরা পবিত্রভাব ভান করিয়া অতি কদর্য্য মালিন্যে অবস্থান করে। শৈব ভিক্ষুকেরা রুচিবিরুদ্ধ ময়লার অভিলাষী, কেহ কেহ প্রায় উলঙ্গাবস্থায় ভ্রমণ করে; কার্য্যক্ষম ও বলবান হইলেও অন্যের উপার্জ্জনের উপর নির্ভর করিয়া আলস্যে জীবন কাটায়। কেহ তাহাদিগকে ভিক্ষা দিতে অস্বীকার করিলে, তাহাকে অতি ভয়ানক অভিসম্পাত করিয়া থাকে। গাঁজা, ভাঙ্গ প্রভৃতি মাদক সেবন করিয়া আপনাদিগকে নেশায় ঘোর করিয়া রাখে; তাহাদের নীতিজ্ঞান অতিশয় দূষিত। এমন দুর্নীতিপরায়ণ ব্যক্তিগণকে হিন্দুধর্ম্মে সাধু ও পবিত্র আখ্যা প্রদান করে, ইহাতেই হিন্দুধর্ম্মের বিকৃত নীতি সুস্পষ্ট দৃষ্ট হয়।

শিবের উপাসনা অধিকাংশ স্থলে ব্রাহ্মণেরা ও তাহাদের

দ্বারা শিক্ষিত লোকেরাই করিয়া থাকে। উত্তর ভারতবর্ষে তাঁহাকে অপেক্ষাকৃত অল্প লোকেই আপনাদের ইষ্টদেব স্বরূপে গ্রহণ করে। তাঁহার সম্বন্ধে লিখিত পুস্তকের সংখ্যাও অল্প। শিবের উদ্দেশে যে সকল মন্দির প্রতিষ্ঠিত আছে, তাহাতে কেবল শিবলিঙ্গের প্রতিকৃতি দৃষ্ট হয়; কিন্তু কৃষ্ণ বা জগন্নাথের মন্দির গুলির ন্যায় এ গুলি তত প্রসিদ্ধ নয়। পার্ব্বতী, দুর্গা, কালী প্রভৃতি তাঁহার ভিন্ন ভিন্ন নামধারী পত্নীর উদ্দেশে যে সকল পূজাস্থান প্রতিষ্ঠিত আছে, লোকে তাহা সমধিক ভক্তি পূর্ব্বক দর্শন ও উপাসনা করিয়া থাকে। শিবকে আপনাদের ভয়-পাত্ররূপে দেখিয়া থাকে, আর ভয় প্রযুক্তই তাঁহার পূজা করিতে বাধ্য হয়। হৃদয়ের ভক্তির বশীভূত হইয়া লোকে কৃষ্ণের উপাসনা করে; কিন্তু শিব কর্কশ, নিষ্ঠুর ও ভয়াবহ বলিয়া তাঁহার পূজাতে প্রবৃত্ত হয়। শিবের উপাসকদের মধ্যে প্রায় সর্ব্বদাই বিশ্বাস ও কার্য্যে ঐক্য দৃষ্ট হয়; কিন্তু বিষ্ণুর উপাসকগণের মধ্যে তাদৃশ ঐক্য নাই, ইহাতে শিবের উপাসনা অপেক্ষা প্রাচীন বলিয়া অনুমিত হয়।

শিবোপাসনার বিধি সকল শঙ্করাচার্য্য-প্রণীত গ্রন্থে পাওয়া যায়। তিনি মালাবারের কেরালা নামক স্থানে জন্মগ্রহণ. করেন, তাঁহাকে কেহ কেহ শিবের অবতার বলিয়া গ্রহণ করে; অন্যেরা আবার তাঁহাকে ব্যভিচারজাত বলিয়া থাকে, ঐ কার্য্য প্রযুক্ত তাঁহার জননী সমাজ-বহিষ্কৃতা হইয়াছিল। তিনি ভাগবতগীতার টীকা প্রস্তুত করেন ও সন্ন্যাস ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া অনেকগুলি মঠস্থাপন করিয়াছিলেন। কিছুকাল কাশ্মীর প্রদেশে থাকিয়া অবশেষে হিমাচলস্থ কেদারনাথে ৩২ বৎসর বয়সে প্রাণত্যাগ করেন।

শৈবদিগের মধ্যে অনেকগুলি বিভিন্ন সম্প্রদায় আছে, তাহাদের প্রধান প্রধান কয়েকটী সম্প্রদায়ের বিষয় নিম্নে লিখিত হইল।

ব্রাহ্মণের জীবন চারিভাগে বিভক্ত—যথা, শিক্ষার অবস্থা,

পারিবারিক অবস্থা, শিক্ষাদানের অবস্থা ও সন্ন্যাসাবস্থা। দণ্ডী-গণ এই চতুর্থ আশ্রমের লোক বলিয়া গণ্য। দণ্ডী আপনার হস্তস্থিত দণ্ডদ্বারা পরিচিত হয়, তাহাতে একখণ্ড লালবর্ণ বস্ত্র বদ্ধ রাখিয়া উহাতে আপন উপবীত সূত্র বান্ধিয়া রাখে। দণ্ডী কেবল ব্রাহ্মণের গৃহ হইতে খাদ্য ভিক্ষা করিয়া থাকে, ও নগরের মধ্যে নয়, কিন্তু সন্নিকটে একাকী প্রবাস করিতে বাধ্য হয়। তাহা-দের জন্য কোন বিশেষ পূজাপদ্ধতি নিরূপিত নাই, তাহা আপনাদের ইচ্ছামত করিয়া থাকে; কিন্তু তাহারা বিশেষরূপে ধ্যানে মগ্ন থাকে। তাহারা ব্যবহার না করিয়া আপন আপন মানসিক বৃত্তিগুলি প্রায় নষ্ট করিয়া ফেলে, কেহ কেহ শারী-রিক অঙ্গহানিও করিয়া থাকে, এবং তাহারা আলস্যে দিন যাপন করিতে করিতে, এমন কি, কোনরূপ চিন্তাও না করাতে, প্রায়ই উন্মত্তবৎ নির্ব্বুদ্ধিপ্রায় হইয়া পড়ে; এক প্রকার জীবনহীন অস্তিত্বমাত্র তাহাদের অবশিষ্ট থাকে। শিবকে ভৈরব (ভয়ানক) নামে তাহারা পূজা করে ও শৈব সম্প্রদায়ের সাধারণ মন্ত্রে তাহারা দীক্ষিত হয়। দীক্ষাকালে তাহারা বাহুর অধোভাগে ক্ষত করিয়া তাহার রক্ত দেবোদ্দেশে উৎসর্গ করে। দণ্ডীরা আপনাদের মৃত শব দাহ না করিয়া ভূমধ্যে প্রোথিত করে, অথবা পবিত্র বলিয়া খ্যাত এমন কোন সলিলে নিক্ষেপ করিয়া থাকে।

১। দণ্ডী বা দণ্ডবাহক।

পূর্ব্বকালে কেবল উচ্চ তিন শ্রেণীস্থ লোকেরা দণ্ডীর আশ্রম অবলম্বন করিত, কিন্তু এক্ষণে নিম্ন শ্রেণীর লোকদের মধ্যেও অনেক দণ্ডী সন্ন্যাসী দৃষ্ট হয়। ইহারা অন্যের দৃষ্টিতে নিতান্ত অলস ও হতভাগ্য জীবন অতিবাহন করে। এই সাধু-খ্যাত ব্যক্তিদের জীবন অপেক্ষা আর কাহারও জীবন এমন নিদ্রালু ও মলিন বলিয়া উপলব্ধ হয় না; মনুষ্য পারলৌকিক সুখের আশায় ঈদৃশ জীবন অবলম্বন করিতেও কুণ্ঠিত হয় না।

শঙ্করাচার্য্যের দশ জন শিষ্য হইতে যে দশ শ্রেণীর সন্ন্যাসী উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাদিগকে এই নাম দেওয়া হয়। ইহারা

২য়। দশনামী দণ্ডী। পূর্ব্বে কেবল ব্রাহ্মণদিগকে আপনা-দেব শ্রেণীমধ্যে আসিবার অধিকার দিত, অন্য দণ্ডীদেব সঙ্গে ইহাদেব এই বিষয়ে পার্থক্য ছিল। এই দশ শ্রেণীব মধ্যে এখন কেবল চাবি শ্রেণী আপনাদের ধর্ম্ম সংস্থাপকেব মতানুসাবে চলে। অন্য ছয় শ্রেণী 'অতিৎ' বা অতিথি নামে খ্যাত, তাহারা বস্ত্র ও অলঙ্কার পবিধান করে, নিজেব খাদ্য প্রস্তুত করে, এবং ব্রাহ্মণ ভিন্ন অপব শ্রেণীর লোকদিগকেও আপনাদেব মধ্যে গ্রহণ কবিয়া থাকে।

ইহাবা আব এক প্রকাব ধর্ম্মপন্থী ভিক্ষুক। ধ্যানপবায়ণ বলিয়া এই নামে খ্যাত হইযাছে। ধ্যান বা তপস্যা হিন্দুদিগের মধ্যে অতি পবিত্র ধর্ম্মবিধি। পূর্ব্বে যোগীগণ হিন্দুদিগের মধ্যে উন্নত ক্ষমতাবান বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। যোগধর্ম্মেব উদ্দেশ্য এই যে, পবমাত্মাব সহিত একীভূত না হওয়া পর্য্যন্ত যোগী ব্যক্তি আপন সমস্ত আকাঙ্ক্ষা ও মনোযোগ ঐককেন্দ্রিক অবস্থায় সংযত কবিতে যত্নবান হয। হিন্দু দর্শন শাস্ত্রে এই পূর্ণ ও সিদ্ধাবস্থা-প্রাপ্তির উপায় শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। যোগী তজ্জন্য বিশেষ নিয়মে শ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণ করে, ৮৪ প্রকার ভিন্ন ভিন্ন অবস্থানে উপবেশন করে, চক্ষুর দৃষ্টি নাসিকার অগ্রভাগে রাখে ও শিবেব সহিত সংযোগ না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহাকে ধ্যান করে। এইরূপে যাহারা যোগধর্ম্মে সিদ্ধ হইয়া উঠে, হিন্দুশাস্ত্রে তাহাদেব সম্বন্ধে অনেক আশ্চর্য্য কথা আছে। এই অবস্থায় যোগী আপনাকে অতিশয় লঘু বা অতিশয় গুরু কবিতে পারক হয, আপনা-দেব দেহায়তন বর্দ্ধিত বা সঙ্কীর্ণ কবিতে পাবে, মুহূর্ত্তমধ্যে বহুদূরে যাইতে সক্ষম হয, মৃতশবীর-মধ্যে আপনাব প্রাণ প্রবেশ করাইয়া তাহা সজীব কবিতে ও লোকেব মধ্য হইতে অদৃশ্য হইযা যাইতে পাবে, দৃষ্টিমাত্রেই কোন বিষযেব অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ ঘটনা জানিতে সক্ষম হয ইত্যাদি বহুবিধ অদ্ভুত কার্য্য-সাধন-ক্ষমতা যোগীদিগেব সাধ্য বলিয়া কথিত; কিন্তু এই সকল অতীত কালেব বর্ণিত ঘটনা, এখন আব দেখা যায় না।

কর্ণেল অল্‌কট্‌ ভারতবর্ষের অনেক স্থানে এই প্রকৃত যোগীর অন্বেষণ করিয়া বেড়াইয়াছিলেন; তিনি বলেন, যোগীদের সাধিত অদ্ভুত কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে আমরা যাহা শুনিয়াছি, যাহারা বলে, তৎসমুদয় দেখিয়াছি, আমি এমন দর্শকদিগকে দেখিয়াছি। কোথায়ও তিনি স্বচক্ষে এমন যোগী দেখেন নাই। বর্ত্তমান যোগীদের সম্বন্ধে তিনি বলেন, তাহারা বঞ্চিত প্রবঞ্চকদল, সাধু বলিয়া পরিচিত, অথচ ছদ্মবেশে দানশীল ব্যক্তিগণকে সহজে প্রবঞ্চনা করে ও গোপনে গোপনে আপনাদের পাশব স্বভাব পরিতৃপ্ত করিবার বিশেষ সুযোগ প্রাপ্ত হয়।

যোগীদের সাধিত অদ্ভুত কার্য্যকাহিনী সমস্তই মিথ্যা। মস্তিষ্ক মনের যন্ত্র স্বরূপ, যেন তাহা উপযুক্তরূপে কার্য্যশীল হয়, তজ্জন্য পর্য্যাপ্ত পরিমাণে বিশুদ্ধ রক্তের প্রয়োজন। নির্ম্মল বায়ু ফুস্‌ফুসে নীত হইয়া শ্বাসপ্রশ্বাস-প্রক্রিয়া দ্বারা রক্ত শোধন করে; শ্বাসকার্য্যের ব্যাঘাত ও প্রচুর খাদ্যাভাব বশতঃ যোগীর শোণিত অল্প ও দূষিত, সুতরাং তাহার মস্তিষ্কের কার্য্যে বিশেষ ব্যাঘাত হয়, এমন অবস্থায় তাহার চিন্তা ও উক্তি বিকৃত ও উন্মাদগ্রস্তের ন্যায় হইয়া পড়ে।

এখন এই শ্রেণীস্থ লোকে দৈবজ্ঞরূপে দেশমধ্যে ভ্রমণ করিয়া অজ্ঞান লোকদিগকে প্রবঞ্চনা করিয়া থাকে। এই মতের সংস্থাপকের নাম গোরকনাথ, তাহার শিষ্যগণ কাণফাটী বলিয়া খ্যাত, কারণ দীক্ষাকালে তাহারা কর্ণ বিদ্ধ করিয়া থাকে। গোরক্ষপুরে এই দলের একটী মন্দির ও মঠ আছে, পরম্পরাগত বাক্যানুসারে লোকে বিশ্বাস করে যে, স্বয়ং শিব ত্রেতাযুগে এই মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন; বর্ত্তমান মন্দির আধুনিক সময়ে নির্ম্মিত, তন্নিকটবর্ত্তী মঠে মহান্ত বাস করে।

এই শ্রেণীস্থ শৈবগণ আপনাদের শরীরে অথবা বস্ত্রে শিবের প্রতিরূপ স্বরূপ লিঙ্গমূর্ত্তি ধারণ করিয়া থাকে। তাম্র ও রৌপ্য-নির্ম্মিত লিঙ্গ তাহারা আপনাদের গলদেশে অথবা পাগড়িতে ধারণ করে।

৪। জঙ্গম,

উত্তর ভারতবর্ষে এই দলের লোকেরা শিবের প্রিয় বাহনের

প্রতিরূপ স্বরূপ বৃষ পালন করিয়া থাকে। দক্ষিণে ইহাদের সংখ্যা অধিক, তথায় ইহারা লিঙ্গয়িত নামে খ্যাত; চিরকাল এই দলস্থ লোকেই শিবের মন্দিরের পুরোহিত হইয়া থাকে। এই দলের প্রবর্ত্তক বা শিবপূজার পুনঃসংস্থাপকের নাম বাসব, তাঁহাকে শিবের অনুচর নন্দীর অবতার বলিয়া কল্পনা করা হইয়া থাকে। শিবের আদেশে তাঁহার এই বিশ্বস্ত ভৃত্য শিবপূজা পৃথিবীতে পুনঃস্থাপন করণার্থে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন; তিনি কলিয়ানের পুলিশ মন্ত্রী ছিলেন। তাঁহার সম্বন্ধে অনেক গল্প প্রচলিত আছে, স্বয়ং শিব ও পার্ব্বতী আসিয়া সসম্ভ্রমে তাঁহাকে স্বর্গে লইয়া গিয়াছিলেন। এই শিবপূজার পুনঃপ্রচলন সম্ভবতঃ একাদশ শতাব্দীর আরম্ভে ঘটিয়াছিল।

এতদ্ভিন্ন পরমহংস, অঘোরী, উদ্ধবাহু, আকাশমুখী, নখী, গুদারা প্রভৃতি নানা শ্রেণীর ব্রতধারী সন্ন্যাসী দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে পরমহংস শ্রেণী সমধিক প্রসিদ্ধ; তাহারা দেখায় যে, দুঃখ, ক্ষুধা, সুখ, তৃপ্তি, শীত ও উত্তাপ প্রভৃতির মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য নাই, সকলই তাহারা সমভাবে সহ্য করিতে পারে।

গণেশ।

গণেশ শিব ও পার্ব্বতীর পুত্র বলিয়া পূজিত। তাঁহার জন্মের অব্যবহিত পরে সমস্ত দেবগণ নবজাত পুত্র দর্শনে আগমন করেন। তন্মধ্যে উপস্থিত শনি দেব আপন কুদৃষ্টি প্রযুক্ত মস্তক অবনত করিয়া রহিলেন; তাহাতে পার্ব্বতী তাঁহার এরূপ ভাব দেখিয়া তিরস্কার করিলেন, তখন শনি স্বীয় মস্তক উত্তোলন করিয়া নবজাত শিশুর দিকে দৃষ্টিপাত করিবামাত্র তাহার মস্তক ভস্ম হইয়া গেল। পার্ব্বতী তনয়ের এরূপ শোচনীয় অবস্থা দৃষ্টে প্রথমে শোকে বিহ্বলা ও পরে ক্রোধান্ধা হইয়া শনিকে সংহার করিতে উদ্যত হন। ব্রহ্মা তাঁহাকে নিবারণ করিয়া শনিকে আদেশ করিলেন, তুমি বাহিরে গিয়া উত্তরাভিমুখে

শয়ন করিয়া আছে, এমন যে জন্তুকে প্রথমেই দেখিবে, তাহার মস্তক লইয়া এখানে আইস। শনি গিয়া এই অবস্থায় শায়িত একটী হস্তী দেখিতে পাইয়া তাহার মস্তক আনিলেন ও তাহা গণেশের স্কন্ধে সংস্থাপন করিয়া দিলেন। পার্ব্বতী এই মস্তক দেখিয়া কথঞ্চিৎ প্রবোধ-প্রাপ্ত হইলেন, ও ব্রহ্মা এই বলিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা করিলেন যে, সকল দেবতার অগ্রে গণেশের পূজা হইবে।

গণেশের উৎপত্তির অন্য কাহিনী আছে; একটী এইরূপ—পার্ব্বতী আপন দেহের মালিন্য হইতে তাহাকে উৎপন্ন করিয়াছিলেন, শিব জানিতে না পারিয়া তাহার মস্তক ছেদন করিয়াছিলেন। আর একটী গল্প এত লজ্জাকর যে, তাহা লিখিয়া ব্যক্ত করা যায় না।

গণেশের ঔদরিকতা প্রকাশার্থে তাহার অতি প্রকাণ্ড উদরবিশিষ্ট মূর্ত্তি নির্ম্মিত হয়। তিনি মিষ্টান্ন পাইলে বড়ই প্রসন্ন হন। এক সময়ে শিবের বিনাশার্থে কোন দেবতা বহুবিধ বলিদান করিয়াছিলেন, শিব তাহাতে অতি চিন্তিত ও দুঃখিত হইয়া গণেশের সাহায্য যাচ্ঞা করেন, যেন গণেশ শিবকে এই বিনাশ হইতে রক্ষা করিতে সচেষ্ট হন। উক্ত শিবারি গণেশকে প্রতিনিবৃত্ত করণার্থে তাঁহার গন্তব্য-পথে মিষ্টান্ন বর্ষণ করিলেন। গণেশ এই মিষ্টান্নরাশি পাইয়া তাহা ভোজন করিতে এমন নিবিষ্টমনা রহিলেন যে, পিতৃ ইচ্ছা একেবারে বিস্মৃত হইয়া গেলেন।

দক্ষিণদেশের স্কুলের ছাত্রেরা বিদ্যা শিক্ষার জন্য গণেশের সাহায্য প্রার্থনা করিয়া থাকে, তিনি কেমন ভোজন করিতে পারেন, তাহা বর্ণনা করিয়া তাঁহার বন্দনা করিয়া থাকে।

গণেশচতুর্থী নামে গণেশের বাৎসরিক পূজার এক দিন নিরূপিত আছে। অনেকে গণেশের নামে প্রার্থনা না করিয়া বা তাঁহার নাম না লিখিয়া পত্র বা অন্য কিছু লিখিতে আরম্ভ করে না।

ঈশ্বর যে এমন একটী মিষ্টান্নপ্রিয় হতভাগা ছেলে, ইহা কি আমরা বিশ্বাস করিতে পারি? তিনি কি পেটুক? যদি গণেশ আপনার কোন উপাসককে তাঁহার তুল্য প্রকৃতির একটী পুত্র দান করেন, তাহাতে কি ঐ উপাসক প্রীত হইবেন। গণেশ যখন আপন পিতার সাহায্য ও আজ্ঞাপালন করা অপেক্ষা মিষ্টান্ন ভোজনদ্বারা নিজের উদর পূর্ণ করিতেই ব্যস্ত, তখন তিনি কি অপরের সাহায্য করিতে অগ্রসর হইবেন?

দেবীগণ।

হিন্দুরা দেবগণকে ঠিক আপনাদের সদৃশ জ্ঞান করিয়া থাকে, মনুষ্যের ন্যায় তাহাদের নানাবিধ অভাব হয়, ইন্দ্রিয়ের বশীভূত হইতে হয়। হিন্দুরা আপনাদের পুত্রের বিবাহ দেওয়া নিতান্ত কর্ত্তব্য বলিয়া জ্ঞান করে. তাদৃশ তাহারা আপনাদের দেবতাদিগকেও স্ত্রী দিয়া থাকে; এক এক জনের অনেকগুলি করিয়া স্ত্রী থাকে। ব্রহ্মার পত্নীর নাম সরস্বতী, তিনি বিদ্যা-দেবী; বিষ্ণুর পত্নীর নাম লক্ষ্মী, তিনি ধনদাত্রী; শিবের স্ত্রীর নাম অনেক, যথা, উমা, কালী, পার্ব্বতী, ভৈরবী, হৈমবতী, দুর্গা ইত্যাদি।

এই সকল দেবীর উপাসকদিগকে শাক্ত অথবা শক্তির উপাসক কহা যায়, কারণ ঈশ্বরের অনেক শক্তি নারীমূর্ত্তিতে প্রত্যক্ষ হয়। বাঙ্গালা দেশের প্রায় তিন চতুর্থাংশ বা বার আনা লোক শক্তির উপাসনা করিয়া থাকে, তিন আনা বৈষ্ণব ও এক আনা প্রায় শৈব বলিয়া গণ্য। দেবতার পূজা অপেক্ষা লোকে অধিক পরিমাণে তাঁহার পত্নীর পূজাতে রত। ব্রহ্মার পূজা প্রায় অপ্রচলিত, কিন্তু তাহার পত্নী সরস্বতীর পূজা প্রায় সকলেই করিয়া থাকে। লক্ষ্মী, রাধা ও সীতার পূজা তত প্রচ-লিত নহে; কিন্তু পার্ব্বতী, দুর্গা ও কালীর পূজা নানা আকারে বঙ্গদেশে খুব বেশী পরিমাণে প্রচলিত। বিষ্ণু বা শিবের উপা-সকেরা যেমন বলিয়া থাকে যে, তাহাদের উপাস্য দেবই সকল

পদার্থের মূল কারণ, তেমনি এই সকল দেবীর উপাসকেরা নিঃসন্দেহে বলিয়া থাকে, দেবীগণই সমস্ত সৃষ্ট পদার্থের কারণ। তাহারা এইরূপে সৃষ্টির মূল নির্দ্দেশ করে, যথা, পরমাত্মা সৃষ্টি কার্য্য সঙ্কল্প করিয়া আপনাকে অংশদ্বয়ে বিভক্ত করেন, তাহার এক অংশ ব্রহ্মারূপে, অপরাংশ প্রকৃতিরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। ব্রহ্মা হইতে সমস্ত পুরুষ ও প্রকৃতি হইতে সমস্ত নারীর উৎপত্তি হইয়াছে। নারী ব্যতীত, নর উৎপাদিকা শক্তিবর্জ্জিত, এই কারণ নারী প্রকৃতির মুখ্য শক্তি বলিয়া গণিত হয়, অতএব হিন্দুগণ দেবীকেই বিশেষরূপে উপাসনা করিয়া থাকে। কোন কোন পুরাণে দেবগণের কার্য্যসাধিকা শক্তিস্বরূপে শক্তি বা প্রকৃতির পূজা করিতে আদেশ বা অনুমোদন করে। কিন্তু অপেক্ষাকৃত আধুনিক তন্ত্রশাস্ত্রেই এই উপাসনার বিশেষ বিধিদান করে। তন্ত্রের অন্তর্গত পুস্তকাবলির মধ্যে যে গুলি প্রাচীন, সে গুলি একাদশ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে লিখিত হয় নাই।

শাক্তগণ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত, দক্ষিণাচারী ও বামাচারী; ইহাদের উপাসনাদির বিষয় অল্পই পরিজ্ঞাত হওয়া গিয়াছে, কারণ তন্ত্র সকল প্রায়ই গোপনীয় শাস্ত্র।

দক্ষিণাচারী সম্প্রদায় দেবীগণকে প্রকাশ্যে পৌরাণিক প্রথা মতে শ্রেষ্ঠ শক্তি বলিয়া স্বীকার করিয়া সেবা করিয়া থাকে।

১। দক্ষিণাচারী সম্প্রদায়।

তাহারা বামাচারীদের অনুষ্ঠিত ঘোরতর অশুচি কার্য্য করে না। বিষ্ণুর বহুবিধ মূর্ত্তির পূজাতে যে সকল ক্রিয়াকলাপ হয়, ইহাদের পূজাতে তদতিরিক্ত পশুবলির প্রথা প্রচলিত আছে। কলিকাতার নিকটস্থ কালীঘাটে কালীমূর্ত্তির সম্মুখে তাহার পূজার নিরূপিত পর্ব্বদিনে শত শত ছাগ-বলিদান দ্বারা শোণিত—স্রোত প্রবাহিত হইতে দেখা যায়, তৎসঙ্গে মহিষ বলিদানও হইয়া থাকে। অনেক হিন্দুর বাটীতে দুর্গা পূজার সময় ছাগ ও মহিষের এইরূপ বলিদান হইতে দেখা যায়; কিন্তু কোন পুরাণে এমনও প্রকাশ করে যে, এইরূপে দেবীর উদ্দেশে বলিদাতা ব্যক্তি প্রাণিহিংসার অপরাধে পতিত হয়। এই শিক্ষা বৈষ্ণব ধর্ম্ম-বিশ্বাসের

অনুমোদনীয়, তাহাতে প্রাণী-জীবন পবিত্র জ্ঞান করা হয়; কালী বা দুর্গার পূজা—পদ্ধতি বৈষ্ণবের দৃষ্টিতে অসহ্য ও মহাপরাধ বলিয়া গণ্য। এইরূপ বলিদাতাগণ বেদ হইতে আপনাদের কার্য্যের সমর্থন করিয়া থাকে বলিয়া অনেক বৈষ্ণব সম্প্রদায় বেদের মর্য্যাদা করে না। শাক্তেরা রক্তপাতের এইরূপ কারণ নির্দ্দেশ করিয়া থাকে,—দেবী যে দানবকুলের সংহার করিতে পৃথিবীতে অবতীর্ণা হইয়াছিলেন, তাহাদের সংহার কার্য্যে অতি ক্লান্ত হইয়া পড়েন, এজন্য নিজ শক্তি রক্ষার্থে শিবশ্ছেদিত অরাতিবৃন্দের শোণিত পান করত আপনার অনুষ্ঠিত বীরোচিত কার্য্য করিতে সমর্থা হইয়াছিলেন; এক্ষণে বলিদানদ্বারা দেবীকে তাঁহার পূর্ব্বকার্য্য স্মরণ করাইয়া বলিদাতা তাঁহার আশীর্ব্বাদ-লাভের অধিকারী হয়। ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর পত্নী লক্ষ্মী, সরস্বতী, রাধা, সীতা প্রভৃতির উদ্দেশে এইরূপ বলিদান অর্পণ করা হয় না, কেবল শিবপত্নীর নানা মূর্ত্তির উদ্দেশে বলিদান করিবার প্রথা প্রচলিত আছে।

এই সম্প্রদায়ের অধিকাংশ লোক প্রকাশ্য স্থানে অন্য দলের ব্যবহার্য্য চিহ্নাদি ধারণ করে, কারণ সম্ভ্রান্ত হিন্দুরা এই দলস্থদিগকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া থাকেন। কিন্তু তাহাদের দলে এমন লোকও

২। বামাচারী।

আছে, যাহারা আপনাদের লজ্জাকর কুরীতির শ্লাঘা করিয়া দলের চিহ্নবিশেষদ্বারা আপনাদিগকে বামাচারী বলিয়া প্রকাশ করে; সেই চিহ্নগুলি এইরূপ, যথা, কপালে অর্দ্ধ বৃত্তাকার একটী বা কয়েকটী সিন্দূরের দাগ, অথবা একটী লম্বাকৃতি লালবর্ণ রেখা, ও নাসিকামূলে একটী সিন্দূরের ফোটা; তাহারা একটী রুদ্রাক্ষ মালা অথবা সামুদ্রিক কড়ির ক্ষুদ্র মালা হাতের মধ্যে সংগোপনে রাখে, অথবা ক্ষুদ্র একটী থলির মধ্যে করিয়া বহন করে। পূজার সময়ে তাহারা কটিদেশে একখণ্ড রেশমী কাপড়মাত্র ও গলদেশে একটী লোহিত বর্ণের পুষ্পমালা পরিধান করে।

ইহারা পুরাণানুযায়ী পূজা না করিয়া তন্ত্রানুসারে দেবীর

পূজা করিয়া থাকে। তাহাদের উপাসনা সচরাচর অতি সংগোপনে নির্ব্বাহিত হয়, কেবল তাহাদের মতে যাহারা দীক্ষিত, তাহারাই উপাসনাস্থলে থাকিতে অনুমতি পায়। তাহারা শিবের শক্তিরূপে দেবী, লক্ষ্মী, সরস্বতী, মাতৃ, যোগিনী, ডাকিনী প্রভৃতির পূজা করিয়া থাকে, শিব স্বয়ং ভৈরব নামে কথনং সস্ত্রীক পূজিত হন। উপাসক যেন দেবী-শক্তির নিকট ইহজীবনে আকাঙ্ক্ষিত অস্বাভাবিক শক্তিবিশেষের অধিকারী হয় ও মরণের পর দেবীর সঙ্গে সম্মিলিত হইতে পাবে; ইহাই উপাসনার উদ্দেশ্য বিষয়। তাহাদের পূজাতে মদ্য, মাংস, মৎস্য, মৈথুন ও মুদ্রা (গূঢ়ার্থ প্রক্রিয়াবিশেষ) অঙ্গরূপে ব্যবহৃত হয়। প্রার্থিত বরলাভের জন্য উপাসককে ঘোর তমসাবৃত অমানিশির মধ্য রাত্রিতে শ্মশান ভূমিতে একাকী উপস্থিত হইয়া কোন মৃত শরীর বিশেষের উপর আসীন হইয়া প্রয়োজনায় নৈবেদ্য উৎসর্গকরণ পূর্ব্বক ধ্যানমগ্ন অবস্থায় নির্ভয়ে থাকিতে হয়; তাহা করিতে সক্ষম হইলে শাক্তের উপাসক পিশাচ, যোগিনী, ডাকিনী প্রভৃতিকে আপনার উদ্দেশ্যের জন্য আজ্ঞাপালক দাসরূপে প্রাপ্ত হয়।

তাহাদের সাধারণ পূজা পূর্ব্বোক্তরূপে নির্জ্জন স্থানে অথবা একাকী নির্ব্বাহিত হয় না; কিন্তু সমস্ত উপাসক-সম্প্রদায় মিলিয়া করিয়া থাকে। শক্তির প্রতিরূপ বলিয়া তাহারা বিবস্ত্রা একটী নারীকে সম্মুখে রাখিয়া তাহার পূজা করে। উপস্থিত পুরুষ উপাসকেরা আপনাদিগকে ভৈরবের ও স্ত্রী উপাসকেরা ভৈরবীর (দেবীর) প্রতিরূপ ভাবিয়া থাকে। অতঃপর মদ্য, মাংস ও মৈথুনের অকথ্য নির্লজ্জ ব্যবহার অবাধে চলিতে থাকে। এই দলের উপাসকেরা অধিকাংশ ব্রাহ্মণ, তাহাদের সংখ্যা কম নয়। তাহাদের অনুষ্ঠিত উপাসনা-প্রণালী এতদূর লজ্জাকর বিষয়ে পূর্ণ যে, তাহা প্রকাশেরও যোগ্য নয়। তাহাদের উপাস্য রমণী যেন একটী নর্ত্তকী যুবতী যোগিনী হয়, তাহার স্বৈরিণী হওয়া প্রয়োজন; রজকী, নাপ্তিনী, ব্রাহ্মণ বা শূদ্রজাতীয় স্ত্রী, মালিনী বা গোপিনী হওয়া আবশ্যক। উপাসনা

ঠিক মধ্যরাত্রিতে করা কর্ত্তব্য, তখন আট, নয় বা এগার যোড়া স্ত্রীপুরুষ মিলিত হইয়া উপাসনা-কার্য্য আরম্ভ করে। শক্তি-রূপিণী নারীর উদ্দেশে উপযুক্ত মন্ত্র বা শ্লোক উচ্চারিত হয়। তাহাকে সম্পূর্ণ বিবস্ত্রা, কিন্তু বহুমূল্য অলঙ্কারাদিতে ভূষিতা করে, অতঃপর মন্ত্রবিশেষ উচ্চারণ পূর্ব্বক তাহাকে পবিত্ররূপে প্রতিষ্ঠা করা হয়। তৎপরে নির্দ্দিষ্ট রীতিমত তাহার গাত্রে মদ্য ছিটাইয়া দেওয়া হয়। সে যদি ইতিপূর্ব্বে এই মতে দীক্ষিতা না হইয়া থাকে, তবে এই সময়ে মন্ত্রবিশেষ-দ্বারা তাহার দীক্ষা হয়, আর তৎপরেই ঘোরতর অশুচি কার্য্যের বীভৎস কাণ্ড আরম্ভ হয়, তাহা নিতান্তই প্রকাশের অযোগ্য। যাহা হউক, অন্য হিন্দুরাও এই মতের বিরুদ্ধ ও ইহার দোষ ব্যক্ত করে; তথাপি ইহা হিন্দুধর্ম্মের মধ্যে স্থান ও অধিকার পাইয়াছে, ও স্থানবিশেষে বহুসংখ্যক বামাচারী বাস করিয়া থাকে। এই মতের অধিকাংশ শিক্ষা লিখিত হয় নাই; কিন্তু যাহারা এই মতে দীক্ষিত হয়, তাহাদিগকে মৌখিক শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহারা আবার নূতন শিষ্যদের শিক্ষক হইয়া উঠে।

যেমন বৌদ্ধধর্ম্ম জাতিভেদ-বন্ধন ছেদন পূর্ব্বক পরিশেষে সন্ন্যাসধর্ম্মে পরিণত, তদ্রূপ তান্ত্রিক মত শক্তির উপাসনাচ্ছলে কামাভিলাষের কার্য্যে মগ্ন হইয়াছে।

কিরাতি নামে আর এক শ্রেণীর শাক্ত আছে। এই সম্প্রদায় দেবীর অতি ভীমামূর্ত্তি কপালীর উপাসক। ইতিপূর্ব্বে তাহার উদ্দেশে নরবলি প্রদত্ত হইত; কিন্তু সম্প্রতি তাহা হইবার সম্ভাবনা নাই বলিয়া, উপাসকবৃন্দ স্ব স্ব শরীরের উপর অতি নৃশংস ব্যবহার করিয়া থাকে, ফলতঃ দেবীর প্রসন্নতালাভের জন্য তাহারা আপনাদিগকে শোণিতাক্ত কলেবর করিয়া নিজ নিজ রক্ত দেবীকে নিবেদন করে। তাহারা সুতীক্ষ্ণ অস্ত্রাঘাতে শরীর বিদীর্ণ করে, জিহ্বাতে বাণ ফোঁড়ে, মঞ্চের উপর হইতে উর্দ্ধমুখে প্রোথিত ছুরিকা প্রভৃতির উপর লম্ফ প্রদান করে। কিন্তু এই সকল অজ্ঞানতাজনিত নৃশংসাচার নিবারণার্থে গবর্ণমেণ্ট আইন

কিরাতি।

করাতে তাহারা আপনাদের পূজা-প্রক্রিয়ার অনেক পরিবর্ত্তন করিয়াছে। তাহাদের এইরূপ নৃশংস ব্যবহারদ্বারা অর্থ সঞ্চয় করাই তাহাদের প্রধান উদ্দেশ্য বিবেচিত হয়। তৎকালে তাহারা গাঁজা খাইয়া মস্তিষ্ককে সমধিক উত্তেজিত করে, তাহাতে যাতনা কম পরিমাণে উপলব্ধি হইয়া থাকে; তথাপি অকারণে এইরূপ ভয়ানক পদ্ধতি অনুসারে অনেককে অসহ্য যাতনা ভোগ করিতে তৎপর দেখা যায়। কিরাতির পোষাক ও ব্যবহার এইরূপ দৃষ্ট হয়,—চিতাভস্ম মাখা-শরীর, গলদেশে নরমুণ্ডমালা, জটাধারী, কৃষ্ণবর্ণ রেখাঙ্কিত কপাল, কটিতটে ব্যাঘ্রচর্ম্ম, বামহস্তে নরকপাল, দক্ষিণহস্তে ঘণ্টা ধারণ করত "ভো শম্ভু ভৈরব" রবে ভ্রমণ করিতে করিতে ঘণ্টাধ্বনি করিতে থাকে। ইহারা আপনাদের পরিচ্ছদ ও বাহ্যভঙ্গিতে শিবের অনুকরণ করে।

শিবপত্নীর অনেক নাম, বিশেষ বিশেষ অর্থে সে সকল নামের ব্যবহার হয়; সংহার মূর্ত্তিতে তাঁহার নাম কালী, উৎপাদিকা শক্তিবিশিষ্টা বলিয়া তাঁহাকে যোনি মূর্ত্তিতে পূজা করা হয়। সৌন্দর্য্যের প্রতিরূপ বলিয়া তাঁহার নাম উমা, জগতের জননী বলিয়া তাঁহার নাম জগন্মাতা, সন্ন্যাসিনী মূর্ত্তি ধরেন বলিয়া তাঁহার নাম যোগিনী, শোণিতপ্রিয়া বলিয়া তাঁহার নাম ভৈরবী দুর্গা, হিমালয়দুহিতা বলিয়া তাঁহার পার্ব্বতী ইত্যাদি নাম হইয়াছে। তাঁহাকে কেবল দেবী বা মহাদেবীও বলা যায়।

কালী। ইহাঁর মূর্ত্তি অতি ভয়ানক, তিনি চতুর্ভুজা কৃষ্ণবর্ণা, এক হস্তে অসি, অপর হস্তে অসুর মস্তক ধরিয়া আছেন, অপর দুই হস্তে উপাসকদিগকে আশীর্ব্বাদ ও উৎসাহদান করিতেছেন। দুই কর্ণে দুইটী শব কর্ণাভরণরূপে ধারণ ও নরমুণ্ডমাল্যে গলদেশ শোভিত করেন। মৃতমনুষ্যদের ছিন্নহস্তদ্বারা রচিত কটিবন্ধনমাত্র তাঁহার শরীরাবরক পরিধেয়, দীর্ঘাকৃতি জিহ্বা বাহির করিয়া থাকেন, চক্ষুদ্বয় মদ্যপায়ী ব্যক্তির চক্ষুর ন্যায় লোহিতবর্ণ, বক্ষস্থল শোণিতমাখা। তিনি সম্মুখে পতিত স্বামীর উরুদেশে এক

কালী।

পদ ও বক্ষোপরি অন্য পদ রাখিয়া দণ্ডায়মান আছেন। অসুর জয় করিয়া তিনি ঈদৃশ অদ্ভুত নৃত্য করিতেছিলেন যে, তাঁহার পদভরে পৃথিবী কম্পিতা হইতে লাগিল, তাহাতে দেবগণের অনুরোধ-পরবশ হইয়া শিব তাঁহাকে নিবৃত্ত হইতে বলেন, কিন্তু উত্তেজিত অবস্থায় তিনি তাঁহার বাক্যে কর্ণপাত করিতে পারেন নাই; তাহাতে শিব নিহত শবরাশির উপরে নিপতিত হন। দেবী নৃত্য করিতে করিতে স্বামীর উপরে চড়িয়া নৃত্য করিতে আরম্ভ করেন, অনন্তর পদতলে স্বামীকে দেখিয়া সলজ্জভাবে জিহ্বা বাহির করিয়া ফেলিলেন।

স্যার মনিয়ার উইলিয়ামস্ হিন্দুদিগের উপাস্য অসংখ্য দেব-দেবীর সম্বন্ধে বলেন;—গগণমণ্ডল ও পৃথিবীর উপর এমন পদার্থ নাই, হিন্দু যাহার পূজা করে না, চন্দ্র, সূর্য্য, তারা; পর্ব্বত, পাহাড়, প্রস্তর; তরু, লতা, গুল্ম; সমুদ্র, সরোবর, নদী; তাহার নিজ অস্ত্রশস্ত্র, উপকারী জীবজন্তু, ভয়াবহ সরীসৃপ; সাহস, সাধুতা, ধর্ম্ম বা অধর্ম্মে ভূষিত অস্বাভাবিক গুণযুক্ত মনুষ্য; ভাল বা মন্দ আত্মা, দানব, ভূত, পিশাচ, পূর্ব্বপুরুষের আত্মা; অর্দ্ধ মানব ও অর্দ্ধ দেবরূপে কল্পিত ব্যক্তি; সপ্ত স্বর্গ ও সপ্ত পাতালের অধিবাসী ইত্যাদি প্রত্যেকেই হিন্দুর পূজনায় ও ঐশ্বরিক সমাদরের অধিকারী।

এইরূপে হিন্দু অসংখ্য ব্যক্তির ও পদার্থের পূজা করিতে গিয়া যিনি একমাত্র পূজনীয়, একমাত্র সত্য ঈশ্বর, মহান স্রষ্টা, রক্ষক ও বিশ্বের ধারণকর্ত্তা, তাঁহার পূজায় বিরত হইয়াছে।

মন্দ লোকেরা আপনাদিগকে আদর্শস্থল করিয়া স্ব স্ব মানব কল্পনার বশবর্ত্তী হইয়া আপনাদের দেবগণ ও ঈশ্বরের রচনা করিয়াছে; মানবপ্রকৃতিতে যে সকল ভ্রষ্টতা দৃষ্ট হয়, তাহাদের কল্পিত ঈশ্বরগণও সেই সকল ভ্রষ্টতাবর্জ্জিত নহে।

গ্রীষ্মপ্রধান দেশের লোকে নিদ্রাপ্রিয়; এদেশের লোকে আপনাদের প্রধান দেবতারও নিদ্রা বা নিষ্ক্রিয় অবস্থা কল্পনা করিয়াছে; ফলতঃ ব্রহ্ম গাঢ় অচেতন অবস্থায় ছিলেন, হিন্দুরা ব্রহ্মসম্বন্ধে এরূপ বর্ণনা করিয়া থাকে। বিষ্ণু ও শিবের সম্বন্ধে

আরও মন্দ কথার কল্পনা করিয়াছে; তাহারা হিন্দু রাজগণের ন্যায় অন্য অপেক্ষা ক্ষমতাপ্রয়াসী হইয়া বিবাদ করে, পক্ষপাত-দোষে দূষিত হইয়া আপন দলস্থদিগের উপর অধিক অনুগ্রহ প্রদর্শন করে, এবং কু-অভিলাষের বশবর্ত্তী হইয়া প্রত্যেক ঘৃণিত কার্য্যে লিপ্ত হয়।

হিন্দুরা নিতষ্ঠুতার ও অশুচিতার তাবৎ কার্য্যই ধর্ম্ম কার্য্য-রূপে গণ্য করিয়া লয়, কেবল কেহ জঘন্য জাতিভেদ-শৃঙ্খল ভগ্ন করিতে সচেষ্ট হইলেই তাহারা খড়্গহস্ত হইয়া উঠে। তাহারা আপনাদের বহুদেববাদের শিক্ষাতে নূতন নূতন দেবতা সংযোগ করিতে আপত্ত করে না, কিন্তু একেশ্বরবাদের শিক্ষায় তাহারা কখন সম্মত হইতে পারে না। অন্য দেবতার পূজা-করণ দ্বারা মনুষ্য সত্য একমাত্র ঈশ্বরের বিদ্রোহী হয়, তাহা কার্য্যতঃ প্রকাশ করে।

ঈশ্বর স্বয়ংজীবী, অবিকার; পরাক্রম, জ্ঞান, দয়া ও অনু-গ্রহে অসীমরূপে পূর্ণ, পবিত্র ও নিষ্কলঙ্ক। হিন্দুরা এমন মহান ঈশ্বরের স্থলে অন্ধ, বধির, বোবা প্রস্তরখণ্ডের; পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গের; লজ্জাকর দৃশ্য লিঙ্গের, ও অন্যান্য অসংখ্য কল্পিত দেবদেবীর পূজা করিয়া থাকে।

প্রতিমা বা পূজনীয় পদার্থ।

প্রতিমা পূজনীয় মূর্ত্তিবিশেষ। প্রস্তরাদি সামান্যরূপে খোদিত বা গঠিত হইয়াই হিন্দুর পূজনীয় বস্তুরূপে গণিত হয়। প্রস্তরাদি একটু আকৃতিবিশিষ্ট করিয়া তাহা সিন্দুর বা অন্য কোন বর্ণে রঞ্জিত করিলে তাহা হিন্দুর চক্ষে পূজ্য হইয়া উঠে। অসভ্য জাতিগণ স্বভাবজাত পদার্থের পূজা করে; অসভ্য অবস্থা হইতে কিঞ্চিৎ উন্নত মনুষ্যগণ প্রতিমা পূজা করে, অর্দ্ধ সভ্য ব্যক্তিগণ তদপেক্ষা উন্নত অবস্থায় উপনীত হয়; সুসভ্য জাতিগণ প্রতিমা পূজায় নিবৃত্ত হয়।

কোন কোন শিক্ষিত হিন্দু, হিন্দুগণ যে প্রতিমাপূজক, ইহা অস্বীকার করিয়া থাকেন; তাঁহারা বলেন, লোকে যেমন স্মরণীয় ব্যক্তির চিত্র রাখিয়া থাকে, তাদৃশ আমরা আপন আপন প্রিয় ও আত্মীয় বন্ধু বান্ধবের চিত্র রাখিতে আনন্দিত হই; তাহাদের আকৃতি ও রূপ দেখিয়া মন পুলকিত হয়। কিন্তু বাজারে যে সকল বিশ্রী প্রস্তর ও পিত্তলময় মূর্ত্তি বিক্রীত হয় ও হিন্দুর গৃহে আনীত হইয়া পূজিত হয়, তাহা কিরূপে ঈশ্বরের জ্ঞান ও স্মরণচিহ্ন-রূপে গ্রাহ্য হইতে পারে? যদি এ দেশীয় কোন ব্যক্তি ইংলণ্ড দেশ হইতে আসিয়া হনুমানের মুখবিশিষ্ট একটী গর্দ্দভ মূর্ত্তি দেখাইযা বলে, ইহা ইংলণ্ড দেশের মহারাণীর প্রতিমূর্ত্তি; তাহা হইলে তাহার ঈদৃশ কার্য্য অতি ভয়ানক বলিয়া গণিত হইবে। তবে যিনি অনুপম ও অতুল, তাঁহাকে বিশ্রী মূর্ত্তিতে প্রদর্শন করা কি অতি ঘোরতর অজ্ঞানতা ও বিদ্রোহিতার কার্য্য নহে?

রাজা রামমোহন রায় হিন্দুর এই মিথ্যা আপত্তি খণ্ডন করিয়াছেন।—"হিন্দু দেবগণের প্রতিমা সকল যে যন্ত্রস্বরূপে ঐ সকল দেবগণের গুণ ও স্বভাবাদি মনোমধ্যে অঙ্কিত করিয়া ভক্তি উৎপাদন করে, এই কারণ প্রতিমার প্রতি বিশেষ সমাদর প্রকাশ করা হয়, তাহা সত্য নয়; কিন্তু সে গুলি বাস্তবিক হিন্দুর পূজনীয় বস্তু ভিন্ন আর কিছুই নয়। হিন্দু যে কোন প্রতিমা বাজারে ক্রয় করে, অথবা আপনার জন্য প্রস্তুত করে, তাহার উপর প্রাণপ্রতিষ্ঠার বিশেষ প্রক্রিয়া সমাধা করে, তাহার পর হিন্দু ঐ মূর্ত্তিকে তাহার আদিম উপাদান প্রস্তর, মৃত্তিকা বা কাষ্ঠমাত্র বলিয়া আর জ্ঞান করে না; কিন্তু তাহা সজীব হইয়াছে, বরঞ্চ আশ্চর্য্য ক্রিয়াসাধক ক্ষমতাবিশিষ্ট হইয়াছে, এমন দৃঢ় বিশ্বাস করে। অতঃপর দেবতা পুরুষ হইলে তাহার বিবাহের বন্দোবস্ত হয়, এমন কি, হিন্দু আপন সন্তানের বিবাহে যেরূপ ব্যয় করিয়া থাকে, এইরূপ দেবতার বিবাহে তাহার কিছুমাত্র কম ব্যয় করে না। এক্ষণে নিগূঢ় ব্যাপার সমাধা হইয়াছে, ঐ হস্তনির্ম্মিত দেব বা দেবী তাহার ভাগ্যের হর্ত্তা-

কর্ত্তা হইয়া দাঁড়াইয়াছে ও নিত্য তাহার ভক্তিযুক্ত উপাসনা ও উপহারের অধিকারী হইয়া উঠিয়াছে।”

একপ্রকার ক্রিয়াকলাপদ্বারা যেমন জড়-দেবতাকে জীবন-বিশিষ্ট করা হয়, তদ্রূপ অন্যবিধ ক্রিয়কলাপের দ্বারা তাহার জীবন হরণও করা যায়।

হিন্দু মিথ্যা আপত্তি পূর্ব্বক বলে, অজ্ঞান অশিক্ষিত লোককে নিরাকার ও বোধাতীত ঈশ্বরের পরিচয় দিবার জন্য তাঁহার মূর্ত্তি গঠন আবশ্যক ; কিন্তু ইহা অকিঞ্চিৎকর হেতুমাত্র ; মনুষ্য যখন না দেখিয়াও দূরস্থ হিতাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তির প্রতি ভক্তি ও প্রেম প্রদর্শন করিতে সক্ষম হয় ; মহারাণীকে কখন চাক্ষুষ না দেখিলেও তাঁহার কর্তৃত্ব-ক্ষমতা স্বীকার করিয়া থাকে, তখন তাহারা আত্মারূপী ঈশ্বরকেও আত্মায় ও সত্যে আরাধনা ও সেবা করিতে সক্ষম হইতে পারে। প্রতিমা বরঞ্চ ঈশ্বরোপাসনার সহকারী না হইয়া বিঘ্নকর হয়। অতি মহান ঈশ্বর যিনি আমাদের তাবৎ জ্ঞান ও বাক্যের অতীত, প্রতিমাদ্বারা তাঁহাকে প্রকাশ করা তাঁহার পক্ষে সাতিশয় অপমানজনক। পুত্র যদি নিজ পিতার অনুপস্থিতিতে একটী ভেককে পিতার স্বরূপ বলিয়া সম্মান করে, পিতা কি তাহাতে পুত্রের প্রতি প্রসন্ন হইবেন ?

হিন্দুধর্ম্মে ঈশ্বর সংখ্যা ক্রমশই বর্দ্ধিত হইয়া আসিতেছে ; ভারতবর্ষে যত দেবালয় বিভিন্ন প্রকার দেবদেবীর উদ্দেশে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, জগতের কোথায়ও তত দেখা যায় না। বড় বড় নগরে সহস্র সহস্র দেবমন্দির নির্ম্মিত রহিয়াছে।

প্রায় সর্ব্বত্রই প্রধান দেবতার উদ্দেশে নির্ম্মিত মন্দির দেখা যায়, যথা, শিব, বা শিবলিঙ্গ মন্দির, বিষ্ণু, কৃষ্ণ, রাম, জগন্নাথ, ও তাঁহাদিগের স্ত্রীদিগের উদ্দেশে প্রতিষ্ঠিত দেবালয় বিদ্যমান রহিয়াছে ; তদ্ভিন্ন পবিত্র বলিয়া গণ্য অনেক স্থান আছে, তৎসমুদয় যুধিষ্ঠির, অর্জ্জুন, ভীম প্রভৃতি বীরগণের উদ্দেশে এবং ভরদ্বাজ, কপিল প্রভৃতি ঋষিগণের সম্মানার্থে পবিত্র স্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছে। প্রায় সর্ব্বত্র শিব ও দুর্গার তনয় গণেশের

মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়; তিনি ভূত, পিশাচ প্রভৃতি উপ-দেবতাদলের প্রভু, তাহারা সকল শুভ কার্য্যে বিঘ্নোৎপাদন করে; এজন্য সকল কার্য্যের আরম্ভে গণেশকে প্রসন্ন ও আহ্বান করা হয়। শিবের অপর পুত্র স্কন্দ বা কার্ত্তিকেয় ভূত, পিশাচ প্রভৃতি শিবের সৈন্যদলের অধিনায়করূপে দক্ষিণ ভারতবর্ষে পূজিত হইয়া থাকেন; তাঁহাকে এই জন্য সুব্রাহ্মণ্য বলা যায়।

ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র হনুমান দেবের উদ্দেশে প্রতিষ্ঠিত দেবা-লয় দৃষ্ট হয়। হনুমান রামের ভক্ত অনুচর; পত্নী উদ্ধারকার্য্যে রাম এই ভক্তের নিকট বিশেষ সাহায্য পাইয়াছিলেন। পূজকেরা হনুমানের মূর্ত্তি সিন্দূরদ্বারা রঞ্জিত করিয়া থাকে,ও রামভক্তের আদর্শ দেব-রূপে লোকে তাহার পূজা করে। রাবণজয়ের পর রাম হনুমানকে রাবণের অধিকৃত দক্ষিণ ভারতের কর্ত্তৃত্ব প্রদান করেন, তথায় হনুমান ও তাহার দলস্থেরা বসবাস করিয়াছিল। অদ্যাপি প্রত্যেক মহারাষ্ট্রীয় গ্রামে হনুমান-মূর্ত্তির পূজা হইয়া থাকে।

হনুমান।

ভারতবর্ষের অনেক নগরে, বিশেষতঃ বেনারসে নবগ্রহের জন্য মন্দির প্রতিষ্ঠিত আছে; সেই নবগ্রহের নাম এই;—সূর্য্য-দেব, চন্দ্রদেব, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, রাহু ও কেতু।

তদ্ভিন্ন অন্নপূর্ণা, শীতলা, ভৈরবনাথ বা দণ্ডপাণি ইত্যাদি অনেকানেক দেবতার উদ্দেশে পবিত্র স্থান নিরূপিত আছে।

নিম্নলিখিত দেবগণের উদ্দেশে খোদিত প্রস্তরমূর্ত্তি সচরাচর দৃষ্ট হয়;— আকাশ-রাজ্যের দেবতা ইন্দ্র, জলদেবতা বরুণ, ধনদেবতা কুবের, প্রেম-দেবতা কাম বা কন্দর্প, হিন্দু হারকিউ-লিস বলরাম, পরশুরাম নামে দেবতারূপে পূজিত কঙ্কন দেশস্থ ব্রাহ্মণ, মৃত্যুদেব যম। ইহাদের উদ্দেশে প্রতিষ্ঠিত মন্দির নাই, কিন্তু দেবগণের সোপানমঞ্চের উপরে ও পর্ব্বত-গুহাভ্যন্তরে তাহাদের প্রস্তরখোদিত মূর্ত্তি সচরাচর দৃষ্ট হয়।

কোন কোন স্থানে দেবতাদের দল বা 'গণ' উদ্দেশে পবিত্র স্থান প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে নিম্নলিখিত গুলি প্রসিদ্ধ;—

দশ বিশ্বদেব, অষ্টবসু (অগ্নি বা দীপ্তির আকৃতি), একাদশ রুদ্র, দ্বাদশ আদিত্য, দ্বাদশ সাধ্যগণ,—তাহারা পবিত্র স্বর্গীয় প্রাণী, সিদ্ধগণ,—ইহারা সিদ্ধাবস্থাপ্রাপ্ত অর্দ্ধদেববিশেষ।

স্বর্গে পৃথিবীতে ও পৃথিবীর নীচস্থ স্থানে এমন কোন ব্যক্তি বা বস্তু হিন্দুর কল্পনা চ্যুত হয় নাই, যাহাকে পূজা করিতে হিন্দু বিমুখ হইয়াছে; হিন্দু-দেবশ্রেণীতে প্রত্যেকের জন্য স্থান রহিয়াছে। এ পর্য্যন্ত কেবল কতকগুলি প্রধান প্রধান উপাস্য দেবের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে, সমস্তের নামোল্লেখ করাও প্রায় অসাধ্য ব্যাপার। বীর, সাধু, যোগী, ঋষিবর্গের উদ্দেশে প্রতি দিন নূতন নূতন স্থান প্রতিষ্ঠিত হইতেছে, কোথায় গিয়া এই কার্য্য স্থগিত হইবে, তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই।

তীর্থযাত্রা।

তীর্থ শব্দের অর্থ যে স্থানে পার হওয়া যায়, ইহার বিশেষ অর্থ যে স্থানে মুক্তিলাভ হয়। সর্ব্বসম্মত হিন্দুধর্ম্ম-মধ্যে তীর্থযাত্রা একটী নিতান্ত প্রয়োজনীয় কর্ত্তব্য কার্য্য গণিত হয়। কল্পিত পবিত্র স্থান দর্শন করিবার ইচ্ছা হিন্দুর মনে এত প্রবল যে, একটী তীর্থস্থান দেখিয়া তৃপ্ত হয় না, অনেক তীর্থস্থান ক্রমশঃ কল্পিত হইয়াছে। অনেকে সমস্ত জীবনকাল অথবা জীবনের শেষাংশ কোন তীর্থস্থানে যাপন করিয়া থাকে। এইরূপে ভারতবর্ষ ক্রমশঃ তীর্থস্থানে পূর্ণ হইয়া উঠিতেছে। এমন সকল স্থানের একরূপ গুণ দাঁড়াইয়াছে যে, তথায় গেলেই হিন্দু পবিত্রতা, পরিত্রাণ ও আশীর্ব্বাদের অধিকারী হইয়া উঠে। তীর্থস্থান দর্শনে বিশ্বাস ও ভক্তির গুণে পুণ্যসঞ্চয় ও পাপের প্রায়শ্চিত্ত সাধন হয়, ইহা সাধারণ হিন্দুর দৃঢ় বিশ্বাস। তদ্ভিন্ন শ্রাদ্ধ উপলক্ষে, কখন২ পীড়াবিশেষের আরোগ্য উদ্দেশ্যেও তীর্থযাত্রা করা হয়, কখন বা মৃত আত্মীয়ের শব-ভস্ম কোন পবিত্র-সলিলা নদীতীরস্থ তীর্থে লইয়া গিয়া উক্ত আত্মীয় ব্যক্তির স্বর্গপ্রাপ্তি কামনা করিয়া তাহার ভস্ম নদীতে নিক্ষেপ করা হয়।

তীর্থস্থানের সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি হইয়াছে। নদীসকল দেশের উর্ব্বরতা সাধন করে, তাহাতে মনুষ্য ধৌত ও পরিষ্কৃত হয়, ইহাতেই তাহা হিতকর ও পবিত্রতাসাধক গুণের অধিকারী হইয়া উঠিয়াছিল। ক্রমশঃ প্রত্যেক নদীই দেবতাবিশেষের বাসস্থান বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে ও তাহার অনুবর্ত্তী ফলস্বরূপ স্বয়ং নদীতেই দেবত্ব আরোপিত হইয়াছে ও তাহা যাবতীয় নৈতিক অপরাধ ও কলঙ্ক ধৌত করিতে সক্ষম, লোকের মনে এরূপ ধারণা দাঁড়াইয়া গিয়াছে। গঙ্গানদী সুবৃহৎ ও উপকারী, ক্রমে তাহা সমস্ত নদী অপেক্ষা পবিত্র বলিয়া সমাদৃত হইতে লাগিল, তাহাতে সর্ব্বপ্রকার পাপই ধৌত ও কলঙ্ক মোচিত হয়, এই জ্ঞান ক্রমশঃ লোকের মনে বদ্ধমূল হইয়া উঠিয়াছে; তদনুসারে গঙ্গাতীরে অসংখ্য স্নানাগার নির্ম্মিত হইতে লাগিল, তাহার তীরপ্রদেশে গঙ্গাপুত্র ব্রাহ্মণগণ বাস করিতে আরম্ভ করিল; যাহারা পাপ ধৌত করিতে গঙ্গাতীরবর্ত্তী হয়, ব্রাহ্মণেরা কৌশলপূর্ব্বক আপনাদের স্বার্থসাধন করিয়া তাহাদিগকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হয়, তাহাদের পাপ-পীড়িত কলুষিত সংবাদের উপর 'পাপক্ষমা হইয়াছে' বলিয়া ছাপ দিয়া থাকে। এইরূপে দেশমধ্যে গঙ্গাজলের ব্যবসায় প্রবলরূপে চলিয়া আসিতেছে, সমস্ত দূরস্থানে অর্থব্যয় ও ক্লেশস্বীকার পূর্ব্বক লোকে তাহা বহন করিয়া লইয়া গিয়া থাকে।

প্রয়াগ।

এলাহাবাদে বা প্রয়াগে গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতীর (ভূমির নিম্ন দিয়া প্রবাহিতা, কল্পনা করে) সঙ্গম হওয়াতে তাহা ভারতবর্ষ মধ্যে অতি পবিত্র স্থান বলিয়া বিবেচিত হয়। এই তিন পবিত্র সলিলের সঙ্গমকে নদীর ত্রিমূর্ত্তি, অথবা দেবী বা মাতৃগণের সম্মিলন জ্ঞান করা হয়। ক্রমশঃ গঙ্গার ন্যায় অন্যান্য নদীরও পবিত্রতা কল্পিত হইয়াছে; এইরূপে গোদাবরী, নর্ম্মদা, তাপ্তী, শাভ্রমতী, কৃষ্ণা, বীন, সরযূ, তুঙ্গভদ্রা, কাবেরী প্রভৃতি বহুতর নদী পবিত্র বলিয়া বিবেচিত হয়। পুরাণে এই সকল নদীর মাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়া নূতন নূতন অধ্যায় সংযুক্ত হইয়াছে, দেব-

গণ বা ঋষিগণ তাহাদিগকে পবিত্ররূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন; যেমন গোদাবরীর পবিত্রতা রামচন্দ্র দ্বারা গৌতমের কাছে ও শাভ্রমতীর পবিত্রতা কাশ্যপের দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছে।

পবিত্রা নদীর উৎপত্তিস্থান হইতে সমুদ্র সঙ্গম পর্য্যন্ত তীর-দেশ সমুদয়ই পবিত্র স্থান বিবেচিত হয়; এই সমস্ত তীরভূমি পদব্রজে ভ্রমণ করা অতি পুণ্য কার্য্য বলিয়া গণিত হয়। এই রূপ ভ্রমণেচ্ছু যাত্রীকে, দৃষ্টান্তস্বরূপে, গঙ্গার উৎপত্তিস্থানে গঙ্গোত্রী হইতে বামতীর দিয়া পদব্রজে সাগর পর্য্যন্ত ও পুনরায় সাগর হইতে দক্ষিণ তীর দিয়া গঙ্গোত্রী পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিতে হয়। এমন কার্য্যকে নদী-প্রদক্ষিণ বা পরিক্রম বলে, গঙ্গা প্রদক্ষিণ করিতে ছয় বৎসর কাল লাগিয়া থাকে। এই ভাবে লোকে বিন্ধ্য পর্ব্বতস্থ অমর কণ্টক নামে নর্ম্মদার উৎপত্তিস্থান হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রোচের নিকটস্থ প্রদেশে তাহার সাগর সঙ্গম-স্থান পর্য্যন্ত ভ্রমণ করে, ইহাতে তিন বৎসর ব্যয় হয়, গোদাবরী ও কৃষ্ণার তীরদেশ ভ্রমণে দুই বৎসর লাগে। সময়ের ন্যূনাতি-রেক অনুসারে লব্ধ পুণ্যেরও তারতম্য হইয়া থাকে।

নদীমধ্যে দেবতা বাস করিয়া তাহা যেমন পবিত্র ও তাহার জল পাপ ধৌত করণের পক্ষে অনুকূল করিয়াছেন, তেমনি নদী সকলের তীরদেশে ক্রমশঃ অসংখ্য নগর, গ্রাম ও স্নানের স্থান পবিত্র হইয়া উঠিয়াছে। এইরূপ নগর বা গ্রাম অচিরকাল মধ্যে তীর্থ বলিয়া গণিত হইয়া থাকে; যেমন শিব নিজ পুত্র স্কন্দের নিকট কাশী আপনার বাসস্থান রূপে প্রকাশ করিয়া কাশীকে পবিত্র করিয়াছেন। কথিত আছে, শিব কাশী সন্নিহিত স্থানে কঠোর তপস্যায় আসীন হইয়াছিলেন (স্কন্দ পুরাণের কাশীখণ্ড দেখ)।

বারাণসী, বেনারস বা কাশী। এই সুপ্রসিদ্ধ নগরে অন্যূন দুই লক্ষ লোক বাস করে, তাহার মধ্যে ২৫০০০ ব্রাহ্মণ। ভারত-বর্ষে সম্ভবতঃ এই নগর সর্ব্বপ্রথমে পবিত্র বলিয়া বিখ্যাত হয়। হিন্দু-

বারাণসী।

ধর্ম্মরূপ দুর্গমধ্যে বারাণসী নগরেই ব্রাহ্মণের কৌশল ও পরাক্রম

সমধিক প্রদর্শিত হইয়াছে। মূর্ত্তিপূজা অতি বিকটাকার রূপ ধারণ পূর্ব্বক এখানে রাজত্ব করে। এখানকার দেবমূর্ত্তি, মন্দির, লিঙ্গ, পবিত্রকুণ্ড, উৎস, পুষ্করিণী প্রভৃতির সংখ্যা করা যায় না, তথাকার প্রত্যেক পরমাণু পবিত্র, বায়ুও নির্ম্মলকারী। ছোট ছোট পবিত্রস্থান ছাড়া মন্দিরের সংখ্যা দুই সহস্র হইবে। প্রধান শিবমন্দিরের নাম বিশ্বেশ্বরের মন্দির, তাহার উপরিভাগ স্বর্ণ-মণ্ডিত, তন্মধ্যে কয়েক সহস্র মূর্ত্তি ও লিঙ্গ সংগৃহীত ও প্রতিষ্ঠিত আছে। বোধ হয়, সমস্ত নগরের মূর্ত্তি সংখ্যা পাঁচ লক্ষের ন্যূন হইবে না। পৃথিবীতে কাশী স্বর্গস্বরূপ বিবেচিত হয়, যদি হিন্দু কাশীধামের পঞ্চকোশী পরিধির মধ্যেও মরিতে সক্ষম হয়, এমন কি, ইউরোপীয় বা অন্য কোন জাতি হইলেও, কোন মতে স্বর্গীয় সুখে বঞ্চিত হয় না।

অনেক কাল পর্য্যন্ত গঙ্গা ও বেনারসের এই উন্নত গৌরব-সূচক অধিকার একচেটিয়া ছিল; কিন্তু ব্রাহ্মণের ক্রমশঃ গঙ্গা-তীর ও বেনারসের সামীপ্য প্রদেশ ত্যাগ করিয়া অন্যান্য স্থানে বাস করিতে বাধ্য হওয়াতে কাশীর এই একাধিপত্য নষ্ট হইতে লাগিল। যে যে স্থানে উষ্ণপ্রস্রবণ, পার্ব্বত্য গুহা, আগ্নেয় পদার্থ, পর্ব্বতের বিচিত্র দৃশ্য প্রভৃতি অদ্ভুত আকারের প্রাকৃতিক দৃশ্য লোকদিগের নয়নগোচর হইত, তাহাই ব্রাহ্মণদের উপ-জীবিকার উপায় স্বরূপে গৃহীত হইল, এবং আচিরাৎ তত্তৎ স্থানের উদ্দেশে লোকদের ভক্তি উদ্দীপক নানা গল্প কথা রচিত হইতে লাগিল। দৃষ্টান্তস্বরূপে—কাটিবারে একটা জলকুণ্ড আছে, তাহা কৃষ্ণের শরীরনিঃসৃত ঘর্ম্ম বলিয়া বর্ণিত হওয়াতে লোকদের বিশ্বাসের পদার্থ হইয়া উঠিয়াছে। এইরূপে পুরীর জগ-ন্নাথের সম্বন্ধে অনেক গল্প রচিত হইয়াছে; লোকে বিশ্বাস করে, বিকটাকার জগন্নাথ মূর্ত্তিতে কৃষ্ণের অস্থি আছে।

অনন্তর পুরাণে, বিশেষরূপে স্কন্দ পুরাণে অনেক গল্প সংযোগ করিয়া স্থানবিশেষের পবিত্রতা প্রচার করা হইয়াছে। বিশেষ বিশেষ দেবতা তথায় বাস করেন, লোককে এরূপ বিশ্বাস করা-ইতে প্রয়াস পাইয়াছে; যেহেতুক স্থানবিশেষের মাহাত্ম্য প্রচার

করণার্থে ভারতের সর্ব্বত্র প্রচারক প্রেরণ করা হয়। ক্রমশঃ অনেক অনেক স্থান দেবতাবিশেষের অনুগৃহীত স্থান জ্ঞানে লোকে তাহার আদর করিতে আরম্ভ করিয়াছে। এইরূপে প্রয়াগ, গয়া প্রভৃতি স্থান বেনারসের পরে পবিত্র তীর্থস্থান রূপে লোকের নিকট সমাদৃত হইয়া উঠিয়াছে।

বেনারস, গয়া, এলাহাবাদ, পুরী প্রভৃতি স্থানের পুরোহিতেরা আপনাদের পাণ্ডাগণকে দালাল স্বরূপে ভারতবর্ষের সকল প্রধান নগরে প্রেরণ করিয়া থাকে, তাহারা আপন আপন স্থানের মাহাত্ম্য প্রকাশ করিয়া লোকদিগকে তত্তৎ স্থানে তীর্থযাত্রা করিতে উত্তেজিত করে। একবার কোন নূতন স্থানে যাত্রী সমাগম করাইতে পারিলে সহজেই অন্য অন্য লোকে তাহাদের পথানুবর্ত্তী হয়। এই প্রকারে সর্ব্বদা নূতন নূতন স্থান তীর্থক্ষেত্র হইয়া উঠিতেছে। দাক্ষিণাত্যের পান্ধারপুর অল্পকালের মধ্যে তীর্থস্থান বলিয়া গণিত হইয়াছে।

তীর্থস্থানে ব্রাহ্মণের অসীম প্রভুত্ব, তথাকার নির্দ্দিষ্ট পুণ্য কার্য্যাদি সম্পন্ন করা সর্ব্বতোভাবে ব্রাহ্মণের উপর নির্ভর করে, এই কৌশল ব্রাহ্মণের পাওনা আদায়ের পন্থা ব্যতীত আর কিছুই নয়। এইরূপে দিবাদস্যুগণ অনায়াসে বিদেশীয় ভ্রান্ত লোকদের সম্পত্তি লুণ্ঠণ করিতে সক্ষম হয়। তথাকার নীচাশয়েরা অতি দরিদ্রের অর্দ্ধ পয়সা হইতে ধনশালী ব্যক্তিগণের প্রচুর ধনরাশি পর্য্যন্ত অনায়াসে হস্তগত করিয়া থাকে। অনেকানেক পবিত্র স্থানে প্রতি বৎসরই যাত্রী সমাগম হয়; কিন্তু কোন কোন প্রসিদ্ধ স্থানে দ্বাদশ বৎসরে একবার বহু জনতার সমাবেশ হইয়া থাকে। বৃহস্পতিগ্রহ দ্বাদশ বৎসরে একবার কুম্ভ রাশিতে প্রবেশ করে, তৎকালে হরিদ্বারের মহামেলা; যখন মকর রাশিতে প্রবেশ করে, তখন প্রয়াগের মহামেলা; যখন সিংহ রাশিতে প্রবেশ করে, তখন ত্র্যম্বকের মহামেলা পালিত হইয়া থাকে। এই সকল মেলায় তত্তৎ স্থান অত্যধিক জনাকীর্ণ হওয়াতে বিসূচিকা, জ্বর প্রভৃতির প্রাদুর্ভাবে মহামারী উপস্থিত হইয়া অসংখ্য অসংখ্য প্রাণহানি করিয়া থাকে। আবার

লোকে অতিরিক্ত ক্লেশ স্বীকার পুণ্যলাভের উপায় বিবেচনা করিয়া অনেক প্রকার অযথা ক্লেশ স্বীকার করিতে বাধ্য হয়। কেহ কেহ শত শত মাইল আপনার পরিমিত শরীর ভূমিতে শায়িত করিয়া তদ্দ্বারা পথের দূরত্ব পরিমাণ করিতে করিতে অগ্রসর হয়।

কোন কোন প্রাচীন পুস্তকে পুণ্যস্থান বলিয়া নিম্নলিখিত সাতটী স্থানের উল্লেখ আছে :—

১ কাশী বা বেনারস, ২ কংসপুরী মথুরা, ৩ হরিদ্বার, (মায়া) যেখানে গঙ্গা হিমালয় হইতে সমভূমিতে প্রবেশ করিয়াছে, ৪ অযোধ্যা (বর্ত্তমান ফাইজাবাদ) রামের রাজধানী, ৫ দ্বারকা কৃষ্ণের পুরী, গুজরাটে অবস্থিত, ৬ অবন্তি বা উজ্জয়িনী, ৭ কাঞ্চী বা কঞ্জেবরম (কাঞ্চীপুরম) মান্দ্রাজের সন্নিকট।

আবার কোন কোন পুস্তকে কেবল তিনটী স্থানের উল্লেখ আছে ; যথা, বেনারস আত্মত্যাগের জন্য ; প্রয়াগ (এলাহাবাদ) মস্তক মুণ্ডনের জন্য, ও গয়া শ্রাদ্ধের জন্য। এই শেষোক্ত স্থানে বিষ্ণুর পদচিহ্ন লোকদিগকে দেখান হয়।

নদী সঙ্গমের স্থান পবিত্র বলিয়া গণ্য। নদীবিশেষের উৎপত্তি ও কোন কোন স্থানে তাহাদের সাগর সঙ্গম তীর্থস্থানরূপে গণিত হয় ; যথা, গঙ্গোত্রী, যমোত্রী, অমরকণ্টক, মহা-বালেশ্বর, তাপীমূল ও গঙ্গাসাগর।

দেবতা বিশেষের বাসস্থান বলিয়া চারিটী পবিত্রধাম পুণ্যক্ষেত্র গণিত হয়। উড়িষ্যা দেশস্থ পুরী বা জগন্নাথক্ষেত্র, দ্বারকা, হিমালয় প্রদেশের বদরিনাথ, এবং হিন্দুস্থান ও সিংহলের মধ্যে অবস্থিত, স্থল হইতে ছয় মাইল দূরবর্ত্তী রামেশ্বর নামক একটী দ্বীপ।

শিবলিঙ্গের নিমিত্তে ১২টী স্থান তীর্থক্ষেত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ ; সোমনাথ, বিশ্বনাথ, ত্র্যম্বকনাথ, বৈদ্যনাথ, নাগনাথ, রামনাথ ইত্যাদি।

পঞ্চ হ্রদ বা সরোবর ঐশ্বরিক বা পবিত্র বলিয়া বিখ্যাত ; যথা, কচ্ছ প্রদেশস্থ নারায়ণ হ্রদ, আজমীরের পুষ্কর, আহম্মদাবাদ

হইতে ত্রিশ ক্রোশ দূরস্থ সিদ্ধপুরের বিন্দু, কর্ণাট প্রদেশস্থ পম্পা ও হিমালয় প্রদেশস্থ মানস সরোবর।

দেবীগণের উদ্দেশে প্রতিষ্ঠিত প্রসিদ্ধ চারিটী পীঠস্থান আছে, যথা, কোলাপুরের মহালক্ষ্মী, শোলাপুরের নিকটস্থ ভবানী, মাতাপুরের রেণুকা এবং আহম্মাদনগর হইতে ৮০ মাইল দূরবর্ত্তী যোগেশ্বরী।

এতদ্ভিন্ন দেব ও দেবীগণের উদ্দেশে পবিত্রীকৃত স্থানের সংখ্যা এত অধিক যে তাহাদের নাম ও সংক্ষেপে পরিচয় দেওয়াও দুরূহ ব্যাপার বোধ হয়।

এক্ষণে আমরা পুরীর তীর্থযাত্রা সম্বন্ধে কিছু বর্ণনা না করিয়া এ প্রস্তাবের শেষ করিতে পারি না। বেনারসের নীচে পুরীকে পবিত্র স্থান বলিয়া লোকে বিশ্বাস করে। তথায় জগন্নাথের মূর্ত্তি স্থাপিত আছে; এজন্য কখন কখন সমস্ত উড়িষ্যা প্রদেশকেই পবিত্র ভূমি বলিয়া থাকে। পুরী বঙ্গসাগরের তীরস্থ একটী নগর; তথায় জগন্নাথের মন্দির নির্ম্মিত রহিয়াছে। জগন্নাথের মূর্ত্তি সম্বন্ধে এইরূপ গল্প প্রচলিত আছে:—শ্রীকৃষ্ণ কোন ব্যাধ কর্ত্তৃক তীর-বিদ্ধ হইয়া পঞ্চত্ব পান ও বৃক্ষতলে কতক কাল তাঁহার শরীর পতিত ছিল, অনন্তর কয়েক সাধু ব্যক্তি তাহা একটী সিন্দুকের মধ্যে সংস্থাপিত করিয়া রাখিয়াছিল। পরে রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের উপর আদেশ হয়, যেন তিনি একটী প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে কৃষ্ণের অস্থিগুলি সংস্থাপিত করেন। রাজা এই আদেশানুসারে শিল্পকুশল বিশ্বকর্ম্মা দেবকে এই কার্য্যভার গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন; বিশ্বকর্ম্মা রাজার অনুরোধ গ্রাহ্য করিলেন, কিন্তু তিনি বলিলেন, প্রতিমা গঠন কালে কেহ যেন তাঁহাকে বিরক্ত না করে। রাজা তাহাতে সম্মত হইয়াও পঞ্চদশ দিবসের পর বিশ্বকর্ম্মার কার্য্য দেখিতে গিয়াছিলেন, তাহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া অসম্পূর্ণ অবস্থায় এই মূর্ত্তি পরিত্যাগ করিয়া বিশ্বকর্ম্মা প্রস্থান করিলেন। এইরূপে জগন্নাথের হস্তপদবিহীন কদর্য্য মূর্ত্তি গঠিত হইয়াছে। জগন্নাথের

পুরী।

মূর্ত্তির নিকটে কৃষ্ণের ভ্রাতা বলরামের ও ভগিনী সুভদ্রার মূর্ত্তিও সচরাচর অবস্থিত থাকে। জগন্নাথের মন্দির নানাবিধ বিশ্রী ও লজ্জাকর মূর্ত্তিতে চিত্রিত, তাহা অতি কুরুচিকর কদর্য্য দৃশ্য।

জগন্নাথের পাণ্ডাগণকে যথার্থরূপে যাত্রী-শিকারী বলা যাইতে পারে। তাহারা দেশের চতুর্দ্দিকে গিয়া লোকদিগকে মিথ্যা পুণ্য সঞ্চয়ের প্রত্যাশা দান পূর্ব্বক পুরীর তীর্থযাত্রায় প্রবর্ত্তিত করে। পুরীর চতুর্দ্দিকস্থ দেশ স্বর্ণভূষিত বলিয়া লোকে ব্যাখ্যা করে, কিন্তু কলিযুগ প্রযুক্ত ঐ সকল স্বর্ণ ধূলিবৎ প্রতীয়মান হয়। পুরীর তীর্থযাত্রীদের অধিকাংশ কুসংস্কারাবিষ্টা স্ত্রীলোক; তাহারা প্রবঞ্চক পাণ্ডাদের বাক্যে মোহিত হইয়া আপন আপন স্বামী ও অন্য পুরুষ অভিভাবকদের ইচ্ছাবিরুদ্ধে গোপনে গৃহবহির্ভূত হইয়া তীর্থযাত্রা করে। স্বামীগণ কখন কখন এই দুরাত্মাদের হাত হইতে আপনাদের অবলাগণকে রক্ষা করিবার জন্য তাহাদিগকে গৃহমধ্যে রুদ্ধ করিয়া রাখে। যাত্রীদের মধ্যে অনেকে পথি মধ্যে প্রাণ হারায়। পুরীর পথের দুই পার্শ্বে বহুসংখ্যক মনুষ্যকঙ্কাল পতিত দৃষ্ট হয়। যাত্রীগণ যখন পুরী শহরে অবস্থান করে, তখন প্রায়ই নগরমধ্যে মহামারীর প্রাদুর্ভাব হয়; কারণ তথাকার বাসস্থান ও খাদ্য অতিশয় অপকৃষ্ট। তথায় আপনাদের জন্য খাদ্য পাক করা পাপকার্য্য বলিয়া গণিত। জগন্নাথের উদ্দেশে উৎসৃষ্ট মহাপ্রসাদখ্যাত খাদ্য সকল যাত্রীকে ক্রয় করিয়া ভোজন করিতে হয়। এই খাদ্যের মূল্য অধিক, অথচ তাহা অপকৃষ্ট ও প্রায়ই পচা; কিন্তু তাহা হইলেও তাহার কিঞ্চিন্মাত্র ফেলিয়া দেওয়া মহা অধর্ম্ম গণিত হয়; এজন্য যতই অপকৃষ্ট বা পচা হউক, এই মহা প্রসাদ ভোজন করিতেই হইবে। বলবান যুবকেরা পর্য্যন্ত তাহা ভোজন করিয়া উদরাময় প্রভৃতি পীড়াতে আক্রান্ত হয়; ক্লান্ত ও দুর্ব্বলা নারীগণের পক্ষে তাহা বাস্তবিক মারাত্মক বিষবৎ খাদ্য।

পুরীতে স্নানযাত্রা ও রথযাত্রা নামে দুইটী বিভিন্ন উৎসব হইয়া থাকে। জগন্নাথের মূর্ত্তির প্রথম নির্ম্মাণ কার্য্য স্মরণার্থে

স্নানযাত্রায় উৎসব পালিত হয়। বিশ্বকর্ম্মা দেবের শিল্প-কৌশল জগন্নাথের মূর্ত্তিতে দেদীপ্যমান রহিয়াছে; ফলতঃ সুনিপুণ শিল্পী তাহার সুগোল বৃহৎ চক্ষুদ্বয় ও শীর্ণ নাসিকা দ্বারা তাহাকে একটী বৃহদাকার পেচকের রূপে ভূষিত করিয়াছে। স্নান যাত্রার উৎসবের কিছু পূর্ব্বে মূর্ত্তি সকল বাহিরে আনিয়া একটী নির্দ্দিষ্ট কূপজলে স্নান করান হয়, তৎপরে তাহাদিগকে সুন্দর বস্ত্রে ভূষিত করে। পরে পীড়াভবন নামক কোন ক্ষুদ্র কুঠরীতে তাহাদিগকে পঞ্চদশ দিন রাখা হয়। তখন জলস্পর্শে দেবতার জ্বর হইয়াছে, লোকদিগকে এরূপ বুঝান হয়; কিন্তু বাস্তবিক এই সময়ে দ্বার সকল রুদ্ধ করিয়া প্রতিমার গাত্রে রং মাখাইয়া তাহাকে রঞ্জিত করা হয়।

ইতিমধ্যে রথযাত্রার কাল সমাগত হয়, দেবতাকে তখন সুরঞ্জিত ও বস্ত্র ভূষণাদিতে ভূষিত করা হইয়াছে, অতএব যাত্রীগণকে দেবদর্শনের অধিকার দেওয়া হয়। জগন্নাথের তিনটী রথ অতি বৃহৎ ও ভারী, তাহা অতি আয়াস ও কষ্ট সহকারে সঞ্চালিত হইয়া থাকে। প্রতিবৎসর জগন্নাথের রথ নূতন করিয়া নির্ম্মিত হয়, ও পুরাতন রথ খণ্ড খণ্ড করিয়া তাহার কাষ্ঠখণ্ড সকল উচ্চ মূল্যে বিক্রীত হয়। এই কাষ্ঠখণ্ড চিতাকাষ্ঠের সহিত ব্যবহৃত হইলে তাহা মহা ফলদায়ক বলিয়া লোকে তাহা ক্রয় করিবার জন্য কোনরূপ মূল্য দিতে কুণ্ঠিত হয় না। লোকে রথ টানিয়া দুই মাইল দূরে অবস্থিত অন্য এক মন্দির পর্য্যন্ত লইয়া যায়, এই যাত্রায় প্রায় চারি দিন লাগে। তথায় লক্ষ্মীর মূর্ত্তি আনিয়া জগন্নাথের মূর্ত্তির সহিত সম্মিলন করান হয়। এই শেষোক্ত মন্দিরে কয়েক দিন অবস্থানের পর জগন্নাথকে পুনর্ব্বার রথে করিয়া তাহার নিজ মন্দিরে আনা হয়।

এই মূর্খতার কাণ্ড দেখিবার জন্য ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র হইতে লক্ষ লক্ষ লোকের জনতা কয়েক দিনের জন্য পুরীতে সমাগত হয়। দুর্ভাগ্য যাত্রীগণের অনেকে পথিমধ্যে অকালে প্রাণ হারায় ও অনেকবার এরূপ ভয়ানক শোচনীয় দৃশ্য দৃষ্টিগোচর

হয় যে, পীড়িত দুর্ব্বল যাত্রী আপন আপন সঙ্গীগণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া অর্দ্ধমৃত অবস্থায় শৃগাল ও শকুনী কর্ত্তৃক ভক্ষিত হইতেছে। তীর্থক্ষেত্র সকল দস্যু, বেশ্যা ও প্রবঞ্চক-দের প্রধান আড্ডা, দূর-দেশাগত মুক্তিপ্রয়াসী সবলপ্রকৃতির যাত্রীগণ অনায়াসে ইহাদের দ্বারা লুণ্ঠিত ও প্রবঞ্চিত হইয়া থাকে। আবার অন্যপক্ষে, অনেক অলস ব্যক্তি অন্যের পরি-শ্রমলব্ধ সম্পত্তির দ্বারা জীবন ধারণ করিতে ইচ্ছুক হইয়া যাব-জ্জীবন এ তীর্থে, সে তীর্থে ভ্রমণ করিয়া নিষ্কর্ম্মাবস্থায় জীবন যাপন করে। তীর্থদর্শনের আবশ্যকতা দ্বারা এই সকল কুফল উৎপন্ন হইয়াছে। যদি ভারতবর্ষের সমস্ত লোকেই তীর্থভ্রমণ-কারীদের মত সাধু হইয়া উঠিত, তাহা হইলে ভারতীয় লোকে কি ভয়ানক অবস্থায় আনীত হইয়া জগতের ভারস্বরূপ হইত?

জাতিভেদ।

'জাতিবিচার হিন্দুত্বের প্রধান লক্ষণ' মনুষ্য যতক্ষণ জাতি-ভেদ মানে, ততক্ষণ তাহাকে হিন্দু বলিয়া গণ্য করা যায়।

জাতিভেদের উৎপত্তি। লোকে সাধারণতঃ বিশ্বাস করে, ব্রহ্মার মুখ, বাহু, উরুদেশ ও পদতল হইতে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের জাতি উৎপন্ন হইয়াছে। কিন্তু এই কল্পিত বিষয়ে নানা মুনির নানা মত পাওয়া যায়; তন্মধ্যে কতকগুলি আমরা এখানে উদ্ধৃত করিতেছি। সতপথ ব্রাহ্মণে বলে, ভূঃ, ভবঃ, স্ব শব্দত্রয় হইতে জাতিভেদ উৎপন্ন হইয়াছে। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে বলে, বেদ হইতে তাহার উৎপত্তি হইয়াছে; আবার এই পুস্তকেরই স্থানান্তরে লিখিত আছে, ব্রাহ্মণশ্রেণী দেবগণ হইতে ও শূদ্র অসুরগণ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। এক পুস্তকে বলে, মনুষ্য বিবস্বত হইতে উৎপন্ন, অন্য পুস্তকে বলে, বিবস্বত-পুত্র মনু হইতে মনুষ্য জাতির আরম্ভ হইয়াছে, অপর একখানি পুস্তকে পাওয়া যায়, মনু নাম্নী এক নারী হইতে নরজাতির সৃষ্টি হই-য়াছে। ভাগবত পুরাণের বর্ণনায় সত্যযুগে একমাত্র জাতি ছিল,

পুনশ্চ বায়ুপুরাণে লিখিত আছে, ত্রেতাযুগের পূর্ব্বে জাতি-পার্থক্য হয় নাই।

ঈদৃশ পরস্পর বিরোধী প্রমাণ সকলই সত্য হইতে পারে না; সুতরাং সকল গুলিরই উপর স্বতঃই অবিশ্বাস জন্মিয়া আইসে।

জাতিভেদের সত্য কারণ। তিন কারণে জাতিভেদ ঘটিয়াছে,—১মতঃ, ভিন্ন জাতি বলিয়া মনুষ্যদের মধ্যে বিভিন্নতা হইয়াছে; জাতি শব্দ হইতেই ইহা প্রতিপন্ন হয়; তদ্রূপ 'বর্ণ' শব্দ দ্বারাও জাতিভেদের কারণ প্রকাশ পায়। ফলতঃ আর্য্যগণ শীতপ্রধান দেশ হইতে ভারতবর্ষে আসিযাছিল, তাহারা এদেশীয় আদিম নিবাসী লোক অপেক্ষা গৌরবর্ণ ছিল, আর্য্যেরা তাহাদিগকে 'কৃষ্ণত্বক' বলিযা অভিহিত করিয়াছিল; ইহাতে স্পষ্ট দৃষ্ট হয় যে, বর্ণানুসারে জাতির ভিন্নতা হইয়াছিল। ২য় কারণ—ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যের লোক বিভিন্ন জাতিরূপে গণিত হইয়াছিল। প্রত্যেক সভ্য জাতির মধ্যে যাজক, সৈনিক, বণিক ও অন্য বিবিধ কর্ম্মকারী লোক পাওযা যায়। এই আদিম প্রধান শ্রেণী চতুষ্টয়ের লোক মিশ্র বিবাহদ্বারা আরও নানা শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া পড়ে; মনু এইরূপ সঙ্কর বিবাহ শ্রেণীবদ্ধ করিয়া নানা ভিন্ন জাতি রচনা করিযাছেন। ৩য় কারণ—ভিন্ন স্থানবাসী বলিয়া জাতির ভিন্নতা ঘটিযাছে, এইরূপে একই জাতীয় লোক পৃথক স্থানবাসী হইয়া পরস্পর বিভিন্ন জাতিরূপে পরিগণিত হইয়াছে।

ভৃগু মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে জাতিভেদের কারণ এইরূপ উল্লেখ করিয়াছেন:—

"জাতির কোনরূপ ভিন্নতা নাই, যেহেতুক ব্রহ্মা কর্ত্তৃক সৃষ্ট পৃথিবীতে কেবল ব্রাহ্মণ জাতি ছিল; কিন্তু কর্ম্মফলে তাহারা পরে বিভিন্ন হইয়া পড়িয়াছে।"

ব্রাহ্মণেরা প্রথমে যজ্ঞকার্য্যের সাহায্যকারী মাত্র ছিল, পরে পারিবারিক যাজক বা পুরোহিত হইয়া উঠে। বহুকাল ধরিয়া প্রাধান্যের জন্য ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের মধ্যে বিবাদ চলিতে থাকে, অবশেষে ব্রাহ্মণেরই জয় হয়। ক্রমশঃ জাতিভেদ প্রথা লোকের

যত অভ্যস্ত হইয়া উঠিতে লাগিল, ততই তাহারা জাতিভেদের শৃঙ্খল উর্ণনাভের জালের ন্যায় ক্রমশঃ পরিসর করিতে ত্রুটি করিল না। এইরূপে এই দুষ্ট প্রথা শ্রেণীর, পরিবারের ও এক মনুষ্যের সহিত অপর মনুষ্যের সম্বন্ধ বিদূরিত করিয়া দিতে লাগিল, এমন কি, অবস্থা এতদূর দাঁড়াইয়াছে যে, এখন মনুষ্যদের সমবেত কার্য্যপ্রণালী একপ্রকার অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে।

শূদ্র শ্রেণীর জন্য মনুর নিরূপিত কতকগুলি বিধি নিম্নে উদ্ধৃত হইল ;—

"৪১৩। ক্রীত বা অক্রীত কোন শূদ্রকে ব্রাহ্মণ বলপূর্ব্বক আপনার সেবাতে নিযুক্ত করিতে পারে ; কারণ স্বয়ম্ভু শূদ্রকে কেবল ব্রাহ্মণের সেবার জন্যই সৃষ্টি করিয়াছেন।"

"৪১৭। ব্রাহ্মণ শূদ্রের সমস্ত সম্পত্তি, আত্মসাৎ করিয়াও মনে পূর্ণশান্তি ভোগ করিতে পারেন, কারণ শূদ্রের আপনার বলিয়া কিছু নাই, তাহার প্রভু তাহার ধনগ্রহণের অধিকারী।"

"১২৫। উচ্ছিষ্ট খাদ্য, পুরাতন বসন, ছাতাপড়া শস্য ও অব্যবহার্য্য গৃহদ্রব্য শূদ্রকে দেওয়া উচিত।"

"২৭০। কোন অনন্য জাত ব্যক্তি (শূদ্র) যদি কোন দ্বিজের প্রতি কটুবাক্য প্রয়োগ করে, তবে তাহার জিহ্বাচ্ছেদ করা কর্ত্তব্য, কারণ সে নীচজাতীয়।"

"২৮১। যদি কোন নীচজাতীয় ব্যক্তি শ্রেষ্ঠজাতির পার্শ্বে উপবেশন করিতে সচেষ্ট হয়, তবে তাহার উরুদেশে দাগিয়া দিয়া নির্ব্বাসন দণ্ড দেওয়া উচিত, অথবা রাজা তাহার পৃষ্ঠভাগ ছেদন করাইতে পারে।"

"৮০। শূদ্রকে পরামর্শ না দিলে ক্ষতি নাই, অথবা উৎসৃষ্ট নবনীতের অংশ বা উচ্ছিষ্ট দ্রব্য না দিলেও না দিতে পারেন। তাহাকে ব্যবস্থা শিক্ষা দিতে হয় না, বা ধর্ম্মবিধি পালনের আদেশ করিবার প্রয়োজন নাই।"

"৮১। কারণ যিনি শূদ্রকে ব্যবস্থা শ্রবণ করান ও ধর্ম্ম-বিধি পালন করিতে আদেশ দেন, তিনি তাহার সহিত অসম্বর্ত্ত নরকের অন্ধকারে নিমগ্ন হন।

হিন্দু শাস্ত্রের এই প্রকারের ব্যবস্থা পাঠ করিয়া তাহা যে সত্য ও ন্যায়ের উপরে সংস্থাপিত, কোন্ নিরপেক্ষ বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তি তাহা স্বীকার করিতে সাহস করিবেন? বাস্তবিক সুচতুর লোকে আপনার সমশ্রেণীস্থ মনুষ্যকে দাসত্বে রাখিবার প্রণালী ও বিধি স্বরূপে তাহা কল্পনা করিয়াছে, তাহা ধর্ম্মনিন্দা ও মিথ্যা কল্পনা ব্যতীত আর কি হইতে পারে? জাতিভেদ লইয়া পণ্ডিত-বর কেয়ার্ড্ যথার্থই বলিয়াছেন, "তাহা মানবজাতির উপরে ঘোরতর অত্যাচার, তাহাতে ধর্ম্মের দোহাই দিয়া কদাচারকে পবিত্র বলিয়া লওয়া হইয়াছে।"

অধ্যাপক ম্যাক্সমূলার আপনার সমস্ত জীবন বেদ ও হিন্দু-শাস্ত্রের গ্রন্থাদি অধ্যয়ন করিতে উৎসর্গ করিয়াছেন, তিনি ঋগ্-বেদ শায়নের টীকা সহিত ইংরাজিতে প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার বাক্য সকলের শিরোধার্য্য সন্দেহ নাই, তিনি বলেনঃ— "জটিল জাতিভেদ প্রণালীর বিষয়ে বেদের গীত সমূহের মধ্যে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না; ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর লোকে যে একত্র ভোজন পান, ও বসবাস করে, তন্নিবারণার্থে কোন বিধি নাই। ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর লোকে বিবাহসূত্রে মিলিত হয়, তদ্বিরুদ্ধে কোন নিষেধবাক্য নাই, অথবা ঈদৃশ বিবাহজনিত সন্তানের উপরে দুরপনেয় কলঙ্ক আরোপের কোনই ব্যবস্থা পাওয়া যায় না। তদ্রূপ প্রতারক যাজক কুল ঈশ্বরীয় সম্ভ্রম অপহরণ করিয়া আপনাদিগকে দেববৎ পূজনীয় করিয়া তুলি-য়াছে ও সমশ্রেণীস্থ মানবগণকে ইতর পশু অপেক্ষা নিকৃষ্ট অবস্থায় নিক্ষেপ করিয়াছে, বেদে তৎসম্বন্ধেও কোন ব্যবস্থা নাই।"

বাগ্মীবর কেশবচন্দ্র সেন "তরুণ ভারতকে" জাতিভেদের অধমতা সম্বন্ধে এইরূপ বিজ্ঞাপন করিয়াছেনঃ—

"জাতিভেদ প্রথায় মানবীয় ভ্রাতৃভাবের অনুকূল ঈশ্বরীয় ব্যবস্থা নির্লজ্জরূপে ভঙ্গিত, ও দেবস্বাপহরণ কার্য্য সাধিত হই-য়াছে, ইহা মনুষ্যদের মধ্যে মহা পার্থক্য উৎপাদন করিয়াছে, অলঙ্ঘ্য ঐশ্বরিক বিধি বিদূরিত করিয়াছে, ও তাঁহার সন্তান-

গণের মধ্যে পবিত্র ঈশ্বরের নামে নিত্য অনৈক্য ও শত্রুতা সংস্থাপন করিয়া দিয়াছে। তাহা মনুষ্যজাতির এক শাখাকে অবশিষ্ট সকল হইতে উন্নত করিয়াছে, ও কেবল সেই শ্রেণীকেই অন্য সকল অপেক্ষা ঐশ্বরিক ব্যবস্থার ছলে শিক্ষা, ধর্ম্ম প্রভৃতি তাবৎ উন্নতিপ্রদ উপায়ের একমাত্র অধিকারী করিয়াছে। তাহা একটী দুরাচারী শ্রেণীকে কোটী কোটী নিরাশ্রয়, দুর্ভাগা মানবের উপর অত্যাচার-পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব প্রদান করিয়া তাহাদিগকে স্বেচ্ছাচার পূর্ব্বক শাসন করিবার ক্ষমতার অধিকারী করিয়া দিয়াছে, দুর্ভাগা মানবগণকে পদমর্দ্দিত করিয়া আপনাদের চিরদাসত্বশৃঙ্খলে আবদ্ধ রাখিবার স্বত্ব দান করিয়াছে। ইহা ব্রাহ্মণ শ্রেণীকে যেন ঈশ্বরের প্রতিনিধিত্বে বরণ করিয়াছে ও অপর সমুদয় জনগণকে অধম, অপবিত্র জাতি, অপদার্থ মানব ও স্বর্গের অযোগ্য বলিয়া মুদ্রাঙ্কিত করিয়াছে।"

জাতিভেদের নিয়মানুসারে ব্রাহ্মণেরা ইচ্ছামত অন্য জাতির কার্য্য স্বীকার করিতে পারে। পূর্ব্বে ব্রাহ্মণের পক্ষে কেবল ছয় প্রকার কার্য্য নিরূপিত ছিল; যথা, অধ্যয়ন, অধ্যাপন, যজ্ঞ, যাজন, দান ও প্রতিগ্রহ। কিন্তু মনুর সময়েও এমন প্রমাণ পাওয়া যায় যে, ব্রাহ্মণ সৈনিক, কৃষক, পশুপালক ও বণিক হইতে পারিত (মনু, ১০ অঃ ৮০-৮২, ১০১, ১০২। ৯ অঃ ৩১৯)। বর্ত্তমানকালে তাহারা পাচক বা অন্য কোন শ্রমসাধ্য কার্য্য করিয়াও ভ্রষ্টাচারী বা হেয় বলিয়া গণিত হয় না।

ব্রাহ্মণদিগের মধ্যেও নানা শ্রেণী আছে, তাহারা আপনাদিগকে, ও প্রকৃত হিন্দুগণ তাহাদিগকে, ঈশ্বরদত্ত অধিকার বলিয়া সমস্ত সৃষ্টির প্রভু বোধ করিয়া থাকে। ব্রাহ্মণেরা প্রধান ১০ বর্গে বিভক্ত :—

উত্তরাংশের ব্রাহ্মণগণ (তাহাদিগকে গৌড় বলিয়া থাকে) পাঁচ বর্গে বিভক্ত, এই বিভাগ তাহাদের বাসস্থান অনুসারে গণ্য হয়; যথা, কান্যকুব্জ (কনৌজ), সারস্বত (উঃ পশ্চিম), গৌড় (বঙ্গ ও দিল্লী), মৈথিল (উত্তর বেহার), উৎকল (উড়িষ্যা)। দাক্ষিণাত্যেও (দ্রাবিড় খ্যাত) পাঁচ বর্গ আছে; যথা, মহারাষ্ট্রী,

তৈলিঙ্গী, দ্রাবিড়ী, কর্ণাটী, গুর্জ্জর। উত্তরাংশের প্রথম কান্য-কুব্জের মধ্যে আবার বহুসংখ্যক শ্রেণী আছে, তন্মধ্যে ১৫৬ শ্রেণী গণিত হয়, তাহার ১০০ শ্রেণীর নাম বারেন্দ্র শ্রেণী, ও ৫৬ রাঢ়ী শ্রেণী বলিয়া খ্যাত। ইহার প্রথম শ্রেণীর মধ্যে ৮ ও দ্বিতীয়ের ৬ শ্রেণী কুলীন বলিয়া সমাদৃত। রাঢ়ী শ্রেণীস্থ কুলীনদের উপাধি এইরূপ—বন্দ্যোপাধ্যায়, মুখোপাধ্যায়, চট্টোপাধ্যায়, গঙ্গোপাধ্যায়, গোশাল ও কঞ্জলাল।

সমস্ত প্রকার ব্রাহ্মণ জাতি সপ্ত গোত্রের অন্তর্ভূত, তাহা গল্পে উল্লিখিত সপ্ত পণ্ডিত হইতে উৎপন্ন; যথা, ভৃগু, অঙ্গিরা, অত্রি, বিশ্বামিত্র (কৌশিক), কাশ্যপ, বশিষ্ঠ ও অগস্ত্য। এই সকল গোত্র আবার অসংখ্য শাখায় বিভক্ত হইয়াছে। এক গুজরাট প্রদেশেই ৮৪ শাখা রহিয়াছে।

শিক্ষানুসারে আবার ব্রাহ্মণদিগকে শ্রেণীবদ্ধ করা যায়; যথা, ঋগ্‌বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে ঋগ্‌বেদী-শাখী, তদ্রূপ যজুর্ব্বেদী-শাখী, দুই বেদজ্ঞ হইলে দ্বিবেদী, বা দোবে, তিন বেদজ্ঞ হইলে ত্রিবেদী বা তিবেরী, চারিবেদজ্ঞ হইলে চতুর্ব্বেদী বা চৌবে ইত্যাদি।

কার্য্যানুসারেও তাহাদের নামকরণ হইয়া থাকে; যথা, শ্রোত্রীয়, যিনি বৈদিক ক্রিয়াকলাপ সাধন করেন; যাজ্ঞিক, যিনি সংস্কারেব কার্য্য নির্ব্বাহ করেন; বৈদিক, যিনি বেদ পাঠ করেন; শাস্ত্রী, যিনি ব্যবস্থাপুস্তকেব ব্যাখা করেন; পৌরাণিক, যিনি পুরাণ পাঠ করেন; জ্যোতিষী, যিনি জ্যোতির্ব্বিদ্যা জানেন ও পঞ্জিকা স্থির করেন; মহাপাত্র বা মহা ব্রাহ্মণ (আচার্য্য শব্দেও খ্যাত), যিনি মৃত্যু ও শোককালের ক্রিযাকলাপের বিধি দান করেন; গঙ্গাপুত্র, যিনি গঙ্গাতীরে অবস্থান করিয়া যাত্রীগণকে কাশীধামে যাইবার সাহায্যাদি করেন; গয়াওয়াল, গয়া যাত্রী-দিগের উপদেষ্টা; প্রয়াগওয়াল, এলাহাবাদের যাত্রীদিগের উপ-দেষ্টা; ওঝা, ভূতাপসারক। শেষোক্ত পঞ্চ শ্রেণী নিকৃষ্ট ব্রাহ্মণ বলিয়া উচ্চ শ্রেণী ব্রাহ্মণের নিকট অনাদৃত হইয়া থাকে।

এইরূপে ক্ষত্রিয়কুলেরও বহুসংখ্যক শ্রেণী আছে, তৎসমুদয় বর্ণনা করা এই পুস্তকের উদ্দেশ্য নয়।

পূজা ও পার্ব্বণ।

দেবতার উদ্দেশে স্থানে স্থানে মন্দির ও লোকদের ঘরে ঘরে স্থান প্রতিষ্ঠিত আছে, তাহাতে নিত্য নিয়মিত পূজাদি নির্ব্বাহ হয়। তদ্ভিন্ন দেবতাবিশেষের জন্য ভিন্ন ভিন্ন পর্ব্বদিন নিরূপিত আছে, তদ্দিনে উক্ত দেবতার বিশেষ কার্য্যের স্মরণ ও তদুপলক্ষে আমোদাদি করা হয়। এইরূপে কৃষ্ণ, লক্ষ্মী, দুর্গা প্রভৃতির উদ্দেশে নিরূপিত দিনে তাঁহাদের বিশেষরূপ পূজা ও উৎসব হইয়া থাকে। কোন এক ব্যক্তি বা সমস্ত গ্রামস্থ লোকে অথবা চতুষ্পার্শ্বস্থ কয়েক খানি গ্রামের লোকে মিলিয়া এইরূপ আড়ম্বরপূর্ণ পূজা করিয়া থাকে। পূজার সঙ্কল্প হইলে প্রথমে কুম্ভকারকে প্রতিমা নির্ম্মাণের আদেশ দেওয়া হয়; সে টাকার পরিমাণ অনুসারে প্রতিমার আকৃতি ও সৌন্দর্য্য করিয়া থাকে; প্রথমে আবশ্যকীয় বাঁশ, বাখারি সংগ্রহ করিয়া পরিমাণ মত একটী ঠাট প্রস্তুত করে। তাহার উপরে খড় দিয়া প্রতিমার আকৃতি প্রস্তুত করে। অনন্তর গঙ্গা বা অন্য কোন পবিত্র জলাশয়ের মৃত্তিকা দ্বারা তাহা লেপন করত তদুপরি মানবাকৃতি মূর্ত্তি করিয়া থাকে ও তাহা রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া লয়। শুষ্ক হইলে তাহা রঞ্জিত ও বস্ত্র-অলঙ্কারে সজ্জিত করিয়া দেয়। অনন্তর এইরূপে প্রস্তুত মূর্ত্তির পূজার জন্য নিরূপিত গৃহমধ্যে লইয়া যায় ও সেখানে নিয়োজিত পুরোহিত শুভ সময় মত উপস্থিত হইয়া নির্দ্দিষ্ট প্রক্রিয়াবিশেষদ্বারা প্রতিমার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করে, তদ্দ্বারা ব্রাহ্মণ দেবতাকে এই মূর্ত্তিতে ১, ২ বা ৩ দিন বাস করিতে নিমন্ত্রণ করে। এই কার্য্যের পূর্ব্বে প্রতিমা মৃত্তিকামাত্র বিবেচিত হয়, তাহা স্পর্শ করিলেও কোন দোষ হয় না; কিন্তু মন্ত্রপাঠের পর তাহা দেবধর্ম্মপ্রাপ্ত ও অস্পৃশ্য

হইয়া উঠে; হিন্দু ব্যতীত অপর কোন জাতি তাহার নিকট-বর্ত্তী হইতে ও ব্রাহ্মণ ব্যতীত কেহ তাহা স্পর্শ করিতে পারে না। পূজারী ব্রাহ্মণ প্রাতঃকালে ঘণ্টা দুই, ও সন্ধ্যাকালে ঘণ্টা দুই প্রতিমার নিকটে অবস্থিত হইয়া মন্ত্রাদি উচ্চারণ ও ফুল ফলাদি উৎসর্গ করে। দুর্গা পূজায় নিয়মিতরূপে দেবীর উদ্দেশে পুংছাগ বা মহিষ বলিদান পূর্ব্বক তাহার কিঞ্চিৎ রক্ত দেবীর সম্মুখে উৎসর্গ করা হয়; হিন্দু গৃহের পূজার দালানের সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণে এই পশু বলিদানের হাড়িকাষ্ঠ দৃষ্ট হয়।

সন্ধ্যা-পূজা সমাপ্তির পর প্রতিমার সম্মুখে নানাবিধ আমোদ প্রমোদের কার্য্য করিয়া দেবতার পরিতোষ সম্পাদন করিতে হয়, কারণ তখন দেবতা স্বয়ং ঐ প্রতিমাতে অধিষ্ঠিত আছেন, লোকে এমন দৃঢ় বিশ্বাস করে। যাত্রা, বাই, খেমটা প্রভৃতি অশ্লীল নাচ ও গান অবাধে চলিতে থাকে। বাটীর স্ত্রীলোক, পিতা, পুত্র বা অন্য কাহারও পক্ষে এই অশ্লীল কাণ্ড দর্শন ও শ্রবণ করা নিষিদ্ধ নয়। ব্যবসায়ী বেশ্যাগণ এখানে নাচ করিতে আহূত হয়, তাহাদের নির্লজ্জ অশ্লীল পরিধেয় ও অঙ্গভঙ্গী প্রভৃতি বাস্তবিক সভ্যতার রুচিবিরুদ্ধ। ঈদৃশ কুৎসিৎ কাণ্ড সমাগত বহু সংখ্যক ভদ্রাভদ্র নারীগণের সম্মুখে ও পূজনীয় দেবতার সম্মুখে নির্ব্বাহ করিতে ভদ্র হিন্দু কখনও কুণ্ঠিত হয় না। দেবতার মন্দিরে, বা এইরূপ সাময়িক পূজাকালে লোকে উপাসনায় কিছুমাত্র যোগ দেয় না, পূজাকার্য্য নির্ব্বাহ করা কেবল পূজক ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য; ব্রাহ্মণ পূজা করিতে থাকে, তখন নিকটস্থ লোকে আপন আপন আমোদে, কথাবার্ত্তায়, হাস্যরহস্যে ব্যস্ত থাকে, প্রকৃত পূজার সঙ্গে কোন সংস্রব রাখে না।

পূজার শেষ দিনে আর একটী প্রয়োজনীয় কার্য্য করিতে হয়, দেবীর নিকট বিশেষ সম্মানসহকারে বিদায় লওয়া হয়। তাহার কল্পিত প্রস্থানের পূর্ব্বে পূজারী ব্রাহ্মণ দেবীকে ধন্যবাদ করে, তিনি প্রসন্ন হইয়া ভক্তের গৃহে আগমন করিয়াছেন, তিনি যেন ভক্তের প্রতি প্রসন্ন থাকেন, পরবৎসরে তাঁহার

জন্য প্রতিমা নির্ম্মিত হইলে যেন প্রসন্ন হইয়া ভক্তের গৃহে পুনরাগমন করেন, তজ্জন্য এখনই তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করা হয়। এই কার্য্যের পর আর সে প্রতিমা পূর্ব্বের ন্যায় পবিত্র বিবেচিত হয় না, সকলেই তাহা স্পর্শ করিতে পারে। সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে প্রতিমার বিসর্জ্জন হয়, নিকটবর্ত্তী নদীতে বা নদীর অভাবে কোন জলাশয়তীরে লোক জন, ঢোল, সানাই প্রভৃতি সমারোহের সহিত প্রতিমা বিসর্জ্জনস্থলে নীত হয়; স্ত্রীলোকেরা নৃত্য ও পুরুষেরা উচ্চৈঃস্বর করিতে করিতে অগ্রসর হয়। নির্দ্দিষ্ট নদীতীরে উপস্থিত হইয়া একত্রবদ্ধ দুইখানি নৌকার উপরে সংস্থাপন পূর্ব্বক কিছুদূর লইয়া গিয়া বন্ধন কাটিয়া দিয়া তাহা নদীগর্ভে নিক্ষেপ করে। এইরূপে পূজা প্রক্রিয়ার শেষ হয়।

বৎসরের মধ্যে প্রায় প্রত্যেক মাসেই বিশেষ বিশেষ দেবতার পূজাকাল নির্দ্দিষ্ট আছে। হিন্দু আপনার পূজনীয় বলিয়া একটী বিশেষ দেবতা রাখিলেও অন্য অন্য দেবতার পূজাতে অবাধে প্রবৃত্ত হয়, তদ্দ্বারা আশীর্ব্বাদলাভের আকাঙ্ক্ষা করে। অনেক বিষ্ণুপাসক প্রাণিহিংসা মহাপাতক জ্ঞান করিলেও দুর্গাপূজায় পৌরোহিত্য করিয়া তৎকালের জীববলিদানপ্রথার অনুমোদন করিয়া থাকে; তাহারা আপনাদের উপজীবিকার অনুরোধে বিশ্বাসের বিরুদ্ধ কার্য্য করিতে কুণ্ঠিত হয় না।

বৎসরের প্রথম হইতে আরম্ভ করিয়া সংবৎসরে যে সকল দেবপূজা হয়, এক্ষণে তাহাদের প্রধান প্রধান গুলির বিষয় সংক্ষেপে উল্লেখ করিব।

বৈশাখ। ইহা বৎসরের প্রথম ও পবিত্র মাস বলিয়া গণ্য। ইহার প্রথম তারিখে দোকানদারগণ আপনাদের খাতাপত্র পরিবর্ত্তন করে ও সেই দিনে অধিক সংখ্যক দেনা পাওনার সহিত বৎসর আরম্ভ করিতে ভাল বাসে; এক্কারণ তাহারা আপন আপন খাতকগণকে মিষ্টান্ন ভোজন করিতে নিমন্ত্রণ করিয়া তাহাদের নিকট হইতে এই দিনে কিছু টাকা জমা

পাইতে ইচ্ছা করে, এই কার্য্য তাহারা সুলক্ষণ জ্ঞান করিয়া থাকে। প্রত্যেক দোকানদার জ্ঞান-দেবতা গণেশের চিত্র বা মূর্ত্তি দোকানের দ্বারের উপরে রাখিয়া দেয়। বৈশাখ মাসে উত্তাপ অতি প্রবল, এজন্য হিন্দুরা গোরুর পিপাসাশান্তির জন্য বাহিরে জল রাখিয়া দেয়, কোন কোন বৃক্ষে জলের কলস বাঁধিয়া রাখে, পক্ষীগণ তাহা পান করিয়া শীতল হয়। পুণ্য সঞ্চয়ার্থে মাঠের মধ্যে কূপ খুদিয়া জলছত্র করে ও পিপাসিত পথিকগণকে বিনা মূল্যে জলপান ও কিছু মিষ্টান্ন ভোজন করিতে দেয়। শিব ও বিষ্ণুকে শীতল রাখিবার জন্য শিবলিঙ্গ ও শালগ্রাম প্রস্তরের উপর জলপূর্ণ কলস ঝুলাইয়া দেয়। দেবগণকে সুখাদ্য ভোজন করান হয় ও ব্রাহ্মণগণকে বহুমূল্য উপঢৌকনদ্বারা পরিতৃপ্ত করা হয়।

এই মাসে স্ত্রীলোকের প্রিয় ঢেঁকী যন্ত্রের পূজা হইয়া থাকে; ঢেঁকীর কপালে সিন্দূর ও তাহার উপরে পবিত্র তৈল দিয়া অভিষেক করা হয়, পরে ঢেঁকীকে অন্ন ও পবিত্র দুর্ব্বাঘাস উপহার দেয়। কোন কোন স্থানে এই মাসে ধর্ম্মরাজের পূজা হইয়া থাকে।

জ্যৈষ্ঠ। ১। দশহরা, গঙ্গার স্বর্গ হইতে পৃথিবীতে অবতরণ স্মরণার্থে এই উৎসব পালন করা হয়। ইহাতে গঙ্গাস্নান করিলে দশ বিভিন্ন জন্মের পাপ ক্ষয় হয়, এজন্য ইহার নাম দশহরা হইয়াছে। সহস্র সহস্র লোক দূর পথ ভ্রমণ করিয়া পুণ্যস্থান খ্যাত বিশেষ বিশেষ স্থানে সমাগত হয়, এবং ফুল, ফল প্রভৃতি নানাবিধ উপহার হস্তে করিয়া নদীতীরে উপস্থিত হয়, তথায় নির্দ্দিষ্ট ক্রিয়াকলাপের পর স্নানার্থে নদীমধ্যে প্রবেশ করে ও ঠিক নিরূপিত সময়ে ডুব দিয়া আপন আপন পাপ ধৌত করে। যাহারা গঙ্গা হইতে বহুদূরে বাস করে, তাহারা গঙ্গার নাম করিয়া নিকটস্থ কোন নদীতে স্নান করিয়াও গঙ্গাস্নানের ফল প্রাপ্ত হয়, নদী না থাকিলে গ্রামের পুষ্করিণীতেও স্নানের ফলদায়ক কার্য্য নির্ব্বাহ হয়।

দশহরা।

২। স্নানযাত্রা। জগন্নাথের পূজা উপলক্ষে এই পর্ব্বপালন করে। পুরীতে এই পার্ব্বণে বিশেষ ধুমধাম হয়; কিন্তু এই পূজা পুরী ভিন্ন অন্য অন্য স্থানেও হয়। শ্রীরামপুরের নিকটবর্ত্তী মাহেশেও খুব জাঁকের সহিত স্নানযাত্রা পালিত হয়; তথায় জগন্নাথের উদ্দেশে মন্দির ও প্রায় পুরীর রথের সমান অতি বৃহৎ রথ নির্ম্মিত আছে, তাহা আষাঢ় মাসের রথযাত্রায় ব্যবহৃত হয়। পুরীতে যত যাত্রী উপস্থিত হয়, মাহেশেও প্রায় তৎসংখ্যক যাত্রী দেখা যায়। তদ্ভিন্ন অন্য অন্য স্থানে জগন্নাথের রথ নির্ম্মিত আছে ও নির্দ্দিষ্ট দিনে তাহার পূজা হইয়া থাকে। মাহেশে যখন দেবতাকে স্নান করাইবার জন্য বাহির করা হয়, তখন হিন্দু অহিন্দু সকলের সাক্ষাতে একটী উচ্চ মঞ্চোপরি দেবতাকে অবস্থান করাইয়া স্নান ও পবিত্র তৈলং মর্দ্দন করান হয়, তখন যাজকেরা তাহাকে বস্ত্র পরিধান করায়, চতুর্দ্দিকে প্রায় ৬০ বা ৮০ হাজার লোকে দাঁড়াইয়া তাহা দেখিতে থাকে। জগন্নাথের দর্শনই পাপ ক্ষয় করে, ইহা লোকের বিশ্বাস, এজন্য তাহাকে দর্শনার্থে লোকের এত আগ্রহ দেখা যায়। তৎপরে দেবতাকে বস্ত্র পরিহিত করিয়া উত্তোলন করে, তৎসময়ে এই মহা জনতা একস্বরে 'জয় জগন্নাথ, জয় জগন্নাথ' বলিয়া উচ্চরবে চীৎকার ধ্বনি করিয়া উঠে। দেশের অসচ্চরিত্রা স্ত্রীলোকেরা সমাজ পাইবার জন্য বৈষ্ণবধর্ম্ম অবলম্বন করে, তাহারা এই পর্ব্বে যোগ দিতে অধিকার পায়, এই কারণ ইহাতে বহুসংখ্যক দুশ্চরিত্রা অথচ বৈষ্ণবী নামে খ্যাত স্ত্রীলোকদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়। দুর্গা পূজা অপেক্ষাও ইহাতে লোকের সমাগম বেশী হয়। জগন্নাথের পূজা সকলেই ভালবাসে, ইহাতে কোনরূপ পশু বলিদানাদি হয় না, একারণ বিষ্ণুর উপাসকগণ ইহাতে অধিকতর প্রীতিলাভ করে। পুরীতে লোকে জাতিভেদ প্রথার শৃঙ্খল তৎসময়ের জন্য ছিন্ন করিতে অধিকার পায়।

৩। ষষ্ঠীপূজা। এই দেবী স্ত্রীলোকদের মনের উপর বিশেষ কর্ত্তৃত্ব করিয়া থাকেন, তিনি শিশুগণের রক্ষক। বৎসরের

ষষ্ঠীপূজা।

মধ্যে ছয় বার তাঁহার সাধারণ পূজা ও বিশেষ বিশেষ কালে বিশেষ ভাবে পূজা হয়, তথাপিএই মাসে তাঁহার পূজার নির্দ্দিষ্ট দিন। শিশুর জন্ম হইলে তাঁহার নিকট বর প্রার্থনা করা হয়; শিশুগণ যাবৎ বয়ঃপ্রাপ্ত না হয়, তাবৎকাল তাহারা ষষ্ঠীর রক্ষাধীন থাকে। শিশুগণ পীড়িত হইলে আরোগ্যের জন্য ষষ্ঠীকে আহ্বান করা হয়। পূজার জন্য ষষ্ঠীর কোন প্রতিমা নির্ম্মাণ করা হয় না; কিন্তু গ্রামস্থ কোন বটবৃক্ষ ষষ্ঠীর স্বরূপ বিবেচনা করিয়া লোকে তথায় তাঁহার পূজা করে। স্ত্রীলোকেরা পূজার দিনে ঢোল, ঢাক প্রভৃতি বাদ্য সহকারে ষষ্ঠী তলায় মহানন্দের সহিত নৈবেদ্যাদি লইয়া যায়; ষষ্ঠী সন্তান প্রদান করিয়া যাহাদের ক্রোড় শীতল করিয়াছেন, তাহাদের আর তদ্দিনে আনন্দের পরিসীমা থাকে না, যাহারা পুত্রবতী হয় নাই, তাহারা কেবল পুত্র কামনা ও প্রার্থনা করিয়া ষষ্ঠীর নিকটবর্ত্তী হয়। পুরোহিত ব্রাহ্মণ মন্ত্র উচ্চারণ করিলে পর পুত্রবতী জননীগণ অপুত্রকদিগকে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ উপহার প্রদান করে, পরে সকলে আনন্দ পূর্ব্বক গৃহপ্রতিগমন করে।

এই সময়ে জামাতাগণকে গৃহে আনিবার প্রথা আছে, ইহাতে গৃহমধ্যে আরও বেশী পরিমাণে আনন্দের স্রোত বহিতে থাকে, তাহাদিগকে উত্তম পরিতোষ পূর্ব্বক ভোজনপান করাইয়া নানাবিধ উপহারের সহিত প্রতিপ্রেরণ করা হয়। জামাতাকে গৃহে আনায়ন করা হিন্দু স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে অতিশয় আনন্দের কার্য্য বলিয়া গণিত; কেহ এই সময়ে আপন জামাইকে ঘরে আনিতে না পারিলে আপনাকে অতিশয় দুর্ভাগ্যবতী জ্ঞান করিয়া থাকে। জামাতা শ্বশুর বাড়ী আসিলে প্রথমে তাহাকে স্ত্রীমহলে যাইতে হয়, তথায় শ্বশ্রূর সম্মুখীন হইয়া মেজ্যার উপরে ৫৲, ১০৲ বা নূতন-বিবাহিত হইলে আরও অধিক সংখ্যক মুদ্রা রাখিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিতে হয়। তৎসময়লভ্য নানাবিধ সুখাদ্য ফল, মিষ্টান্ন ও বহুপ্রকার ব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত করিয়া জামাতার মনস্তুষ্টি করা হয়। অন্তঃ-

পুরস্থ যুবতী সুন্দরীগণ জামাতাকে বেষ্টন করিয়া সর্ব্বপ্রকার আমোদ ও রহস্যে ব্যাপৃত থাকে। নববিবাহিত জামাতা হইলে তাহাকে এই সমাজে সলজ্জভাবে অধোবদনে থাকিতে হয়; কিন্তু রমণীগণ তাহার সম্মুখে আপনাদের নানারূপ কৌশল ও বুদ্ধির পরিচয় দিতে আনন্দ বোধ করে।

আষাঢ়। এই মাসে রথযাত্রা হইয়া থাকে; জ্যৈষ্ঠ মাসের স্নানযাত্রার ১৫ দিবস পরে এই পার্ব্বণ হয়। এই পঞ্চদশ দিবস জগন্নাথ গুপ্তভাবে অবস্থান করেন। স্নান করিয়া জগন্নাথের জ্বর হয় বলিয়া, তাঁহার চিকিৎসাদি করা হয়; কিন্তু পুরীতে বাস্তবিক এই সময়ে জগন্নাথকে পরিষ্কার করা হয়। সংবৎসর জগন্নাথের গাত্রে নানা উপহারাদি দেওয়া যায়, তাহাতে তাঁহার শরীর ময়লা হয়, একারণ রথে উঠিবার পূর্ব্বে তাঁহাকে পরিষ্কার করিয়া রং মাখাইয়া লোকের দেখিবার যোগ্য করা হয়। (পূর্ব্বে ইহার বিশেষ বর্ণনা হইয়াছে)।

রথযাত্রা।

প্রথম রথের ১৫ দিবস পরে উল্‌টা রথের পার্ব্বণ পালিত হয়। পূর্ব্বে প্রায় দুই মাইল দূরে রথ টানিয়া অন্য মন্দিরের নিকটে নীত হইয়াছিল, প্রায় ১৫ দিবস তথায় অবস্থানের পর জগন্নাথকে এই দিনে তাঁহার নিজের মন্দিরে আনা হয়। এই কার্য্য পূর্ব্বের ন্যায় আগ্রহ ও উদ্যোগের সহিত নির্ব্বাহিত হইতে দেখা যায় না; কখন কখন মিষ্টান্নদ্বারা লোকদিগকে রথ টানিতে প্রবৃত্ত করিতে হয়। জগন্নাথ বিষ্ণুর প্রতিমূর্ত্তি; একারণ বৈষ্ণবেরা রথযাত্রায় অধিক অনুরাগ প্রকাশ করে।

শ্রাবণ। ১। কৃষ্ণের ঝুলনযাত্রা। কৃষ্ণের মন্দিরে ও যে যে গৃহে কৃষ্ণের মূর্ত্তি স্থাপিত আছে, তথায় এই পর্ব্বের সময় সন্নিকটস্থ গৃহে একটী দোল্‌না রাখা হয়, তদুপরি কৃষ্ণের মূর্ত্তি স্থাপন করিয়া তাহা ঝুলন হয়; পরে মূর্ত্তি লইয়া তাহার নির্দ্দিষ্ট স্থানে পুনরায় রাখিয়া নিমন্ত্রিত সকলে মিলিয়া ভোজনপান ও আমোদপ্রমোদ করে, এবং যাত্রা, নাচ প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার আনন্দসূচক

ঝুলনযাত্রা।

ব্যাপারে সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত হয়; কিন্তু এই কার্য্যে পূজার কোনরূপ সংস্রব নাই, প্রকৃত পূজা মূর্ত্তির ঝুলনের সঙ্গে সঙ্গে শেষ হইয়া যায়।

মনসাপূজা।

২। মনসা-পূজা বা নাগপঞ্চমী। এই মাসের শুক্লপক্ষের পঞ্চমীতে সর্পদেবী মনসার পূজা করা হয়। লোকে এক কলস জল স্থাপন করিয়া মনসার নামে তাহার পূজা করে। ভারতবর্ষে বৎসর বৎসর সহস্র সহস্র লোক সর্পদষ্ট হইয়া প্রাণ হারায়, লোকে তাহার দংশন হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য এরূপ একটী রক্ষক দেবী কল্পনা করিবে, ইহা বড় আশ্চর্য্য নয়। মনসাপূজার পূর্ব্বদিন স্ত্রীলোকেরা ক্ষীর প্রস্তুত করিয়া গ্রামের কোন বৃক্ষবিশেষের নীচে উপস্থিত হইয়া দেবতার উদ্দেশে উৎসর্গ করে, পরে তাহা আপনারা ভক্ষণ করে ও আপন আপন সন্তানদিগকে ভোজন করায়, ইহাতে তাহারা বিশ্বাস করিয়া থাকে যে, দেবী মনসা প্রসন্ন হইয়াছেন, আর আমাদের সন্তানদিগকে সর্পে দংশন করিবে না। এই সময়ে স্থানে স্থানে সাপুড়িয়াগণ সমবেত হইয়া পুরস্কারের লোভে আপনাদের ক্ষমতা দেখাইয়া থাকে; ফলতঃ তাহারা বিষধর সর্পদ্বারা আপনাদিগকে দংশিত হইতে দেয়, তদ্দ্বারা লোকের মনে মন্ত্রের আশ্চর্য্য কার্য্যকারিতার জ্ঞান জন্মে, কেহ সর্পদষ্ট হইলে এইরূপ ওঝাগণ শীঘ্র আহূত হয়, এবং অবস্থাবিশেষে আপনাদের কৃতকার্য্যতা দেখাইয়া অর্থাদি লাভ করিতে সক্ষম হয়।

নন্দোৎসব।

ভাদ্র। ১। নন্দোৎসব নামক কৃষ্ণের জন্মোৎসব পর্ব্ব ভাদ্র মাসের কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথিতে পালিত হয়। কৃষ্ণের পালক পিতা নন্দের আনন্দজনক পর্ব্ব বলিয়া ইহা বিখ্যাত, ইহাকে জন্মাষ্টমীও বলে। যে যে স্থানে বৈষ্ণবের বাস, তথায় এই পর্ব্ব সমারোহের সহিত পালিত হয়। পুরী ব্যতীত অপর২ স্থানে এই পর্ব্বপালনের একটী বিশেষ প্রক্রিয়া দেখা যায়। লোকে মূর্ত্তির সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণে একটী প্রশস্ত গর্ত্ত খুঁদিয়া তাহা জল, দধি

ও হরিদ্রাতে পূর্ণ করিয়া তদ্দ্বারা কর্দ্দম প্রস্তুত করে, পরে প্রমত্ত উপাসকেরা তাহাতে নামিয়া সর্ব্বাঙ্গ কর্দ্দমাক্ত করিয়া দল বাঁধিয়া দূরবর্ত্তী অন্য জলাশয় পর্য্যন্ত যায়, পরে স্নান করিয়া ফিরিয়া আইসে, অনন্তর অপরাহ্ণে সঙ্কীর্ত্তন করিয়া বেড়ায়। এই সময়ে বৈষ্ণব গুরুগণ আপন আপন শিষ্যদের নিকট হইতে বিলক্ষণ দক্ষিণালাভ করিয়া থাকে।

গণেশচতুর্থী।

২। ভাদ্র মাসের শুক্লপক্ষের চতুর্থীতে গণেশচতুর্থী পর্ব্ব গণেশের জন্ম স্মরণার্থে পালিত হয়। লোকে মৃত্তিকানির্ম্মিত গণেশমূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া দুই হইতে দশ দিন পর্য্যন্ত তাহার পূজা করিতে থাকে, পরে কোন জলাশয়ে তাহা নিক্ষেপ করে।

দুর্গোৎসব।

আশ্বিন। ১। দুর্গোৎসব। শুক্লপক্ষের প্রথম হইতে আরম্ভ হইয়া দশমী তিথি পর্য্যন্ত বঙ্গদেশীয় হিন্দুদের প্রসিদ্ধ দুর্গাপূজা হইয়া থাকে। শিবপত্নী দুর্গা মহিষাসুর নামক দৈত্য বিনাশ করেন, তাহার স্মরণার্থে এই পূজার কাণ্ড হয়। প্রায় সমস্ত বাঙ্গালী ইহাতে মাতিয়া থাকে; মনের বিশ্বাস বা অবিশ্বাসের দিকে তত মনোযোগ না করিয়া দুর্গাপূজার আমোদে সকলের মন প্রফুল্ল হয়; অতএব ইহাকে জাতীয় আনন্দের পার্ব্বণ বলা যাইতে পারে।

কেহ বাড়ীতে দুর্গোৎসব করিবার সঙ্কল্প করিলে রথযাত্রার দিনে একটী বংশ খণ্ড আনিয়া গৃহস্থিত পূজার ঘরে রাখিয়া দেয়; পরে পুরোহিত আসিয়া তাহাতে চন্দন মাখায় ও বিষ্ণুর নিকটে প্রার্থনা পূর্ব্বক তাহার উপর দুর্গার আশীর্ব্বাদ কামনা করে। এই বংশখণ্ড জন্মাষ্টমীর দিন পর্য্যন্ত ঐ পূজার ঘরে রাখে, পরে প্রতিমানির্ম্মাতা আসিয়া তাহা স্থানান্তর করে, তখন হইতে প্রতিমানির্ম্মাণ আরম্ভ করা হয়। তাহার উদ্দেশে বাঁশ, খড়, ও গঙ্গামৃত্তিকা যত্নপূর্ব্বক আনয়ন করে, তৎপরে বিশেষ শুভদিন, শুভক্ষণ দেখিয়া যে কাষ্ঠখণ্ডের উপর প্রতিমা নির্ম্মিত হইবে, তাহাতে ছেদ করে ও তদুপরি খড়দ্বারা প্রতিমার

কঙ্কাল নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করে; অনন্তর তাহা মৃত্তিকা, গোময় ও ধান্যের তুষ দিয়া লেপন করে। দুর্গার সঙ্গে দুই পার্শ্বে তাঁহার পুত্রদ্বয় গণেশ ও কার্ত্তিক এবং ব্রহ্মাপত্নী সরস্বতী ও বিষ্ণুপত্নী লক্ষ্মীর মূর্ত্তিও নির্ম্মিত হইযা থাকে। তদ্ভিন্ন যাহার নিধনার্থে দুর্গা অবতীর্ণা হইয়াছিলেন, সেই মহিষাসুরের মূর্ত্তিও তৎসঙ্গে গঠিত হয়। এই সকল মূর্ত্তি রৌদ্রে শুষ্ক হইলে রঞ্জিত করা হয় ও তাহাদের সৌন্দর্য্য-বৃদ্ধির জন্য নানা অলঙ্কারে সুসজ্জিত করা হয়। মধ্যস্থানে দশভূজা দুর্গা, তাঁহার প্রত্যেক হস্তে বিশেষ বিশেষ অস্ত্র থাকে; দেব ও মানবের শত্রু মহিষা-সুরের নিধনার্থে দেবী এই কোমলতাব্যঞ্জক অথচ ভীমা মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলেন।

পুরাণাদি শাস্ত্রে দুর্গাপূজা করণের অতিশয় মঙ্গলজনক ফল বর্ণিত আছে, এমন কি, এক মুহূর্ত্তের জন্যও যাহারা দুর্গার প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করে, তাহারা এত অধিক আশীর্ব্বাদের ভাগী হয় যে, স্বয়ং মহাদেবও তাহা পঞ্চমুখে শত বৎসর ধরিয়া বর্ণনা করিতে অপারক। কেহ নিজ গৃহে দুর্গাপূজা করিতে অসমর্থ হইলে নিকটবর্ত্তী যে গৃহে দুর্গোৎসব হইতেছে, তথায় আপনার নৈবেদ্যাদি পাঠাইতে পারে, এরূপ আদেশ রহিয়াছে; এমন কি, নিম্ন জাতীয় দাসদাসীগণ ও সমাজবহির্ভূত ব্যক্তিরাও এই সময়ে নৈবেদ্য দিলে তাহা দেবীর কাছে সুগ্রাহ্য হয়। কিন্তু লোকের অবস্থানুসারে আপন আপন গৃহে দুর্গাপূজা না করিলেও ক্ষতি হয় না, পূজা করা না করা তাহাদের ইচ্ছা-সাপেক্ষ।

পূজার প্রথম অঙ্গকে 'বোধন' বলে; দেবী দুই মাসকাল নিদ্রা সেবন করিতেছিলেন, তাঁহাকে সজাগ করিয়া তুলান, ইহার উদ্দেশ্য; এই পূজার এক অংশে বিল্বপত্রের পূজা করা হয়, কারণ বিল্বপত্র দেবীর অতি প্রিয়বস্তু। দেবীর প্রকৃত পূজা আরম্ভের পূর্ব্বেই নির্দ্দিষ্ট প্রক্রিয়ামতে ভক্ত পূজক স্নানাদি সমাপনান্তে দেবীসমীপে আপনার নাম ও দেবীর পূজাকার্য্য সমাধা করিবার ইচ্ছা স্বমুখে ব্যক্ত করিয়া থাকে, পরে তৎকার্য্য

সাধনোদ্দেশ্যে যাজক ব্রাহ্মণগণকে নিযুক্ত করিয়া পূজার ভারার্পণ করে, তাহারা পূজাকর্ত্তার নামে তাহাব হইয়া ক্রিয়াকলাপ নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। অনন্তর পুরোহিত পূর্ব্বোপাসনাকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে আবম্ভ করে; তৎসময়ে দুর্গা ও অন্যান্য দেবীগণকে একে একে বন্দনা ও পূজোপকরণ সমস্ত দ্রব্যাদির প্রতিষ্ঠা কার্য্য করা হয়। তৎপরে পুরোহিত সম্মুখস্থ দুর্গামূর্ত্তির উদ্দেশে বিশেষ ধ্যানে নিমগ্ন হয়; তৎসময়ে পুরোহিত বিশেষরূপে দুর্গাকে উপস্থিত ভক্তের গৃহে ও প্রতিষ্ঠিত মূর্ত্তিতে অধিষ্ঠিত হইবার জন্য স্তব ও অনুরোধ করিয়া থাকে। এই কার্য্যের জন্য আনুষঙ্গিক ক্রিয়াদি সমাপনের পর পুরোহিত দেবীর বক্ষোপরি নিজ দক্ষিণ হস্ত রাখিয়া এইরূপ মন্ত্রপাঠ করে:—"ওম্, দেবি, তোমার অষ্ট শক্তিসহ আমার গৃহে শুভাগমন কর, হে বরদে, পদ্মলোচনা, আমার শাস্ত্র-সম্মত পূজা গ্রহণ কর, আমি এই শারদীয় পূজায় ব্রতী হইয়াছি, মহাদেবি, আমায় সম্মতি দান কর, ... তুমি এই অপার ভবসাগরে কলুষনাশিনী, ত্রাহিমাং ধন্য দেবি, প্রিয়তমে, তোমার চরণে প্রণত হই। হে শঙ্করি, আমার জীবন, সম্ভ্রম, সন্তান, আমার পত্নী ও ধন রক্ষা কর। হে দেবি, তুমিই সকলের রক্ষাকর্ত্রী, জগন্মোহিনি, যাবৎ আমি তোমার পূজায় রত থাকি, তাবৎ এই যজ্ঞে আসিয়া অবস্থান কর।" অনন্তর পুরোহিত মূর্ত্তির দক্ষিণ চক্ষু, পরে বাম ও তৎপরে ললাটোপরিস্থ চক্ষু স্পর্শ করে; অবশেষে মন্ত্রবিশেষ পাঠ করিতে করিতে শরীরের অন্য অন্য অঙ্গ স্পর্শ করিতে থাকে, এইরূপে মূর্ত্তির প্রাণপ্রতিষ্ঠা কার্য্য নির্ব্বাহ হয়। তৎপরে যে সকল দ্রব্যাদি পূজা কার্য্যে ব্যবহৃত হইবে, মন্ত্রদ্বারা তাহা পবিত্র করা হয়।

তিন প্রাতঃ ও তিন সন্ধ্যা দেবীকে পূজা করিতে হয়; তৎসময়ে দেবীর উদ্দেশে এক, তিন অথবা সাতটি পুংছাগ বৎস, কোথায় বা মহিষবলিদান হইয়া থাকে; বলিদানকার্য্য অষ্টমীতে সাধিত হয়। বলিদানের পূর্ব্বে বলিদেয় পশুকে মন্ত্রপাঠ ও ক্রিয়াবিশেষদ্বারা পবিত্র করা হয়, তাহার মস্তকে সিন্দুর

ও গঙ্গাজল দেয়, অনন্তর হাড়িকাষ্ঠের মধ্যে তাহার মস্তক স্থাপন করিয়া এক আঘাতে তাহা ছিন্ন করিতে হয়। তাহার কিয়ৎ পরিমাণ রক্ত ও মাংস দেবীর সম্মুখে উৎসর্গ করা হয়। চতুর্থ দিনেব অপরাহ্নে দেবীর বিদায়গ্রহণের দিন, স্তবস্তুতির সহিত তাঁহাকে বিদায় করা হয়, ও যেন তিনি প্রসন্ন হইয়া আগামী বৎসরেও পুনঃপদার্পণ করেন, তাঁহাকে এই সময়েই তাহার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়া রাখে। অনন্তর মঞ্চোপরি হইতে প্রতিমা অবরোহণ কবায়, তখন বাটীস্থ স্ত্রীলোকেরা দেবীর চতুর্দ্দিক প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক তাঁহার গাত্রে চাউল জল ও পর্ণ নিক্ষেপ পূর্ব্বক তাঁহাকে বরণ কবে। পরে লোকে তাহা স্কন্ধে করিয়া নানাবিধ বাদ্য কবিতে কবিতে নদীতীরে লইযা যায় ও নদীতে প্রতিমা বিসর্জ্জন করিয়া বড় পূজাব শেষ করে।

২। আশ্বিনের অপব উৎসব লক্ষ্মীপূজা: দুর্গাপূজার পরবর্ত্তী পূর্ণিমার দিনে এই পূজা হইয়া থাকে। বিষ্ণুপত্নী লক্ষ্মী সৌভাগ্যের দেবী; অধিকাংশ গৃহে লক্ষ্মীব কোন মূর্ত্তি নির্ম্মিত হয় না; লোকে শস্যাদি পবিমাণের কাঠা,ধামা প্রভৃতিকে তাঁহার প্রতিরূপ মানিয়া পূজা কবে। তৎকালে তাহা শস্যাদিতে পূর্ণ ও পুষ্পাদিদ্বাবা ভূষিত কবিয়া বস্ত্রাবৃত রাখে; কিন্তু কোন কোন লোকে তাঁহার প্রতিমাও নির্ম্মাণ করিয়া পুরোহিতের সাহায্যে পূজা কবিয়া থাকে। যাহারা জাগবণাবস্থায় রাত্রিযাপন কবে, লক্ষ্মী তাহাদিগের সকলকে ববদান কবিযা থাকেন, এই বিশ্বাস বশতঃ সকলে তাস প্রভৃতি ক্রীড়াতে অথবা অন্য আমোদ-প্রমোদে বাত্রি কাটাইয়া থাকে।

লক্ষ্মীপূজা।

৩। রামলীলা। যৎকালে বঙ্গদেশীয় হিন্দুবা দুর্গোৎসব কবে, তৎকালে অন্যান্য প্রদেশের হিন্দুরা রামলীলা পার্ব্বণ পালন করে। নবমী তিথিতে রাবণবধের পর সীতা যেরূপে রামের নিকটে নীতা হইয়াছিলেন, তাহারই অনুকরণে লোকে এই পর্ব্বাভিনয় করিয়া থাকে।

রামলীলা।

কার্ত্তিক। ১। এই মাসের অমাবস্যার রাত্রিতে শ্যামারূপে দুর্গার পূজা হইয়া থাকে। দৈত্যপ্রধান রক্তবীজের সংহার-দ্বারা শ্যামা বিজয়িনী হইয়া প্রমত্ত অবস্থায় অতি ভয়ানক সংহারিণী মূর্ত্তি

শ্যামাপূজা।

ধারণ করত এমন নৃত্য করিতেছিলেন যে, তাহাতে সমস্ত বিশ্ব-মধ্যে প্রলয়কাণ্ড উপস্থিত হইয়াছিল, দেবগণ ভীত হইয়া বিশ্ব রক্ষার্থে শিবার্চ্চনায় প্রবৃত্ত হইলেন, শিব উপায়ান্তর না দেখিয়া স্বয়ং নিহতদের মধ্যে লম্বমান হইয়া পড়িলেন। শ্যামা নাচিতে নাচিতে স্বামীর বক্ষঃ ও উরুদেশে পদস্থাপন পূর্ব্বক দণ্ডায়মান হইয়া নীচে দৃষ্টি করত স্বামীকে দেখিয়া লজ্জায় অপ্রতিভ হইয়া স্বীয় দীর্ঘ জিহ্বা বাহির করিয়া স্থিরভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন। ঈদৃশ মূর্ত্তি গঠন পূর্ব্বক শ্যামার পূজা করা হয়। তাঁহার পূজা-কালে বহুসংখ্যক পশু বলিদান হয়। ঘোর অমানিশার নিশীথ সময়ে পূজকেরা একত্র হইয়া খাঁড়, মশাল প্রভৃতি হস্তে ধারণ করত 'জয় তারা, জয় তারা' ধ্বনিতে আকাশমণ্ডল নিনাদিত করিতে থাকে, তন্মধ্যে বলিদেয় পশুদের চীৎকার, কাতরস্বর ও পূজকদের প্রমত্ত ব্যবহার ইত্যাদি কাণ্ডের দৃশ্য বাস্তবিকই অতি ভয়ানক আকার ধারণ করে।

২। শ্যামাপূজার পরবর্ত্তী শুক্লপক্ষের দ্বিতীয়া তিথিতে 'ভ্রাতৃ দ্বিতীয়া' নামক পর্ব্ব পালিত হয়। ভগিনী এই পর্ব্বে আপনার ভ্রাতার মঙ্গলকামনা করিয়া তাহার কপালে ফোটা দেয় ও তদ্দ্বারা

ভ্রাতৃদ্বিতীয়া।

যমের দ্বারে কাঁটা পড়ে, এইরূপ ভাবিয়া থাকে। ভ্রাতাকে ভগিনী এই দিনে মিষ্টান্নাদি উত্তমরূপে ভোজন করাইয়া থাকে, ও পরজগতে যেন দণ্ড হইতে মুক্তি পায়, এরূপও প্রার্থনা করে। কার্ত্তিক মাস বঙ্গদেশে অতিশয় অস্বাস্থ্যকর সময়, জ্বরের ও অন্যান্য পীড়ার অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হয়, অনেকে মৃত্যুমুখে পতিত হয়; লোকে বলে, এই সময়ে যমের চারি দ্বার উদ্‌ঘাটিত থাকে, অতএব মৃত্যুভয়ে লোকে যমের উপাসনায় প্রবৃত্ত হয়।

৩। জগদ্ধাত্রীপূজা জগদ্ধাত্রী বা জগন্মাতা দুর্গার অন্য

এক রূপ। আকার প্রকারে ইহা প্রায় দুর্গাপূজারই তুল্য; কিন্তু ইহাতে তত আড়ম্বর ও বাহুল্য ক্রিয়াকলাপ করা যায় না; কেবলমাত্র একদিন ইহাঁর পূজা হইয়া থাকে, পরদিন দেবীর বিসর্জ্জন সমাধা হয়।

জগদ্ধাত্রীপূজা।

৪। কার্ত্তিকপূজা। ইনি যুদ্ধদেব, শিব ও পার্ব্বতীর পুত্র, কেবল এক সন্ধ্যা ইহাঁর পূজার জন্য নির্দ্দিষ্ট আছে। ইনি অবিবাহিত দেবতা, কিন্তু উপপত্নী রাখিতেন। ইহাঁর পূজাতে যাবতীয় দুর্নীতিপরায়ণ কুলটা নারীগণ প্রশ্রয় পায়, কার্ত্তিকের পূজা তাহাদের পক্ষে বিশেষ উৎসবের দিন। কৃষ্ণের পূজায় যেরূপ লম্পটদিগের বিশেষ প্রশ্রয় দেওয়া হয়, কার্ত্তিকের পূজায় প্রায় সেইরূপ কুলটা বারাঙ্গনাগণের আমোদ ও কুপ্রবৃত্তি সাধনের সুযোগ হইয়া থাকে।

কার্ত্তিকপূজা।

৫। রাসযাত্রা। কৃষ্ণ বৃন্দাবনে গোপিনীগণের সহিত যে লীলা করিয়াছিলেন, তাহার স্মরণার্থে এই পর্ব্ব পালিত হয়। উপর্য্যুপরি তিন রাত্রি এই আমোদ চলিতে থাকে। কৃষ্ণের মন্দিরের সন্নিধানে একটী উচ্চমঞ্চ নির্ম্মিত হয়, উজ্জ্বল শুক্লপক্ষের রাত্রিতে কৃষ্ণের মূর্ত্তি তদুপরি স্থাপন করিয়া লোকে তাহার পূজা করে; পরে তাহার সম্মুখে সর্ব্বপ্রকার প্রেমসঙ্গীত, যাত্রা, নাচ প্রভৃতি সমস্ত রাত্রি চলিতে থাকে। এই পূজার সময়ে নানা দূরস্থান হইতে বহুলোক পূজার স্থানে সমাগত হয়; তৎসময়ে তাহাদের মধ্যে কৃষ্ণকে আদর্শ করিয়া সর্ব্বপ্রকার কার্য্যই সাধিত হয়।

রাসযাত্রা।

অগ্রহায়ণ। বঙ্গদেশে এই সময় ধান্যসংগ্রহের কাল; এই মাসে নবান্ন পর্ব্ব পালিত হয়। প্রথমে দেবতাদিগের উদ্দেশে অন্ন, দুগ্ধ ও ফলাদি উৎসর্গ করিয়া পরে কতক অংশ পূর্ব্বপুরুষদের উদ্দেশে দেওয়া হয়, অনন্তর গৃহপালিত পশু ও

কাক, শৃগাল প্রভৃতির উদ্দেশে কিছু কিছু দিয়া আপনারা উৎসৃষ্ট দ্রব্যের কিঞ্চিৎ গ্রহণ করে। পরে ব্রাহ্মণদিগকে উত্তমরূপে ভোজন করাইয়া ও উপহারাদি দিয়া উৎসবের শেষ করা হয়।

পৌষ। পল্লীগ্রামে এই মাসে একটী সামাজিক উৎসব-পালন হইয়া থাকে। লোকে গ্রামের মধ্যে ঘরে ঘরে গিয়া পয়সা, চাউল প্রভৃতি সংগ্রহ করে, পরে গ্রামের বহিঃস্থ মাঠে গিয়া ব্রাহ্মণ পাচকদ্বারা খাদ্য পাক করিয়া এই উৎসব-সংসৃষ্ট সকলে মিলিয়া ভোজনাদি করে, পরে মাঠে আমোদ ও ক্রীড়াদি করিয়া সন্ধ্যার পর গৃহে প্রতিগমন করে; এই উৎসবকে পৌষালি কহে।

পৌষালি।

তদ্ভিন্ন এই মাসে পিষ্টক-ভোজনের উৎসব হয়; তিন দিন পর্য্যন্ত এই উৎসব চলিতে থাকে; তন্মধ্যে লক্ষ্মী, মনসা ও গৃহবিশেষে ষষ্ঠীর পূজাও হইয়া থাকে। এই সময়ে লোকে পায়স, পিষ্টক প্রভৃতি খাদ্য আনন্দের সহিত ভোজন করে। অধিকন্তু, লোকে গৃহসামগ্রীর উপরে ধান্যের নাড়া বাঁধিয়া থাকে, তাহার উদ্দেশ্য এই যে, সে সকল সামগ্রী আর স্থানান্তরিত বা হস্তান্তরিত হইবে না।

মাঘ। এই মাসে বিদ্যাদেবী ব্রহ্মাপত্নী সরস্বতীর পূজা নিরূপিত আছে। শৈব ও বৈষ্ণব সকলেই এ পূজা করিয়া থাকে; একটু সামান্য লেখা পড়ার জ্ঞান যাহার আছে, সে এই পূজা করিতে বাধ্য হয়। কেবলমাত্র সরস্বতীর পূজা নয়, কিন্তু দোয়াত, কলম, কালী, কাগজ, পুস্তক প্রভৃতি লেখা পড়ার উপকরণেরও পূজা করা হয়। দেবী স্বয়ং স্ত্রীমূর্ত্তি হইলেও তাঁহার পূজাতে স্ত্রীজাতির কোন সংস্রব নাই।

সরস্বতীপূজা।

মাঘ মাসে প্রয়াগে বিখ্যাত মেলা হয়, তৎসময়ে তথায় গঙ্গা ও যমুনার সঙ্গমস্থানে স্নান করিতে লক্ষাধিক লোক সমাগত হয়।

ফাল্গুন। এই মাসে কৃষ্ণের দোলযাত্রা অথবা হোলি পর্ব্ব পালিত হয়। ফাল্গুনী পূর্ণিমার পূর্ব্বে দশম দিনে এই পর্ব্বের আরম্ভ হয়; কিন্তু অধিকাংশ স্থলে শুক্ল-পক্ষের শেষ তিন চারি দিন ইহা পালিত হয়। এই সময়ে লোকে বহু পরিমাণে আবির ছড়া-ছড়ি করে, পথে যাইবার সময় সম্মুখে যাহাকে পায়, তাহার গাত্রে তাহা দিয়া থাকে ও প্রকাশ্যে নির্লজ্জভাবে অশ্লীল গীত গান করিয়া কৃষ্ণের মাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়া থাকে। রাস্তার মধ্যে স্ত্রীলোক বাহির হইলে কোন না কোন প্রকারে এই দল-স্থেরা তাহার প্রতি কটূক্তি প্রয়োগ না করিয়া ছাড়ে না। এই পর্ব্ব কৃষ্ণের কামাভিলাষের লীলাদি প্রকাশ করে।

দোলযাত্রা।

এই মাসে ঘেঁটু নামক খোশ্, পাচড়ার দেবতারও অদ্ভুত রকমের পূজা হইয়া থাকে; তাহার প্রতিরূপ একটী ভগ্নকলস; তাহা চূর্ণ হরিদ্রাতে রঞ্জিত করা হয়; বাড়ার গৃহিণী তাহার পৌরহিত্য করিয়া থাকে; তাহার উদ্দেশে অশিক্ষিত নারীগণের রচিত কতকগুলি কবিতা উচ্চারণ করিয়া শেষে ভগ্নকলস ঘেঁটু দেবকে চূর্ণ করিয়া ফেলে, এইরূপে পূজার অবসান হয়।

ঘেঁটু।

এই মাসে বসন্ত দেবী শীতলার ও ওলাউঠার দেবী ওলা-বিবির পূজাও হইয়া থাকে।

চৈত্র। ইহা চড়ক পূজার মাস। একজন প্রাচীন রাজা অতি কঠোর তপস্যা করিয়া শিবের দর্শনলাভ করিয়াছিলেন, তাহার স্মরণার্থে এই পূজা প্রচলিত হইয়াছে। এই সময়ে নীচ জাতীয় লোকেরা সন্ন্যাসী সাজিয়া পথে পথে ও ঘরে ঘরে গিয়া পয়সা উপার্জ্জন করে, সাত হইতে দশ দিন পর্য্যন্ত এইরূপ করিয়া থাকে। এই পর্ব্বের প্রথম দিনে এই কল্পিত সাময়িক সন্ন্যাসী-গণ ৭।৮ হস্ত উচ্চ কোন মঞ্চোপরি হইতে উর্দ্ধমুখে প্রোথিত ছুরিকাদি অস্ত্রের উপর ঝম্প প্রদান করিয়া আপনাদিগকে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক তদ্দ্বারা বিদ্ধ করে। এই লোকেরা দল বাঁধিয়া

চড়ক।

কেহ জিহ্বাতে বাণবিদ্ধ করিয়া (এক্ষণে এই রীতি গবর্ণমেণ্ট রহিত করিয়া দিয়ছেন), কেহ ধূপধূনা লইয়া নগরস্থ কালীর মন্দিরে গিয়া বলিদানাদি উৎসর্গ করণ পূর্ব্বক ফিরিয়া আইসে। পূর্ব্বে এই পূজা উপলক্ষে লোকে সাধারণের সমক্ষে অতি বিশ্রী পোষাক পরিয়া প্রকাশ্যে লজ্জাজনক নৃত্যাদি করিত, এক্ষণে তাহা আইন দ্বারা রহিত হইয়াছে। শেষ দিনে সন্ন্যাসীরা আপনাদের পৃষ্ঠবিদ্ধ করিয়া চড়ক গাছের উপরে শূন্যমার্গে পাক খায়; কিন্তু এক্ষণে আইনানুসারে আর পৃষ্ঠবিদ্ধ করিতে পারে না, পৃষ্ঠদেশে কাপড় বাঁধিয়া তাহা করে।

পূজাপদ্ধতি।

ধর্ম্মের অঙ্গমধ্যে প্রার্থনা অতি প্রয়োজনীয় বিষয়। আপনাদের অপেক্ষা কোন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির নিকট আগ্রহ ও ভক্তি সহকারে যাচ্ঞা করাই প্রার্থনা।

ব্রাহ্মণদিগের ব্যবহৃত দীর্ঘ দীর্ঘ প্রার্থনা আছে, তন্মধ্যে 'গায়ত্রী' অতি পবিত্র বলিয়া গণিত হয়; নিম্নলিখিত কয়েকটী শব্দে উক্ত গায়ত্রী রচিত:—

ওঁ ভূর্ভুবস্বঃ তৎ সবিতুর্বরেণ্যং ভর্গদেবস্য
ধীমহি ধিয়োয়োন প্রচোদয়াৎ ওঁ—

অর্থ—

হে সত্ত্বরজস্তমোগুণবিশিষ্ট ভূর্লোক, ভুবর্লোক, স্বর্লোক এই সকলের প্রসবকারি দেবশ্রেষ্ঠ, তোমার কিরণ আমরা ধ্যান করি, তদর্থে আমাদের বুদ্ধি নিযোজিত করি।

সায়নের অর্থ এইরূপ—

উজ্জ্বলবর্ণ রবির বাঞ্ছিত দীপ্তি আমরা ধ্যান করি তাহা আমাদের সমস্ত কার্য্যে সজীবতা প্রদান করে।

ইহা ব্রাহ্মণদের নিত্য ধ্যানের মন্ত্র, দীক্ষাকালে ব্রাহ্মণতনয়গণ ইহা ধ্যান করিতে শিক্ষা পায়। যেন তাহাদের অনুষ্ঠিত

যাবতীয় ধর্ম্মকার্য্য বরযুক্ত ও সফলতাপ্রাপ্ত হয়, এই জন্য তাহারা ইহাদ্বারা সূর্য্যকে সাহায্যার্থে আহ্বান করে।

গায়ত্রীর সঙ্গে সঙ্গে বিষ্ণু-ভক্তদের অনেকে স্ব স্ব পাপ স্বীকার পূর্ব্বক বিষ্ণুর নিকট নিম্নলিখিত প্রার্থনা উচ্চারণ করিয়া থাকে :—

পাপোঽহম পাপকর্ম্মাহম পাপাত্মা পাপসম্ভব,
ত্রাহিমাম, পুণ্ডরীকাক্ষ সর্ব্ব-পাপ হর হরে,

অর্থ :—আমি পাপিষ্ঠ, আমি পাপ করি, আমার প্রকৃতি পাপপূর্ণ, আমি পাপ-জাত আমায় ত্রাণ কর, হে পাপহারি পদ্মলোচন হরি।

হিন্দুগণ সচরাচর সাংসারিক সুখ কামনা করিয়া প্রার্থনা করে। প্রার্থনীয় বিষয়ের মধ্যে প্রায়ই পুত্রসন্তান, পারিবারিক স্বাস্থ্য, ধন ও বিষয়ের উন্নতি এইগুলিই প্রধান। ইষ্টদেবতার নামমাত্র পুনরুক্ত করাই তাহাদের প্রার্থনা; যত অধিকবার সেই নাম তাহারা উচ্চারণ করিতে পারে, ততই তাহাদের প্রার্থনা বেশী গুণযুক্ত হইল, বলিয়া অনুমান করে। কতবার নামোচ্চারণ হইল, তাহা নিশ্চিত জানিবার জন্য ১০৮টী দানা-বিশিষ্ট এক একটী মালা হস্তে রাখিয়া তদ্দ্বারা নাম গণনা করে। সজ্ঞানে গঙ্গাতীর-প্রবাসী মৃতকল্প ব্যক্তিকে হরিনাম উচ্চারণ করাইতে তাহার আত্মীয়েরা অতিশয় যত্ন প্রকাশ করিয়া থাকে। শুদ্ধ নামমাত্র উচ্চারণ করিলেই বিশেষ ফললাভ হয়, এই জ্ঞানে তাহারা আপন আপন দেবের নামানুসারে সন্তান-দিগের নাম রাখিয়া থাকে, যে কোন হেতুতে নাম উচ্চারণ করিলেই তাহাদের ফললাভ হইবে, এরূপ ভাবিয়া থাকে। প্রায়ই লোকে তোতা, ময়না প্রভৃতি পক্ষীকে দেবতার নাম উচ্চারণ করিতে শিক্ষা দেয়, ইহাতে ঐ সকল পক্ষীর উচ্চারণ দ্বারাও তাহাদের ফললাভ হইবে, এমন বিশ্বাস করে। তিব্বৎ দেশীয় লোকে কাগজের উপরে আপনাদের প্রার্থনা লিখিয়া তাহা যতবার ঘুরে, ততবার পুনরুক্তি করা হয়, এমন বিবেচনা করিয়া উক্ত প্রার্থনাসম্বলিত কাগজখণ্ড কোন জলস্রোত বা

বায়ুতে ঘুরিতে পারে, এমন একটী চক্রে সংলগ্ন করিয়া রাখে; এখানে অনবরত তাহার প্রার্থনার কার্য্য চলিতে থাকে; সে জাগ্রৎ, নিদ্রিত বা কর্ম্মান্তরে ব্যাপৃত হইলেও তাহার প্রার্থনার সংখ্যাবৃদ্ধির পক্ষে কোন বাধা হয় না।

দুর্গামাহাত্ম্যে লিখিত আছে, "মনুষ্য ব্যভিচার, চৌর্য্য বা অন্য কোন দুষ্কার্য্য করিতে করিতে 'দুর্গা' নাম করিলে তাহার সমস্ত পাপের মোচন প্রাপ্ত হয়।"

কোন দেবতার নামমাত্র উচ্চারণ করিলেই এত পুণ্যলাভ হয় যে, তাহার পাপের জন্য কোনরূপ দণ্ডভোগ করিতে হয় না; ইহার উদাহরণ স্বরূপে দুরাত্মা অজামীলের সম্বন্ধে রচিত গল্প অনেকবার হিন্দুর মুখে শুনিতে পাওয়া যায়। অজামীল আজীবন গোহত্যা, ব্রহ্মহত্যা, চৌর্য্য, লাম্পট্য, সুরাপান প্রভৃতি যাবতীয় দুষ্কার্য্য করিয়াছিল। তাহার চারি পুত্রের মধ্যে একের নাম নারায়ণ ছিল। মৃত্যু সময়ে অজামীল তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া "নারায়ণ, নারায়ণ, নারায়ণ আমাকে জল দেও," বলিয়াছিল। অনন্তর তাহার মৃত্যু হইলে যমদূতগণ তাহাকে টানিয়া নরকাভিমুখে লইয়া যাইতে উদ্যোগ করে, ইত্যবসরে বিষ্ণুর দূতগণ তাহাদের সম্মুখীন হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন ও বিজয়ী হইয়া অজামীলকে বিষ্ণুলোকে লইয়া যান। যম বিষ্ণুকে এই অত্যাচারের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বিষ্ণু বলেন, অজামীল আজীবন পাপকার্য্যে রত থাকিয়াও অন্তিমকালে নারায়ণ নামোচ্চারণ করিয়াছে, তাহাই তাহার স্বর্গে আনীত হইবার পক্ষে প্রচুর কারণ স্বরূপ গণিত হয়।

মনুষ্যগণ উপহাসচ্ছলে বা অকস্মাৎ, ক্রোধাবেগে বা আমোদছলে যদি একবার বিষ্ণুর নামোচ্চারণ করে, তাহা হইলেই অজামীলের ন্যায় পাপিষ্ঠ হইলেও স্বর্গপ্রাপ্তির পক্ষে তাহার কোনই প্রতিবন্ধক হইবে না।

এই কারণেই মুমূর্ষু হিন্দুকে কখন তাহার জীবনকালের পাপের জন্য অনুতাপ করিতে না বলিয়া স্বর্গে যাইবার উপায় স্বরূপে দেবতার নামোচ্চারণ করাইতেই বিশেষ যত্ন করা হয়।

শত্রুর বিনাশার্থে দেবগণের কাছে প্রার্থনা করিবার অনেক আদেশ ও আদর্শ পাওয়া যায়।

দেবতার এইরূপ নামোচ্চারণ করা বৃথা অজ্ঞানতার কার্য্য, বরঞ্চ তাহা পাপের প্রশ্রয়জনক। মনুষ্য পাপ ও দুষ্কার্য্য অতি সামান্য বিষয় বলিয়া আজীবন তাহাতে রত থাকিতে সাহস পায়, ভাবে, মৃত্যুকালে কোন রকমে একবার দেবতার নামোচ্চারণ করিতে পারিলেই স্বর্গলাভ নিশ্চিত। ইহা অপেক্ষা পাপকার্য্যের প্রশ্রয়দায়ক শিক্ষা আর কি হইতে পারে?

পূজা ও উপাসনা।

হিন্দুদের মধ্যে পূজার ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতি দৃষ্ট হয়। ধনী লোকদের গৃহে এক একটী বিগ্রহ ও তাহার প্রাত্যাহিক পূজা-কার্য্য নির্ব্বাহার্থে নিয়মিত পূজারী ব্রাহ্মণ ও পূজোপযোগী ফুলফল নৈবেদ্য নিরূপিত থাকে; কিন্তু সাধারণ লোকদের জন্য কোনরূপ নিয়মিত পূজা স্থির নাই। দোকানদারগণ আপন আপন বিপনীতে একটী করিয়া গণেশমূর্ত্তি রাখে ও কার্য্যারম্ভকালে তাহাকে প্রণাম করিয়া থাকে।

ধনবান বিষ্ণুপূজকেরা জীবিত দেবস্বরূপে স্ব স্ব গৃহে শাল-গ্রাম শিলা রাখিয়া থাকে। গ্রীষ্মকালে স্নানাদি দ্বারা তাহার তৃপ্তি সাধন করে। সেই রূপে তুলসী বৃক্ষেরও বিশেষরূপ সমাদর করিয়া থাকে। শৈব স্ত্রীলোকেরা নদীতে স্নান করিতে গিয়া কর্দ্দমের শিবলিঙ্গ প্রস্তুত করে, পরে তাহার সম্মুখে প্রণত হইয়া তাহা নদীতে নিক্ষেপ করিয়া আপনাদের দৈবসিক পূজা-কার্য্য সম্পন্ন করে।

উড়িষ্যার ভুবনেশ্বরের মন্দিরে প্রস্তরনির্ম্মিত ৮ ফিট একটী শিবলিঙ্গ প্রোথিত আছে, উপবিভাগে তাহা ৮ ইঞ্চ পরিমাণে দৃশ্য হয়, তাহা স্বয়ম্ভু শ্রেণীস্থ লিঙ্গ, দেবতা তাহাতে আপন প্রভাব প্রবিষ্ট করিয়াছেন, লোকে এরূপ বিশ্বাস করিয়া থাকে। প্রায় দ্বাবিংশ প্রকার কার্য্যদ্বারা এই প্রতিমার দৈবসিক পূজা সম্পন্ন হয়। (১) প্রত্যূষকালে ঘণ্টাবাদন পূর্ব্বক দেবতার নিদ্রা ভঙ্গ করা হয়। (২) বহুসংখ্যক বর্ত্তিকাধারী একটী

প্রদীপ ঐ প্রস্তরের সম্মুখে দোলান হয়। (৩) বিঘৎ পরিমাণ দীর্ঘ একটী দন্তমার্জ্জনী তাহার উপর ঘর্ষণ ও জল ঢালিয়া দেবতার মুখ প্রক্ষালন করিয়া দেয়। (৪) কয়েক কলস জল ঢালিয়া দেবতাকে স্নান করান হয়। (৫) প্রস্তরের উপর বস্ত্র রাখিয়া দেবতাকে বস্ত্র পরিধান করান হয়। (৬) প্রথম প্রাতর্ভোগ—অন্ন, মিষ্টান্ন, দধি, নারিকেল প্রভৃতি খাদ্য সামগ্রী দত্ত হয়। (৭) দ্বিতীয় প্রাতর্ভোগে লুচি প্রভৃতি পক্কান্ন খাদ্য উৎসৃষ্ট হয়। (৮) কিঞ্চিৎকাল পরে সামান্য প্রকার জলযোগ যোগান হয়। (৯) ভাল রকমের জলযোগ। (১০) মধ্যাহ্নের খাদ্য—অন্ন, ব্যঞ্জন, পিষ্টক, দুগ্ধাদি উৎসৃষ্ট হয়, তৎসময়ে আবার পূর্ব্বোক্ত প্রকার প্রদীপ জ্বালিয়া প্রতিমার সম্মুখে দোলাইতে থাকে ও ধূপদাহ করে। (১১) প্রায় বেলা চারিটার সময় শঙ্খ, ঘণ্টা প্রভৃতির কর্কশ ধ্বনি করত দেবতার ঘুম ভাঙ্গা হয়। (১২) মিষ্টান্ন উৎসর্গ করা হয়। (১৩) বৈকালিক স্নান সমাধা হয়। (১৪) বস্ত্র পরিধান করান হয়। (১৫) আর একবার ভোজন করান হয়। (১৬) পুনঃস্নান। (১৭) বস্ত্র পরিধানের পূর্ণ প্রক্রিয়া—বহুমূল্য বস্ত্র, পীতবর্ণ পুষ্প ও সুগন্ধি দ্রব্য প্রস্তরের উপর স্থাপন করা হয়। (১৮) পুনর্ব্বার খাদ্যোপহার। (১৯) এক ঘণ্টা পরে আবার নিয়মিত খাদ্যোপহার। (২০) নৃত্যাদি। (২১) দীপালোক দোলায়মান করা হয়। (২২) শয্যাপ্রস্তুত ও দেবতাকে নিদ্রিত করণ। অতি প্রত্যূষে দেবতাকে "প্রভাতী তোমার অপেক্ষায় আছে," বলিয়া আহ্বান করা হয়।

বিষ্ণুর উপাসনাও প্রায় এই প্রকারেই হইয়া থাকে, তাঁহার বিগ্রহের সম্মুখে কোন প্রকার আমিষযুক্ত খাদ্য উৎসৃষ্ট করা যায় না। এইরূপ স্তবযুক্ত প্রশংসাধ্বনি পূর্ব্বক দেবতাকে প্রত্যূষে জাগরিত করা হয়।—

"অন্ধকার দূরীভূত হইয়াছে, বিকসিত কুসুমনিচয় এক্ষণে সুগন্ধ বিস্তার করিতেছে, প্রভাত ও প্রাতঃসমীরণ সন্দর্শন কর, দেব, গাত্রোত্থান কর, শয়নাগারে নিদ্রাত্যাগ কর।"

দেবোদ্দেশে উৎসৃষ্ট খাদ্য পরে পুরোহিত ও পরিচারকগণ ভোজন করিয়া থাকে। কোন কোন দেবালয়ে, বিশেষতঃ কাশীর মন্দিরবিশেষে ও পুরীস্থ জগন্নাথের মন্দিরে উৎসৃষ্ট খাদ্য অতি উচ্চ মূল্যে বিক্রীত হয়। তীর্থবারি, যদ্দ্বারা প্রতিমা স্নাত হয়, অতি পবিত্র বোধে লোকে পান করে।

বৈদিক কালের উপাসনায় বলিদানকার্য্য 'পৃথিবীর নাভি-স্থল' রূপে গণিত হইত। বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব বশতঃ জীব-বলিদান অনেকাংশে রহিত হইয়াছিল। এক্ষণে লোকে প্রধানতঃ কালীপূজাতে পশু বলিদান করিয়া থাকে। পূর্ব্বকালে কালী মূর্ত্তির সম্মুখে নরবলি প্রদান অসাধারণ ছিল না, আজও তাহা সম্পূর্ণ রহিত হয় নাই, স্থানে স্থানে গোপনে নরবলির ব্যাপার শুনিতে পাওয়া যায়; কারণ তাহা হিন্দুর শাস্ত্রানুসারে পবিত্র পূজা। কল্কিপুরাণে শিব আপন পুত্রগণকে সম্বোধন করিয়া বলেন:—

"বরাহ ও গণ্ডারের মাংসে আমার প্রিয়তমা (কালী) ৫০০ বৎসর আনন্দলাভ করেন। নির্দ্দিষ্ট রীতিমত নরবলি পাইলে দেবী সহস্র বৎসর প্রীতা হন, ও তিনটী নরবলি একসঙ্গে পাইলে লক্ষ বৎসর। পবিত্র বাক্যে পূত শোণিত উপহার সুধা সম-গণ্য। বলিদাতার নিজ শরীরের শোণিত দেবী চণ্ডিকার নিকট উপযুক্ত উপহার বলিয়া গ্রাহ্য হয়।"

অর্থসংগ্রহের কৌশল। পুরোহিতগণ কখন কখন প্রতিমাকে শৃঙ্খলদ্বারা বদ্ধ করিয়া বলে, দেবতা ঋণী হইয়া পড়িয়াছেন, সমস্ত ঋণ পরিশোধ না হইলে মহাজনেরা তাঁহাকে মুক্তি দিতে চাহে না। দেবতার ঈদৃশ দশা দেখিয়া লোকে অতিশয় ভীত হইয়া অনিষ্টাশঙ্কা করে। পরে সর্ব্বসাধারণে সাধ্যানুসারে অর্থাদি দান করিয়া দেবতার মুক্তি ক্রয় করে।

অর্থোপার্জ্জনের অপর কৌশল এইরূপ। পুরোহিতেরা সাধা-রণ লোককে জ্ঞাপন করে যে, দেবতা লোকদের দেবভক্তির অভাব দেখিয়া পীড়িত হইয়াছেন। প্রতিমার গাত্রে তাহারা নানাপ্রকার ঔষধের প্রলেপ দিতে থাকে, ও কতপ্রকার গাছ

গাছড়া সম্মুখে রাখিয়া দেয়। ইতিমধ্যে চারিদিকে লোক পাঠাইয়া দেবতার পীড়ার সংবাদ প্রচার করায়। সাধারণ লোকে এই প্রবঞ্চনাবাক্যে বিশ্বাস করিয়া দেবোদ্দেশে ভক্তি প্রকাশক নানাবিধ উপহার আনয়ন করিতে থাকে। তখন দেবতা লোকদের ধর্ম্মভাবের পুনরুদ্দীপনা দেখিয়া সুস্থতা বোধ করেন ও আপনার পূর্ব্বস্থানে উপবেশন করেন!

ঈশ্বরের বিষয়ে এইরূপ মিথ্যা কথা বলা অতি ভয়ানক ঈশ্বরনিন্দা ব্যতীত আর কি হইতে পারে? সমস্ত বিশ্বের প্রভু নিদ্রাতুর হন, মানবকর্ত্তৃক জাগরিত হইবার প্রয়োজন হয়, ইত্যাদি ঈশ্বরের গুণ ও স্বভাবের বিরুদ্ধ শত শত প্রকার কল্পিত উক্তি হিন্দুধর্ম্মের শিক্ষা বলিয়া গ্রাহ্য হয়।

জন্মান্তর।

বর্ত্তমান জীবনের বিষয় বিশেষ চিন্তাসহকারে ধ্যান করিলে মনুষ্য দুটী দুর্বোধ্য বিষয় দেখিতে পায়; যথা, ১ম, আপনাতে শারীরিক ও নৈতিক পূর্ণ স্বাধীনতার পক্ষে নানা বিঘ্ন দেখে, যাহা ইচ্ছা করে, তাহা সম্পূর্ণরূপে পারে না, মনোমধ্যে এমন ভাবোদয় হয়, যাহা সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিতে পারে না, বাঞ্ছিত শক্তির অভাব সর্ব্বদা অনুভব করে। ২য়, তাহার ন্যায় বিরুদ্ধ কার্য্য আপনার চতুর্দ্দিকে সংঘটিত হইতে দেখে, পাপের জয় ও ধর্ম্মের পরাজয় তাহার সম্মুখে রহিয়াছে। মন্দ লোক অনেক সময় সৌভাগ্যশালী, অথচ সাধু ব্যক্তি উৎপীড়িত ও নিজ পুরস্কারে বঞ্চিত হন।

মনুষ্য পাপ করে, বা সৎকার্য্য করে, কিন্তু তাহার উপযুক্ত শাস্তি বা পুরস্কার অধিকাংশ স্থলে এ জীবনে প্রত্যক্ষ হয় না। শিশুগণ ভাল বা মন্দ কার্য্যাক্ষম হইলেও কেহ জন্মাবধিই সুখ ও ঐশ্বর্য্যের অধিকারী, কেহ বা শোচনীয় দুঃখ ও দারিদ্র্যে

পতিত হয়। এই জন্যে হিন্দুশাস্ত্রে সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে যে, মনুষ্যের সম্মুখে এমন এক ভবিষ্যৎ জীবন রহিয়াছে, যাহাতে বর্ত্তমান জীবনের অসমতা দূরীকৃত হইবে, ও পূর্ব্বে এমন জীবন ছিল, যাহার কার্য্যফল বর্ত্তমান জীবনের অসমতার কারণ। অতএব মানবজীবনের কর্ম্মফল আত্মার শৃঙ্খল স্বরূপ হইয়া পৃথিবীরূপ কারাগৃহে তাহাকে আবদ্ধ রাখে। এইরূপ পুনঃপুনঃ জন্মগ্রহণ করা হিন্দুশাস্ত্রে 'জন্মান্তর' নামে কথিত হয়।

জন্মান্তর-শিক্ষা সমর্থনার্থে প্রাকৃতিক ব্যাপার হইতে এই একটী দৃষ্টান্তের প্রয়োগ হয়। আত্মা সমুদ্রস্থ বারিরাশির ন্যায় একই; কিন্তু বারিরাশি হইতে কতক পরিমাণ বারি বাষ্পাকারে উত্থিত হইয়া মেঘে পরিণত ও বৃষ্টির আকারে পৃথিবীতে পতিত হয়, তাহা আবার বৃক্ষলতাদির মধ্যে গিয়া তাহাদের পুষ্টিকর রসে পরিণত হয়, পুনশ্চ এরূপ বৃক্ষাদি জীবগণ কর্ত্তৃক ভক্ষিত হইয়া জীবশরীরের অংশ হইয়া উঠে। এইরূপে শত শত আকার ধারণ করিলেও অবশেষে প্রক্রিয়াবিশেষে কোন নদীতে পতিত হইয়া তৎসহযোগে আপনার পূর্ব্বস্থান সমুদ্রে আনীত হয়। এই দৃষ্টান্তে বারিধি একমাত্র পরমাত্মার সদৃশ, জলের অন্য অন্য অবস্থায় আত্মার "মায়াযুক্ত" অবস্থান বুঝায়। যখন পরমাত্মার কোন অংশ মায়াধীন কোন অবস্থায় নিপতিত হয়, তখন তাহা মনুষ্য ও ইতর প্রাণী, দেব ও পিশাচ, উদ্ভিদ, নদী, প্রস্তরাদির মধ্য দিয়া গতি করে। কোন এক শরীর পরিত্যাগ করিলে তাহাতে সাধিত কার্য্যের ফলানুসারে অন্য শরীরের মধ্যে প্রবেশ করিতে বাধ্য হয়। ভাল মন্দ সমস্ত কার্য্যের ফলভোগ করিতেই হইবে। এইরূপে জন্মান্তরের কারণ সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ অবস্থাতে চৌরাশী লক্ষবার জন্মগ্রহণ করিতে করিতে অবশেষে পরমাত্মাতে আসিয়া মিলিত হইবে। তখন জড়ত্ব ও মায়ামুক্ত অবস্থায় হিন্দু আপন বাঞ্ছিত মুক্তিলাভ করিতে গিয়া স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বর্জ্জিত হইয়া পরমাত্মাতে লীন হয়।

১। মনুষ্য হইতে মনুষ্যের, উদ্ভিদ হইতে উদ্ভিদের উৎপত্তি হয়, ইহাই প্রাকৃতিক নিয়ম; কিন্তু জন্মান্তরের মতানুসারে

জন্মান্তরের মত ভ্রান্তিমূলক। মনুষ্য সিংহ, বিড়াল, শূকর, কীট বা পলাণ্ডু রূপে জন্মিয়া থাকে। প্রকৃতিতে এ শিক্ষার সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ উদাহরণ পাওয়া যায়।

২। পূর্ব্বজন্মের বিষয় কেহ কিছু স্মরণ করিতে পারে না। কোন পথিক নগরে নগরে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইলে কি আপনার বাসস্থান বা তথাকার আত্মীয়-স্বজনের বিষয় ভুলিয়া যায়? বরঞ্চ যে সকল নগরের মধ্য দিয়া ভ্রমণ করিয়াছে, তৎসমুদয়ের বিষয়ও স্মরণে থাকে, ও তাহার প্রতি কোথায় কি ঘটিয়াছে, তাহা ভালরূপে জানে। তদ্রূপ নানা দেহরূপ নগরে ভ্রমণকারী আত্মাপথিক আত্মবিস্মৃত না হইয়া অনায়াসে আত্মপরিচয় দিতে সক্ষম হইত। কিন্তু কোন আত্মাই তাহার বর্ত্তমান জীবনের পূর্ব্বে তৎপ্রতি কি কি ঘটিয়াছিল, তাহা কিছুমাত্র বলিতে পারে না; ইহাতে প্রমাণ হয় যে, এ জীবনের পূর্ব্বে তাহার কোন অস্তিত্ব ছিল না।

৩। জন্মান্তরদ্বারা আত্মা সম্পূর্ণ নূতন হয়, এজন্য তাহার শাস্তিভোগ তাহার নিজের কর্ম্মফলের কারণ বলা যাইতে পারে না। জন্মান্তরের অন্য এক উদ্দেশ্য আত্মাকে দণ্ডাদি ভোগ দ্বারা শিক্ষা দেওয়া হয়, যেন আত্মা কোনরূপ গর্হিত কার্য্যে রত না হইয়া ক্রমশঃ পবিত্রাবস্থায় আনীত হয়। কিন্তু যখন কোন মনুষ্যকে তাহার অপরাধ না জানাইয়া শাস্তি দেওয়া হয়, তখন তাহার তাহাতে কোনরূপ সংশোধন হইতে পারে না। এইরূপ শাস্তিদাতাই বা কিরূপে ন্যায়বান বিচারকর্ত্তা বলিয়া গণিত হইবেন?

৪। জন্মান্তরের শিক্ষায় আত্মার উন্নতি না হইয়া আরও অবনতিই হইয়া পড়ে; যথা, মানবাত্মা পশুতে প্রবিষ্ট হইলে পশুত্বপ্রাপ্ত, পিশাচে প্রবিষ্ট হইলে পিশাচত্বপ্রাপ্ত হয়; এইরূপে পাপরূপ কলুষ ধৌত করিতে গিয়া আরও অশুচি ও নিকৃষ্ট হইয়া পড়ে। এই শিক্ষায় মনুষ্য সান্ত্বনার অন্বেষণ করিতে গিয়া বাস্তবিকই আরও শান্তিবিহীন হয়। এই শিক্ষানুবর্ত্তী হইলে নৈরাশ্য সাগরে পড়িয়া, মনুষ্য উপায়ান্তর না পাইয়া অবশেষে

অদৃষ্টবাদী হইয়া উঠে, আত্মসংশোধনের কোনরূপ চেষ্টা না করিয়া সর্ব্ববিষয়ে অদৃষ্টের উপর নির্ভর করত নিশ্চিন্ত হয়।

বৈষ্ণব ধর্ম্ম।

বৈষ্ণবেরা সকলে বিষ্ণুর প্রাধান্য স্বীকার করে; কিন্তু দলের নেতাগণের বিষ্ণু সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ শিক্ষার পার্থক্য ও রীতিনীতির বিভিন্নতা প্রযুক্ত তাহাদের স্বতন্ত্র সম্প্রদায় গঠিত হইয়াছে, প্রত্যেক সম্প্রদায় বিভিন্ন চিহ্নদ্বারা আপনাদের পার্থক্য প্রকাশ করে।

ভিন্ন ভিন্ন স্থান ও কালে বৈষ্ণব ধর্ম্মের নেতৃগণের আবির্ভাব হইয়াছিল, তাহারা নিম্নলিখিত ছয় শাখাতে বিভক্ত।

১। নিম্বার্ক। ৪। রামানন্দ।
২। রামানুজ। ৫। বল্লবাচার্য্য।
৩। মাধবাচার্য্য। ৬। চৈতন্য।

নিম্বার্ক। সচরাচর ইহারা নিমান্দিস নামে খ্যাত। এই দলস্থ বৈষ্ণব সম্প্রদায় নিম্বার্ক বা নিম্বাদিত্য হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। লোকে জ্যোতির্ব্বেত্তা ভাস্করাচার্য্য ও নিম্বার্ককে একই ব্যক্তি বিবেচনা করিয়া থাকে, তিনি দ্বাদশ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন। অন্যেরা তাঁহাকে সূর্য্যদেবের অবতার কল্পনা করিয়া থাকে, উহাদের মতে ইনি বিধর্ম্ম নাশ করিয়া ধর্ম্ম স্থাপন করিতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

তাহারা কৃষ্ণ ও রাধাকে একসঙ্গে পূজা করে, ভাগবত-পুরাণ তাহাদের প্রধান শাস্ত্র। কথিত আছে, নিম্বার্ক বেদের টীকা লিখিয়াছেন। কিন্তু এই সম্প্রদায়ের বিশেষ কোন ধর্ম্ম-গ্রন্থ নাই। তাহারা বলে, সম্রাট আরংজিবের সময় মথুরা নগরে তাহাদের সমস্ত গ্রন্থ দগ্ধ হইয়া গিয়াছে।

ইহারা মস্তকের কেশমূল হইতে দুই ভ্রূ পর্য্যন্ত গোপীচন্দন মৃত্তিকার দুইটী লম্বা রেখা কপালে ধারণ করে, রেখাদ্বয় একটী

বা দুইটী বক্রাকার রেখাদ্বারা সংযুক্ত, তাহা বিষ্ণুর পদচিহ্ন রূপে অঙ্কিত করে।

সম্ভবতঃ দ্বাদশ শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত জয়দেব এই সম্প্রদায়ের লোক ছিলেন; তাঁহার প্রণীত গীতগোবিন্দ কৃষ্ণভক্তিপ্রকাশক কাব্য। কৃষ্ণ ও গোপীগণের প্রেম তিনি আধ্যাত্মিক ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন; মানবাত্মা ঈশ্বরের সহিত মিলিত হইতে যে আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করে, তাহাই রূপকভাবে কৃষ্ণ ও রাধার বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

২। রামানুজ। ইহারা দাক্ষিণ ভারতবর্ষের মধ্যে প্রসিদ্ধ দল। রামানুজ নামক সমাজসংস্কারক ব্যক্তিদ্বারা এই দলের সৃষ্টি হয়। মান্দ্রাজের ১৩ ক্রোশ পশ্চিম শ্রীপারামবাটুর নগরে ইনি দ্বাদশ শতাব্দীর শেষাংশে জন্মেন। তাঁহার প্রধান শিক্ষা এই, বিষ্ণু শ্রেষ্ঠ ঈশ্বর, সমস্ত বিশ্বের পূর্ব্বে তিনিই বিদ্যমান ছিলেন, তিনিই সমস্তের কারণ ও স্রষ্টা।

এই সম্প্রদায় দুই শাখায় বিভক্ত, ১, বদ্‌গলই, ২, টেঙ্গা-লই। উভয় শাখার শিক্ষা অদ্বৈতবাদ, কিন্তু রামানুজের অদ্বৈতবাদ কিঞ্চিৎ বিভিন্ন আকারের শিক্ষা; তাঁহার মতে মনুষ্য ও ঈশ্বরের আত্মা পরিণামে অভিন্ন, কিন্তু শরীরে অবস্থান কালে তাহা বাস্তবিক পরস্পর বিভিন্ন। ইহাকে তিনি 'বিশিষ্ট অদ্বৈতবাদ' বলিয়াছেন। তাহারা বিভিন্ন প্রকার খাদ্য প্রস্তুত ও তাহা গোপনে গ্রহণ করে। কখন গোঁপ বাড়িতে দেয় না, বিষ্ণুর চক্র ও অন্যান্য চিহ্ন বাহুতে ধারণ করে। কেশমূল হইতে ভ্রূ পর্য্যন্ত দুইটী শ্বেতবর্ণ রেখা ও মধ্যস্থলে লক্ষ্মীকে প্রকা-শক একটী লালবর্ণের রেখা ও তন্নিম্নে একটী চক্রাকার রেখা কপোলদেশে অঙ্কিত করে।

৩। মাধব বা মাধবাচার্য্য দল। পণ্ডিত মাধবাচার্য্য দ্বারা ইহা সংস্থাপিত হইয়াছে; তাঁহাকে আনন্দতীর্থ, বা পূর্ণপ্রজ্ঞ বলিয়াও থাকে। শঙ্করাচার্য্য ও তাঁহার স্মার্ত্ত শিষ্যসমূহ অদ্বৈত-বাদ শিক্ষার প্রবর্ত্তনা করিয়াছিলেন; মাধবাচার্য্য এই অদ্বৈত-বাদের সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন। ১২০০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার জন্ম

হয়, তিনি অনন্তেশ্বর মঠে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইযাছিলেন। তাঁহার শিষ্যগণ মঠবাসী, অনেকে দার্শনিক পণ্ডিত। মাধব অদ্বৈত-বাদের বিরুদ্ধে দ্বৈতবাদ প্রচার ও স্থাপন করেন। মাধবের দ্বৈতবিজ্ঞানের মত এইরূপ—পরমাত্মা মানবাত্মা ও জড়জগৎ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক ও বিভিন্ন, ঈশ্বর ও মনুষ্যের মধ্যে সম্পূর্ণ ও অনন্ত পার্থক্য বিদ্যমান আছে।

ইহাদের কপোলদেশস্থ চিহ্ন রামানুজ দলের ন্যায়, কেবল বর্ণ লাল ও মধ্যের রেখাটী বিষ্ণুমূর্ত্তির সম্মুখে দগ্ধ ধূপের অব শিষ্টাংশ কৃষ্ণবর্ণ পদার্থ দ্বারা অঙ্কিত করা হয়।

৪। রামানন্দ। এই দলস্থদিগকে রামানন্দী বলা যায়, ইনি রামানুজের শিষ্য। উভয় দলের শিক্ষা প্রায় তুল্য। চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রারম্ভে তিনি বেনারস নগরীতে প্রাদুর্ভূত হন। গঙ্গাতীরবর্ত্তী প্রদেশে বিশেষরূপে আগ্রার চতুর্দ্দিকে বহুসংখ্যক রামানন্দী বাস করে। বিষ্ণুর অবতারস্বরূপে তাহারা রাম ও সীতার পূজা করিয়া থাকে। তাহাদের সাম্প্রদায়িক চিহ্ন রামানুজ দলের চিহ্নের তুল্য। এই দলপতি শিক্ষা দিয়াছিলেন, বৈরাগী ও সন্ন্যাসীগণের মধ্যে কোনও প্রকার জাতিভেদ নাই।

রামানন্দের ১২ জন বিশেষ শিষ্য ছিল; তাহাদের মধ্যে ধর্ম্মসংস্কারক কবির সমধিক প্রসিদ্ধ, তিনি চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষ অংশে বর্ত্তমান ছিলেন। কবির একটী বিভিন্ন সম্প্রদায় গঠন করেন; প্রতিমাপূজার বিরুদ্ধে তিনি সুসাহস পূর্ব্বক প্রতিবাদ করেন; ও স্বদেশীয়দের ধর্ম্মপদ্ধতি লইয়া বিলক্ষণ বিদ্রূপ করিয়াছেন। বিষ্ণু ও রাম একই ব্যক্তি বলিয়া তিনি রামের পূজার অনুমোদন করেন। তিনি বাস্তবিক একজন উন্নত নীতির প্রচারক ছিলেন এবং জীবন ঈশ্বরের পবিত্র দান ও জীবের রক্তপাত করা অতি গর্হিত কার্য্য বলিয়া শিক্ষা দেন। সদা সত্য কথা বলা কর্ত্তব্য ও ইন্দ্রিয়ের উপর কর্ত্তৃত্বলাভার্থে নির্জ্জনবাসের প্রয়োজনীয়তা তিনি শিক্ষা দেন।

নানক শাহ লাহোরের নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে ১৫০০ অব্দে বাবরের রাজত্বকালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার প্রচারিত

অদ্বৈতবাদ ও অন্যান্য শিক্ষা তিনি সম্ভবতঃ কবিরের নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার মত হিন্দু ও মুসলমান ধর্ম্ম হইতে সংগঠিত, উভয় ধর্ম্ম সম্মিলিত করিতে তিনি চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার মতাবলম্বী বৈরাগীরা উদাসী নামে খ্যাত।

৫। বল্লবাচার্য্য। ইহারা বোম্বাই, গুজরাট, ও মধ্যভারতের একটী প্রসিদ্ধ দল। এই দলের সংস্থাপক বল্লবাচার্য্য চম্পারণ্যের বনমধ্যে ১৪৭৯ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার শিষ্যগণ তাঁহাকে কৃষ্ণের অবতার বলিয়া গ্রহণ করে ও তাঁহার সম্বন্ধে অনেক আশ্চর্য্য গল্প রচনা করিয়াছে। তাহারা বলে, বল্লবাচার্য্য সপ্তবর্ষ বয়ঃক্রমকালে বিদ্যাশিক্ষা আরম্ভ করিয়া চারি মাসের মধ্যে চতুর্ব্বেদ, ষড়্দর্শন এবং অষ্টাদশ পুরাণ শিক্ষা করেন। এইরূপে অকালে পরিপক্ক হইয়া তিনি নিজের মত গঠন ও তাহার বিস্তার করণাভিলাষে পরিভ্রমণে নির্গত হন। তৎকালে বিজয় নগরের রাজা কৃষ্ণদেবের সভায় উপনীত হইয়া রাজাজ্ঞায় শৈব সম্প্রদায়ের সঙ্গে বিচারে প্রবৃত্ত হন, তাহাতে তাঁহার সম্পূর্ণ জয়লাভ হইলে, তিনি বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রধান আচার্য্য বলিয়া মনোনীত হন। অনন্তর ভারতের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে নব বৎসর ভ্রমণ করিয়া অবশেষে বেনারসে অবস্থান করেন। তথায় সতের খানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন; তাহার একখানা গ্রন্থের নাম 'ভাগবত টীকা সুবোধিনী,' ইহা ভাগবত পুরাণের টীকা-গ্রন্থ। এই গ্রন্থের দশমখণ্ড এই দলের প্রধান ধর্ম্মগ্রন্থ, ও 'বেদান্ত বিজ্ঞান' তাঁহার প্রধান শিক্ষা। রামানুজের 'বিশিষ্টাদ্বৈত' হইতে পৃথক করণার্থে তিনি আপনার মতের 'শুদ্ধাদ্বৈত' নাম দেন। বল্লাবাচার্য্য বেনারসে মরিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার দলস্থেরা বলে, তিনি গঙ্গাস্নান করিতে করিতে স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন।

বল্লবাচার্য্যের ৮৪জন শিষ্য ছিল; তাঁহার মৃত্যুর পরে ইহারা ভারতবর্ষের নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া আপনাদের গুরুর মত প্রচার ও বিস্তার করে। তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র তাঁহার গদির উত্তরাধিকারী হন, তাঁহার নাম বিত্তলনাথ; লোকে তাঁহাকে

গোসাঞীজীও বলিযা থাকে। তিনি মথুরার নিকটস্থ গোকুলে আপন বাসস্থান নিরূপণ করিয়াছিলেন। বিত্তলনাথের সপ্তপুত্র, তাঁহারা প্রত্যেকে আপনার জন্য এক একটী গদি প্রতিষ্ঠা করেন; বম্বে, কচ্ছ, কাটিবাড়, মালবস্থিত বানিয়া ও ভাট নামক বণিকদের মধ্যে বিশেষরূপে ইহাদের প্রতিষ্ঠিত গদি বিদ্যমান রহিয়াছে। বল্লবাচার্য্যের উত্তরাধিকারীগণের ক্ষমতা এতদূর বাড়িয়া আসিয়াছে যে, তাহারা আপনাদিগকে 'মহাবাজা' ও 'গোস্বামী মহাবাজা' নামে খ্যাত করে।

বল্লবাচার্য্যের মতের নাম 'পুষ্টিমার্গ,' অর্থাৎ ভোজন, পান ও ভোগবিলাস। উপবাস, অনুতাপ প্রভৃতি আত্মসংযম-কার্য্য-দ্বারা নয়, কিন্তু পৃথিবীব উত্তম পদার্থ সমূহদ্বারা স্বাভাবিক ক্ষুধা চরিতার্থ কবিয়া দেবোপাসনা কবিতে হয়। বিষ্ণুব মূর্ত্তি বলিয়া তাহারা কৃষ্ণ ও তাঁহাব গোপী রমণীগণকে পূজা কবিয়া থাকে। কৃষ্ণের বাল্যাবস্থার দ্বাদশবর্ষ পর্য্যন্ত সময়েব ঐতিহাসিক ঘটনা ধরিয়া তাহাদের দেবমূর্ত্তি গঠিত হয়। কৃষ্ণেব রাধা ও গোপীগণকে লইয়া যে ক্রীড়া বা কেলি বর্ণিত আছে, শুদ্ধাচারী বৈষ্ণবেবা তাহা প্রকৃত ঘটনা না বলিয়া রূপক ঘটনা ধবিযা থাকে; ঈশ্বরাত্মার জন্য মানবাত্মার যে বাসনা, তাহাই রূপক ভাবে বর্ণিত হইয়াছে, এরূপ কল্পনা করে। কিন্তু বল্লভাচার্য্য দলের বৈষ্ণবেরা তাহা শারীবিক ভাবে ও প্রকৃত ঘটনা বলিয়া গ্রহণ করে। এইরূপে তাহাদের কৃষ্ণভক্তি অতি কদর্য্য কুঅভিলাষের মূল হইয়া উঠিয়াছে, তাহাদের মত আমূল ভ্রষ্টতায পূর্ণ। উপাসকেরা দেবতার মনস্তুষ্টি করণার্থে নারীবেশ ধারণ পূর্ব্বক গোপী সাজিয়া কৃষ্ণের উপাসনা করে। বল্লবাচার্য্যের উত্তরাধিকারী মহারাজাগণ রমণীর পোষাক পরিধান পূর্ব্বক কৃষ্ণের উদ্দেশে আপনাদিগকে সমর্পণ করে।

এই সকল মহারাজকে কৃষ্ণের পার্থিব প্রতিনিধিজ্ঞানে পূজা করা হয়, এমন কি, অনেকে ভাবে, তাঁহারাই স্বয়ং ঈশ্বর—ঈশ্বরের অবতার। এজন্য, যে মন্দিরমধ্যে মহারাজা দেবোপাসনা করেন, তথায় স্ত্রীপুরুষের জনতা আসিয়া মহারাজার উপাসনা

করিয়া থাকে, তাঁহার চরণে প্রণত হয়, তাঁহার উদ্দেশে ধূপ, ফল, ফুল, উৎসর্গ করে ও তাঁহার সম্মুখে আলোক দোলায়মান করিয়া আরতি দেয়। দেবতাকে দোলায়মান করা উপাসনার এক অঙ্গ, তদনুসারে স্ত্রীলোকেরা মহারাজকে দোলনাতে শায়িত করিয়া দোলাইয়া থাকে। মহারাজার মুখচ্যুত পান সুপারি, ও তাঁহার ভোজনাবশিষ্ট খাদ্য উপাসকগণ অতি আদর ও ব্যগ্রতাসহকারে গ্রহণ করিয়া থাকে। তাঁহার বস্ত্র-নিষ্পীড়িত জল তাহারা চরণামৃত বলিয়া পান করে।

কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা মন্দ ও লজ্জাকর বিষয় এই,—লোকে বিশ্বাস করে, মহারাজার ইন্দ্রিয়াসক্তি পরিতৃপ্ত করা তাঁহার প্রসন্নতা-লাভের শ্রেষ্ঠ উপায়। শিষ্যগণ মহারাজার উদ্দেশে আপন আপন তন, মন, ধন° উৎসর্গ করে। তাহাদের স্ত্রীলোকেরা শিক্ষিত হয় যে, মহারাজার প্রেমপাত্র হইতে পারিলে আপনা-দের ও সমস্ত পরিবারের জন্য শ্রেষ্ঠ আশীর্ব্বাদলাভ করা যায়।

এই সম্প্রদায়ের এইরূপ অতি ঘৃণিত কদাচরণের বিরুদ্ধে স্বামী নারায়ণ নামক এক ব্যক্তি সতীত্ব ও পবিত্রতা প্রচার করিয়া দল গঠন করিয়াছেন, তাঁহার শিষ্য সংখ্যা প্রায় দুইলক্ষ হইবে। তিনি আপনাকে কৃষ্ণের অবতার বলিয়া এইরূপ প্রচার করেন যে, দেবতা বৈষ্ণব ধর্ম্মের পূর্ব্বপবিত্রতা পুনঃ-স্থাপন করণার্থে ব্রহ্মচারীরূপে আমাতে আবির্ভূত হইয়াছেন।

৬। চৈতন্য। ইহাঁর দলস্থদিগকে বাঙ্গালা ও উড়িষ্যা দেশে বিশেষরূপে দেখিতে পাওয়া যায়। এই দলের সংস্থাপক চৈতন্য প্রায় ১৪৮৫খ্রীষ্টাব্দে নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন। ২১বৎসর বয়সে তিনি উপবীত পরিত্যাগ পূর্ব্বক উদাসীন অবস্থায় গৃহ-ত্যাগ করিয়া বহির্গত হন; পরে জগন্নাথক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া বৈষ্ণব ধর্ম্মের শিক্ষা প্রচার করিতে থাকেন, এবং নৃত্য ও সঙ্কীর্ত্তনে উৎসাহ প্রদান করেন। আমোদ ও উৎসাহে নিমগ্ন হইলে তিনি যেন দেবতার সহভাগিতালাভ করিতেন, এরূপ ভাব দেখাইতেন। তাঁহার শিষ্যগণও এইরূপ ভান করিয়া থাকে। তিনি মধ্যে মধ্যে ধর্ম্মানুরাগে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতেন;

এইরূপে একদা পুরিসন্নিহিত সমুদ্রে মূর্চ্ছিত হইযা প্রাণত্যাগ করেন। মৃত্যুর পর শিষ্যগণ তাঁহাকে কৃষ্ণের অবতার বলিয়া দেবশ্রেণীর মধ্যে স্থান দান করিয়াছে।

চৈতন্যের শিক্ষা। জাতিভেদ পরিত্যাগ করা ও তাঁহার দলস্থ সকলের একসঙ্গে ভোজন করা কর্ত্তব্য। তিনি মৎস্য ও মাংস ভোজন নিষেধ করেন, ও যে যকল দেবতার উদ্দেশে বলিদান করা হয়, তাহাদের পূজা করিতে বারণ করেন। বিধবার বিবাহ প্রচলন করেন। কৃষ্ণভক্তিদ্বারাই পরিত্রাণলাভ হয়, ইহা শিক্ষা দিতেন; অবশেষে তিনি আপনাকেই কৃষ্ণ বলিযা প্রচার করেন ও কৃষ্ণের ন্যায় নারীগণের সহিত মিলিযা নৃত্য করিতেন। নবদ্বীপে তাঁহার উদ্দেশে মন্দির প্রতিষ্ঠিত আছে, তাহাতে ক্ষুদ্রাকারের কৃষ্ণ ও বৃহদাকারের একটী চৈতন্যমূর্ত্তি রহিযাছে। বঙ্গদেশীয বেশ্যাগণ তাঁহার উপাসক ও ভক্ত, এই উপায়ে তাহারা অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার অধিকারিণী হয।

চৈতন্যের বহুসংখ্যক শিষ্যমণ্ডলী অচিরে বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র ছিন্নভিন্ন হইযা তাঁহার মত প্রচার করিতে লাগিল। তাহাদের মত এই যে, কৃষ্ণ প্রধান ঈশ্বর, আর জ্ঞান, ইন্দ্রিযদমন, যোগ, দান, ধর্ম্মকার্য্য বা অন্য যে কিছু পুণ্য বলিযা ধরা যায, তৎসমুদয় অপেক্ষা কৃষ্ণ ভক্তিই মহাফলদাযক। এই বিশ্বাসাবলম্বী প্রত্যেক জাতীয লোক পবিত্র গণিত হয়। জাতিনির্ব্বিশেষে সকলেই এই মতের অধিকারী। কৃষ্ণ বা হরি নাম উচ্চারণই তাহাদের প্রধান ধর্ম্মক্রিযা।

হিন্দু কেমন সহজে আপন ঈশ্বরকে গঠন করিয়া থাকে, ও হিন্দুদের মধ্যে ঈশ্বর বলিযা আত্মপরিচয় দিযা কেমন সহজে পূজা ও ভক্তির অধিকারী হওয়া যায়, চৈতন্যের ইতিহাসে তাহা অতি সুন্দররূপে দৃষ্ট হয।

বৌদ্ধ মত।

'বুদ্ধ' এই সংজ্ঞার অর্থ, পূর্ণজ্ঞানপ্রাপ্ত ব্যক্তি—অর্থাৎ যে ব্যক্তি সত্যের বিশুদ্ধ জ্ঞানপ্রাপ্ত হইয়া আপনার সমস্ত অস্তিত্ব

হইতে মুক্ত হইয়াছেন, যিনি নির্ব্বাণমুক্তি পাইবার পূর্ব্বে অর্থাৎ ঐহিক অস্তিত্বনাশের পূর্ব্বে জগত সমক্ষে তন্মুক্তি পাইবার উপায় সমূহ জ্ঞাপন করেন, তিনিই বুদ্ধ।

পূর্ব্বে অনেকানেক বুদ্ধের আবির্ভাব হইয়া গিয়াছে। এই শেষ বুদ্ধ কপিলাবস্তুর রাজবংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম শুদ্ধোদন, মাতার নাম মায়াদেবী, তিনি রাজা সুপ্রবুদ্ধের কন্যা। ক্ষত্রিয় কুলে বুদ্ধের জন্ম হয়, তাঁহার বংশের নাম শাক্য এবং তাহার পারিবারিক নাম গৌতম। তিনি বিশেষ চিন্তাবেগ প্রযুক্ত রাজবাটীর সুখ, যশোধারা নাম্নী যুবতী ভার্য্যা ও শিশু সন্তান পরিত্যাগ পূর্ব্বক উদাসীনরূপে বাহির হন। পরে কয়েক বৎসর ভ্রমণ ও ধ্যানের পর, কথিত আছে, গয়া সমীপস্থ 'বোধিবৃক্ষ' তলে অবস্থানকালে শ্রেষ্ঠ জ্ঞানলাভ করেন। খ্রীঃ পূঃ প্রায় ৫০০ অব্দে বেনারসে তিনি নিজ নূতন মত প্রচারারম্ভ করেন।

বৌদ্ধধর্ম্ম ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মমত হইতে উৎপন্ন, উভয় ধর্ম্ম পরস্পর নৈকট্য সম্বন্ধে বদ্ধ, অথচ পরস্পর বিরুদ্ধ। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মে সমস্তই ঈশ্বরতত্ত্ব, কারণ ইহাতে ঈশ্বরই সব, ও সকলই ঈশ্বর বলিয়া শিক্ষা দেয়; কিন্তু বৌদ্ধমতে বাস্তবিক ঈশতত্ত্ব নাই, এজন্য তাহা ধর্ম্ম না বলিয়া কর্ত্তব্য, নীতি ও সদাচরণের মত সংগ্রহ বলা যাইতে পারে; তাহাতে ঈশ্বর, প্রার্থনা ও যাজকপদ্ধতি কিছু নাই।

বুদ্ধ ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম ও জাতিভেদের বিরুদ্ধে স্বীয় ধর্ম্মমত প্রচার করেন; তাঁহার মতে মনুষ্যমাত্রের সমতা প্রচারিত হইয়াছে। সমস্ত মনুষ্যকে ইহজীবনে অথবা বহুবিধ পরজন্মে আত্ম-কর্ম্ম-ফল ভোগ করিতেই হইবে। সর্ব্বপ্রকার প্রায়শ্চিত্তার্থক বলিদান নিরর্থক ও অপ্রয়োজন। একের পাপের দণ্ড অন্যের উপর আরোপিত হইতে পারে না; ধার্ম্মিক ব্যক্তি যেমন স্বকৃত ধর্ম্মের ফল স্বয়ং ভোগ করেন, তাদৃশ পাপীকে আত্ম-কর্ম্মের ফল অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে। মনুষ্যকে নিজ নিজ কর্ম্ম বশতঃ ইতর জন্তু, কীট, পতঙ্গ অথবা জড়পদার্থে অবনত, বা

উন্নত জীবরূপে পরিগণিত হইয়া আপনার কৃত কর্ম্মের প্রায়শ্চিত্ত সাধন বা পুরস্কার ভোগ করিতে হইবে। একারণ বৌদ্ধমতে সর্ব্বপ্রকার জীবহিংসা নিষিদ্ধ হইয়াছে। অধিকন্তু ভাল ও মন্দ উভয় কার্য্যের জন্য বারম্বার জন্ম পরিগ্রহ করিতে হয় বলিয়া মানবজীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য অস্তিত্বলোপ বা নির্ব্বাণ-মুক্তিলাভ, তাহা আত্মসংযম, তপস্যা এবং সর্ব্বপ্রকার কার্য্য-নিবৃত্তি হইতে লাভ করা যায়।

বৌদ্ধধর্ম্মের পাঁচটী প্রকৃতিগত লক্ষণ দৃষ্ট হয়। ১, ইহাতে জাতিভেদ নাই। ২, জীববলিদান, বা একের পরিবর্ত্তে অন্যের দুঃখভোগ অবিধেয়। ৩, পুনর্জ্জন্মের শিক্ষাতে বিশেষ আনুরক্তি। ৪, আত্মদমন, তপস্যা ও কার্য্যনিবৃত্তির সাহায্যার্থে আধ্যাত্মিক ধ্যানের উপকারিতা। ৫, পুনর্জ্জন্মের নিবৃত্তি জন্য মানবীয় ইচ্ছার সংকোচ করণ।

বৌদ্ধ ধর্ম্মের ৬ষ্ঠ প্রকৃতিগত লক্ষণ উপরোক্ত গুলি হইতেও স্মরণীয়, অর্থাৎ বুদ্ধ মনুষ্যের বাহ্য প্রকৃতি হইতে বিভিন্ন কোন আত্মা বা প্রাণের অস্তিত্ব স্বীকার করেন নাই; কিম্বা তাঁহার মতে অন্য পরমাত্মা বা ঈশ্বরও নাই; হিন্দু দেবগণ কেবল বিভিন্ন শ্রেণীস্থ প্রাণীমাত্র। মুক্তি বা পরিত্রাণ সম্বন্ধে বুদ্ধের শিক্ষা অতি ভ্রমাত্মক, বৈরাগ্যভাব গ্রহণ পূর্ব্বক সন্ন্যাসী হইলেই মুক্তি, ইহা তাঁহার শিক্ষা। সংসারে থাকিয়া সংসারের না হওয়া, এভাব তাঁহার জ্ঞানের বহির্ভূত বিষয় ছিল। তিনি সমাজ রক্ষার উপায় করিতে পারেন নাই, বরঞ্চ সমাজ নষ্ট করিয়াছেন, ফলতঃ সমস্ত পারিবারিক বন্ধন ছেদ পূর্ব্বক তাঁহার শিক্ষানুবর্ত্তী হইয়া তাঁহার শিষ্যগণ তাঁহার লক্ষ্য মুক্তির অধিকারী হইতে পারিয়াছেন।

বৌদ্ধ মতের মধ্যে উন্নত ও পবিত্র ভাব বহুপরিমাণে আছে, তাদৃশ মূর্খতার ও ত্রুটির বিষয়ও তন্মধ্যে অনেক রহিয়াছে। ইহার নীতি হিন্দু নীতি অপেক্ষা অতি উন্নত; কিন্তু তাহাতে যে নীতির শিক্ষা প্রদান করে, তাহার অনুসরণ করিতে বুদ্ধের মত কোন শক্তি প্রদান করে না। এই মতের মিশনারীভাব

বিশেষ সৌন্দর্য্যপূর্ণ ও শক্তিসম্পন্ন বোধ হয়; ফলতঃ বৌদ্ধ মিশনারীগণ পর্ব্বত, নদী, সমুদ্র, দূরত্ব প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার বাধা অতিক্রম করিয়া সভ্য অসভ্য সর্ব্বশ্রেণীর লোকের নিকট আপনাদের অসার সুসমাচার প্রচার করিতে অদ্ভুত উদ্যমশীলতার উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছে। সুসমাচার এই—অস্তিত্বই দুঃখ, অস্তিত্বনাশই মুক্তি।

ভারতের ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের সহিত প্রায় সহস্র বৎসর ব্যাপিয়া বৌদ্ধ মতের প্রতিযোগিতা চলে, ইতিমধ্যে রাজা অশোক তন্মতাবলম্বী হইয়া তাহা ভারতময় বিস্তার করিতে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। কিন্তু যে মত সমাজের মূলে আঘাত করে, তাহা কোন মতেই জাতীয় ধর্ম্ম হইতে পারে না। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম বাস্তবিক জাতীয় ধর্ম্ম,'ক্রমে তাহা লোকদের মনাকর্ষণ করিতে লাগিল; অবশেষে বুদ্ধের মত ভারতভূমি হইতে বিতাড়িত ও ক্রমে প্রায় অদৃশ্য হইয়া গেল। দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ভারতের স্থানে স্থানে আপনার পূর্ব্ব গৌরবের স্মৃতিচিহ্নমাত্র রাখিয়া বিদায় গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের ক্রিয়াকলাপ ও শিক্ষাতে বৌদ্ধ মতের বিশেষ প্রভাব ও কার্য্য সাধিত হইয়াছে, তাহার জীববলিদান-প্রথা অনেক পরিমাণে রহিত হইয়াছে, আধ্যাত্মিক বিষয়ে মনোযোগ করিতে বাধ্য হইয়া হিন্দুর মন দর্শনশাস্ত্রের প্রতি সমধিক রত হইয়াছে।

বৌদ্ধ বাস্তবিক কোন প্রার্থনা করে না, কিন্তু পূর্ণতাপ্রাপ্তির জন্য ও নির্ব্বাণমুক্তিলাভের ভরসায় ধ্যান করিয়া থাকে; যদিও কার্য্যতঃ সে সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বরের ইচ্ছাধীন, তথাপি নিজ কর্ম্মদ্বারা এমন ঈশ্বরের হাত এড়াইতে প্রয়াস করে।

বৌদ্ধদিগের কোনরূপ বিশ্বাসপদার্থ নাই; তাহাদের বিশ্বাসের স্বীকার এইরূপ:—"বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্গ সহ আমার সহভাগিতা আছে।" এই তিনটীকে বৌদ্ধধর্ম্মের মণিত্রয় বলা হয়।

বুদ্ধ আধ্যাত্মিক ধ্যানদ্বারা চারি মহাতত্ত্বের পরিচয় পাইয়াছেন, তাহা এই—

১। দুঃখভোগ জীবনের অনুষঙ্গী।

২। অভিলাষ দুঃখভোগের কারণ।

৩। দুঃখভোগ হইতে মুক্তিলাভের উপায় ইচ্ছার নিবৃত্তি ও অস্তিত্বলোপ বা নির্ব্বাণ হওয়া।

৪। বুদ্ধকর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট পথের অনুসরণ করিলে নির্ব্বাণ-মুক্তিলাভ হয়; প্রত্যেক কালের আবির্ভূত বুদ্ধ তৎকালের লোকদিগকে এই পথের জ্ঞান প্রদান করিয়া থাকেন।

পথ অষ্টপ্রকার, তন্মধ্যে ৪টী এই, সম্যগ্ দর্শন, সম্যগ্ চিন্তা; যথার্থ কথা ও যথার্থ কার্য্য। অতিরিক্ত অন্য চারিটী সংসারত্যাগী বৌদ্ধদের পক্ষে পালনীয়;—১, ব্যবস্থার সম্যকরূপে পালন, ২, ব্যবস্থাপালনে প্রকৃতরূপ স্মরণশক্তি, ৩, যথার্থ সন্ন্যাস-জীবন ধারণ, ৪, সম্যকরূপে ধ্যান।

বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রবল হইয়া ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের উপর অনেক পরিমাণে স্বায় ক্ষমতা বিস্তার করিয়াছে; ফলতঃ তদ্দ্বারা কেবল জীববলিদান-প্রথা দূরীকৃত হইয়াছে, তাহা নয়, কিন্তু জীবগণের প্রতি দয়া প্রকাশ করা অনুসৃত, পুনর্জ্জন্মের শিক্ষার উপর বিশ্বাস দৃঢ়ীভূত ও অন্তিম মুক্তির জন্য তপস্যা ও আত্মসংযমের উপকারিতা স্বীকৃত হইয়াছে। তদ্ভিন্ন জাতিভেদ প্রথার আংশিক দোষ স্বীকার করত কতক পরিমাণে তাহাও শিথিল হইয়াছে। এইরূপে কালক্রমে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম ও বৌদ্ধ ধর্ম্ম কতক পরিমাণে পরস্পরের উপাদান গ্রহণ করত মিশ্রিত হইয়া পড়িয়াছে। অবশেষে ব্রাহ্মণেরা বুদ্ধকে বিষ্ণুর এক অবতার স্বীকার করিয়া আপনাদের দেবগণের মধ্যে গণনা করিয়া লইয়াছে। ব্রাহ্মণদের ইহা একটি বিশেষ কৌশল, বিরুদ্ধ মতের মধ্য হইতে কোন কোন শিক্ষা আপনাদের ধর্ম্মপ্রণালীর অন্তর্গত করিয়া তাহারা ভিন্ন মতাবলম্বীগণকে আপনাদের অধীনতাপাশে আবদ্ধ করিয়া থাকে, ও কোনরূপে আপনাদের জাতিভেদ-প্রণালীর মধ্যে গণ্য করিয়া লয়; ফলতঃ বৌদ্ধকে লাভ করিবার জন্য আপনারাও বৌদ্ধরূপ ধারণ করে। বৌদ্ধদের একটি ক্ষুদ্র শাখামাত্র ব্রাহ্মণদের এই কৌশলে সম্মত হয় নাই; তাহারা জৈন নামে

খ্যাত হইয়া আপনাদের স্বাতন্ত্র্যভাব এ পর্য্যন্ত রক্ষা করিয়া আসিতেছে।

ভাগবতপুরাণে লিখিত আছে, অচিন্ত্য পুরুষ মর্ত্যদেহ ধারণ করিয়া মায়াকর্ত্তৃক নির্ম্মিত নগরত্রয়ে বিধর্ম্ম প্রচার করিতে লাগিলেন। যে সকল দেবারিগণ বেদানুমোদিত ধর্ম্মে সুস্থির ছিল, তাহাদিগকে ভ্রান্ত করিয়া বিনষ্ট করণার্থে তিনি এই উপায় অবলম্বন করিলেন।

ঈশ্বর মনুষ্যকে বিধর্ম্ম শিক্ষা দিয়া ভ্রান্ত করেন, ইহা অতি অদ্ভুত বিষয় ও ঈশ্বরত্বের বিরুদ্ধ কার্য্য।

হিন্দুশাস্ত্র।

হিন্দুধর্ম্মের বিষয়ে এ পর্য্যন্ত যাহা কিছু বর্ণনা করা হইয়াছে, তৎসমুদয় বর্ত্তমান প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মের ক্রিয়াকলাপ; তাহা প্রাচীন শাস্ত্রসম্মত নয় বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এজন্য এই প্রস্তাবে আমরা হিন্দুদিগের আধুনিক ও প্রাচীন শাস্ত্রগুলি কি কি, তাহা নির্দ্দেশ করিব। প্রচলিত ধর্ম্মপ্রণালীকে পৌরাণিক বা পুরাণ-সম্মত বলা যায়। কিন্তু হিন্দুধর্ম্মের অপর দুই পদ্ধতি আছে, তাহাদের নাম বৈদিক বা আদিম ও দার্শনিক প্রণালী। বেদসঙ্গত ধর্ম্মপদ্ধতি বৈদিক ধর্ম্ম নামে আখ্যাত।

পুরাণ।

প্রধানতঃ পুরাণই প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মের ভিত্তিমূল। পুরাণের সংখ্যা সাধারণতঃ অষ্টাদশ কথিত হয; তাহা এই—

১ ব্রহ্মপুরাণ, ২ পদ্মপুরাণ, ৩ বিষ্ণু, ৪ শিব, ৫ ভাগবত, ৬ নারদ, ৭ মার্কণ্ডেয়, ৮ অগ্নি, ৯ ভবিষ্য, ১০ ব্রহ্মবৈবর্ত্ত, ১১ লিঙ্গ, ১২ বরাহ, ১৩ স্কন্দ, ১৪ বামন, ১৫ কূর্ম্ম, ১৬ মৎস্য, ১৭ গরুড়, ১৮ ব্রহ্মাণ্ড।

এতদ্ভিন্ন কতকগুলি শাস্ত্র উপপুরাণ বলিয়া পরিচিত, তাহা-দেরও সংখ্যা অষ্টাদশ।

আঠারখানি পুরাণের অধিকাংশ শৈবপুরাণ, কতকগুলি বিষ্ণুপুরাণ, আর দুইখানি ব্রহ্মপুরাণ। বিষ্ণুপুরাণ অতি প্রসিদ্ধ, ইহা কেহ কেহ বেদের ন্যায় পবিত্র গ্রন্থ জ্ঞান করে; ইহার প্রথম গ্রন্থের উপসংহার এইরূপ—

"হে ব্রাহ্মণ, পুরাণের প্রথমাংশ এইরূপে তোমার নিকট প্রকাশিত হইল; ইহা শ্রবণে যাবতীয় অপরাধ খণ্ডিত হয়। দ্বাদশ বৎসরকাল কার্ত্তিক মাসে পুষ্কর হ্রদে স্নান করণে যে ফল, পুরাণ শ্রবণে সেই ফললাভ হয়। ইহার শ্রোতাকে দেবগণ দেবলোকের মহিমা প্রদান করেন।"

বিষ্ণুপুরাণে জগৎ সৃষ্টির বৃত্তান্ত, পৃথিবীর উদ্ধারার্থে নারায়ণের বরাহমূর্ত্তি ধারণ, ব্রহ্মার মুখ, বক্ষঃ, উরুদেশ ও পদ-তল হইতে চতুর্ব্বর্ণের সৃষ্টি ও লক্ষ লক্ষ বৎসর পূর্ব্বে সংঘটিত হইয়াছে, এমন বহুবিধ বিষয়ের বর্ণনা আছে। পৃথিবীর ভৌগ-লিক বৃত্তান্ত ও গগণমণ্ডলস্থ গ্রহাদির বর্ণনাও ইহাতে সন্নিবেশিত আছে।

বিষ্ণুপুরাণে (দ্বিতীয় পুস্তকের ২ অধ্যায়) লিখিত আছে, স্বর্ণময় মেরুগিরি পৃথিবীর মধ্যস্থলে আছে, তাহার উচ্চতা ৮৪,০০০ যোজন ও পৃথিবীর অভ্যন্তরে তাহার যে অংশ প্রোথিত আছে, তাহার পরিমাণ ১৬,০০০ যোজন। ইহার চূড়াপ্রদেশের ব্যাসের পরিমাণ ৩২,০০০ যোজন, ইত্যাদি। মেরু পর্ব্বতের চতুর্দ্দিকে সপ্তদ্বীপ রহিয়াছে; সে গুলি একে একে লবণ, ইক্ষু, সুরা, ঘৃত, দধি, দুগ্ধ ও বিশুদ্ধ বারিবিশিষ্ট সপ্ত সমুদ্র বেষ্টিত। মেরুগিরির চারি শৃঙ্গ, প্রত্যেকের উচ্চতা ১০,০০০ যোজন। প্রত্যেকের উপরে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার তরুরাজি রহিয়াছে, প্রত্যেক তরুর উচ্চতা ১,১০০ যোজন। জম্বুদ্বীপ নামক মহাদেশ উক্ত পর্ব্বতস্থ জম্বুবৃক্ষের নামে খ্যাত হইয়াছে; সেই বৃক্ষের এক একটী ফল হস্তীর ন্যায় বৃহৎ।

পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশ হইতে তাহার গম্ভীরতার পরিমাণ ৭০,০০০

যোজন, পৃথিবীর নিম্নস্থ সপ্তপাতালের প্রত্যেকটী ১০,০০০ যোজন পরিমিত গভীর। এই সপ্তপাতালের নিম্নদেশে বিষ্ণুর আকৃতি রহিয়াছে, তাহা শেষ বা অনন্ত নামে খ্যাত। শেষ সমস্ত বিশ্ব-রাজ্য স্বীয় মস্তকে কিরীটের ন্যায় ধরিয়া আছেন। যখন অনন্ত উন্মত্তাবস্থায় ভ্রূকুটি করেন, তখন সমস্ত ধরা আপনার উপ-রিস্থ পর্ব্বত, অরণ্য, সমুদ্র, নদী প্রভৃতি লইয়া কম্পিত হইতে থাকে।

এইরূপে আকাশমণ্ডলস্থ গ্রহনক্ষত্রাদির বর্ণনাতেও পুরাণে নানা মিথ্যা কল্পনা লিখিত হইয়াছে। বিষ্ণুপুরাণে স্বর্ণডিম্ব, সমুদ্রমন্থন, কৃষ্ণের গোবর্দ্ধন পর্ব্বত ধারণপ্রভৃতি বর্ণিত বিষয়-গুলি মেরু, রাহু, কেতু প্রভৃতির বর্ণনার ন্যায় তুল্যরূপে মিথ্যা ব্যতীত আর কি হইতে পারে? মনুষ্যের শিক্ষার জন্য ঈশ্বর যাহা দিয়াছেন, তাহাতে মিথ্যাকথা থাকা অসম্ভব, যখন স্পষ্ট মিথ্যা ও অযুক্তির কথা কোন পুস্তকের মধ্যে দৃষ্ট হয়, তাহা যে ঈশ্বর দত্ত নয়, তাহা অতি স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারা যায়।

পুরাণ সকল পরস্পর বিরুদ্ধবাদী। প্রত্যেক পুরাণে যে দেবতার বিষয় বর্ণনা হইয়াছে, তাহাকেই শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিয়া অন্য সকলকে হেয়জ্ঞান করা হইয়াছে। যথা, ভাগবতপুরাণে বলে,—

"যাহারা ভব (শিব) অনুরক্ত ও তাঁহার শিক্ষানুগামী, তাহাদিগকে বিধর্ম্মী বলা ন্যায়সঙ্গত, তাহারা সত্য শাস্ত্রের বৈরী; অতএব পরিণামে মুক্তিপ্রয়াসী ব্যক্তিগণ ঐ ভীম ভূতরাজকে পরিত্যাগ করিয়া নারায়ণের প্রতি দৃষ্টি ও মনের শান্তিতে এবং ঈর্ষাবর্জ্জিত হইয়া তাঁহার পূজা করুক।"

আবার পদ্মপুরাণে বলে:—

"বিষ্ণুর প্রতি দৃষ্টি করিলেই শিবের ক্রোধানল প্রজ্জলিত হইয়া উঠে, তাহার ক্রোধে পতিত হইলে নিশ্চয়ই ভীষণ নিরয়-গামী হইতে হয়; অতএব বিষ্ণুর নামও কেহ না করুক।"

এই দেবত্রয়ের উৎপত্তি সম্বন্ধেও পুরাণে মহাগণ্ডগোল দৃষ্ট হয়। ভাগবতপুরাণে বলে—বিষ্ণুর নাভিস্থিত কমল হইতে ব্রহ্মার উৎপত্তি হইয়াছে। মৎস্যপুরাণে লিখিত আছে, ব্রহ্মা শিবের সৃষ্টিকর্ত্তা। কিন্তু লিঙ্গপুরাণে তদ্বিপরীত কথা আছে, যথা ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও তাঁহাদের পত্নীগণ শিবকর্ত্তৃক উৎপন্ন হইয়াছেন।

এইরূপ বহুসংখ্যক পরস্পরবিরুদ্ধ বাক্য পুরাণ সকলের মধ্যে পাওয়া যায়। মহাভারতে এ বিষয়ে একটী যথার্থ উক্তি রহিয়াছে, যথা,

"বেদ সকল পরস্পরবিরুদ্ধ, শাস্ত্রগুলিও বিরুদ্ধ, পবিত্র ঋষিগণও বিরুদ্ধোক্তি করিয়া গিয়াছেন।"

বেদ ও পুরাণে বর্ণিত ধর্ম্ম প্রণালীর মধ্যে বিশেষ পার্থক্য দৃষ্ট হয়। পুরাণে অদ্বৈতবাদ ও বহু-ঈশ্বরবাদ আশ্চর্য্যরূপে মিশ্রিত হইয়াছে, ইহা বেদান্তের প্রতিপাদ্য অদ্বৈতবাদ হইতে ভিন্ন। ইহাতে বাহ্য জগতের অস্তিত্ব স্বীকার করে ও তাহা ঈশ্বরের অংশরূপে বিবেচিত হয়। পরমাত্মা আপনাকে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব এই ত্রিমূর্ত্তিতে প্রকাশ করিয়াছেন; তাঁহাদিগকে যথাক্রমে সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়কর্ত্তা বলা যায়। কিন্তু আবার উপাসকেরা কখন কখন আপনাদের উপাস্য এক দেবের উপরেই এই কার্য্যত্রয় আরোপ করিয়া থাকে; এইরূপে বিষ্ণু পক্ষীয়েরা বিষ্ণুকেই ও শিবোপাসকেরা শিবকেই সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়কর্ত্তা কহিয়া থাকে। এই তিন দেবের একত্র সমাবিষ্ট ত্রিমূর্ত্তি সচরাচর হিন্দুদের কৃত চিত্রে ও খোদনকার্য্যে দৃষ্ট হয়। বম্বের সন্নিহিত এলিফাণ্টা দ্বীপস্থ গহ্বরে এইরূপ খোদিত বৃহৎ একটী ত্রিমূর্ত্তি রহিয়াছে। পবিত্র 'ওম্' শব্দে (অ+উ+ম্) ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর দেবত্রয় নির্দ্দিষ্ট হয়।

বেদে উল্লিখিত তিন গুণ একাদশ (৩×১১) দেবতা সংখ্যা পুরাণে তিনগুণ একাদশ কোটীতে দাঁড়াইয়াছে। বেদে যাহাদের শ্রেষ্ঠত্ব ছিল, পুরাণের কালে তাহারা অধীনস্থ দলের মধ্যে গণ্য ও অন্যেরা শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী হইয়াছে। এইরূপে ইন্দ্র বেদের শ্রেষ্ঠ দেবতা, পুরাণে আপনার শ্রেষ্ঠত্ব ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবকে

দিতে বাধ্য হইয়াছেন। বেদে বিষ্ণু ইন্দ্রের সহচর ও নিম্নশ্রেণীস্থ ছিলেন, কিন্তু পুরাণে বিষ্ণু আপন উপাসকদের নিকট শ্রেষ্ঠ দেব বলিয়া পূজিত হন। বেদে কৃষ্ণ নামের উল্লেখও নাই, কিন্তু পুরাণে তিনি বিষ্ণুর প্রধান অবতার ও গীতায় সর্ব্বময় ঈশ্বর রূপে গৃহীত হইয়াছেন। এইরূপে রাম, শিব, দুর্গা, কালী প্রভৃতি যাঁহারা এখন পূজনীয় হইয়া উঠিয়াছেন, তাঁহারা বেদের কেহই নহেন। পৌরাণিক অদ্বৈতবাদ শিক্ষার বিষময় ফল-স্বরূপ বহুদেবতার স্থষ্টি হইয়াছে, একে একে স্বর্গ মর্ত্যস্থিত যাবতীয় জীবও পদার্থকে দেবতা বলিয়া পূজা করিতে ভারত-বর্ষীয়দিগকে বাধ্য করিয়াছে। এইরূপে "অজ্ঞানতার বশে তাহারা অসাড় হইয়া সকল সৃষ্ট বস্তুতে সৃষ্টিকর্ত্তার গুণ আরোপ ও পূজা প্রদান করিয়াছে।" আর এক্ষণকার শিক্ষিত মহোদয়-গণেরা এই কুশিক্ষার প্রশ্রয় দিতেছেন, ঈশ্বরবিহীন ইংরাজি শিক্ষার এই বিষময়ফল ভারতের পক্ষে ঘোরতর অনিষ্টসাধন করিতেছে।

বেদ।

বেদের সংখ্যা চারি ; ঋক্, যজু, সাম ও অথর্ব্ব। বেদের আদিম লেখা অনেকস্থলে পরিবর্ত্তিত করা হইয়াছে, এবং এক বেদের বিষয় অন্যের মধ্যেও লিখিত হইয়াছে, অথচ দুয়ের মধ্যে এত বৈসাদৃশ্য, যে একজন বিজ্ঞ লেখক বলিয়াছেন যে, "তাহা স্বেচ্ছাজনিত প্রক্ষেপ ও পরিবর্ত্তন।" প্রায় সমস্ত সাম বেদের বাক্য ঋগ্‌বেদ হইতে গৃহীত ; কিন্তু উভয়ের পাঠের মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে, কোন্ পাঠ স্থলবিশেষে গৃহীত হইতে পারে, তাহা বিজ্ঞ লোকেরা নিরূপণ করিয়াছেন। তদ্রূপ অথর্ব্ব বেদের অনেকাংশ ঋগ্বেদ হইতে সঙ্কলিত ; কিন্তু উভয়ের মধ্যে অতি বিপরীত পার্থক্য ও অনৈক্য বিদ্যমান রহিয়াছে।

বেদ তিন অংশে বিভক্ত ; প্রথম সংহিতা বা মন্ত্র, কবিতায় রচিত গীত ও প্রার্থনা। ২য়, ব্রাহ্মণ—উপাসনা পদ্ধতি, মন্ত্র

সকলের উপযুক্ত ব্যবহার, বলিদানের প্রক্রিয়া ও অর্থ এই অংশে বর্ণিত আছে। অরণ্যবাসী মুনিদিগের ব্যবহার্য্য অংশ 'আরণ্যক' নামে ইহাতে সংযোজিত হইয়াছে। ৩য়, উপনিষদ, (ভ্রমনাশক উপদেশমালা) তাহাতে ঈশ্বরের প্রকৃতি, আত্মতত্ত্ব, সৃষ্টিপ্রকরণ ও মনুষ্যের চরমাবস্থা বর্ণিত হইয়াছে। হিন্দুরা উপনিষদ অতি পবিত্র গ্রন্থ বিবেচনা করে। প্রাচীনতম উপনিষদগুলিও সংহিতার অন্ততঃ সহস্র বৎসর পরে লিখিত ও অপরগুলি আরও পরবর্ত্তী কালে লিখিত হইয়াছে। বেদ ও উপনিষদের শিক্ষার মধ্যে গুরুতর পার্থক্য ও ভিন্নতা দৃষ্ট হয়, দুই সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র শিক্ষা বলিলেও হয়।

সমস্ত প্রকারের হিন্দুশাস্ত্রগুলি দুই প্রধান অংশে বিভক্ত করা হয়, শ্রুতি ও স্মৃতি। বেদ চতুষ্টয় শ্রুতি বলিয়া কথিত হয়; তাহা ঐশ্বরিক প্রত্যাদিষ্ট গ্রন্থ বলিয়া হিন্দুর বিশ্বাস, কোন মনুষ্য তাহাদের রচয়িতা নহে। আর যে সকল ঐশ্বরিক প্রত্যাদেশ পরম্পরাগতবাক্যরূপে স্মরণে রাখা হইয়াছিল ও মনুষ্যকর্ত্তৃক লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তৎসমুদয়কে স্মৃতি বলা হয়। বেদের পরবর্ত্তী কালে স্মৃতি সকল লিখিত হইয়াছে। সে সমুদয় চারি প্রধানভাগে বিভক্ত ঃ—যথা,

১। ছয় বেদাঙ্গ।

(১) কল্প অথবা শ্রৌতসূত্র,—বৈদিক বলিদানে ব্যবহৃত মন্ত্র ও ব্রাহ্মণের নিয়মাদি।
(২) শিক্ষা অথবা উচ্চারণের বিদ্যা।
(৩) ছন্দঃ অথবা কবিতাদির পরিমাণ।
(৪) নিরুক্ত অথবা বেদ ব্যাখ্যা।
(৫) ব্যাকরণ।
(৬) জ্যোতিষ।

২। স্মার্ত্তসূত্র, ইহার দুই অংশ, (১) গার্হস্থ্যসূত্র, অর্থাৎ গৃহ-সম্বন্ধীয় নিয়মাবলী। (২) সমাজাচারিকাসূত্র, অর্থাৎ সামাজিক ব্যবহার সম্বন্ধীয় নিয়মাদি।

৩। ধর্ম্মশাস্ত্র বা ব্যবহারনীতি; বিশেষরূপে মনু, যাজ্ঞবল্ক্য ও অন্য কোন২ প্রত্যাদিষ্ট ব্যবস্থাবেত্তাগণের প্রণীত ব্যবস্থাশাস্ত্র বুঝায়। ইহা স্মার্ত্তসূত্র হইতে উৎপন্ন বিবেচিত হয়।

৪। ভক্তিশাস্ত্র, ইহাতে মহাভারত, রামায়ণাদির কবিতা বর্ণিত ইতিহাস বুঝায়। অষ্টাদশ প্রাচীন গল্পপূর্ণ পুরাণ ও অষ্টাদশ উপপুরাণ ও অনন্তর-জাত তন্ত্র ইহার মধ্যে পরিগণিত।

হিন্দুশাস্ত্র সকল যে প্রকারে ক্রম বিকসিত হইয়া আসিয়াছে, তাহা বুঝিবার জন্য চারি প্রকারের প্রধান প্রধান গ্রন্থগুলিতে জ্ঞান থাকা আবশ্যক; ১ম, বেদের তিন অংশ, যথা, মন্ত্র, ব্রাহ্মণ ও উপনিষদ। ২য়, দর্শনসমূহ; ৩য়, ধর্ম্মশাস্ত্র; ৪র্থ, ভক্তিশাস্ত্র।

হিন্দু দর্শনশাস্ত্রের একমাত্র প্রতীতিবাক্য "একমেবাদ্বিতীয়ম" ইহাই সমগ্র বেদের সার, জ্ঞানমার্গের উপায় ও পরিত্রাণের শ্রেষ্ঠপথ বলিয়া বিবেচিত হয়। ইহাতে দ্বিবিধ নিম্নশ্রেণীর উপায়ও সংযুক্ত হইয়াছে।

১ম, বলিদান, ক্রিয়াকলাপ, অনুতাপ, তপস্যা, ধ্যান প্রভৃতির ফলে যে বিশ্বাস, তাহা 'কর্ম্মমার্গ' বলিয়া কথিত হয়।

২য়, দেববিশেষের উপর বিশেষ অনুরাগ ও ভক্তি প্রকাশ করাকে 'ভক্তিমার্গ' বলা যায়। এই দুই মার্গ অনুসারে হিন্দুধর্ম্মপদ্ধতির দুই বিভিন্ন রূপ হইয়াছে।

বেদের গীতগুলি প্রকৃতির বিস্ময়কর ব্যাপার ও পদার্থের উদ্দেশে সাদর উক্তিমাত্র ও প্রার্থনাগুলি কেবল শারীরিক ও সাংসারিক প্রয়োজনের জন্য যাচ্ঞা। ব্রাহ্মণাংশে যজ্ঞকার্য্য প্রভৃতির উদ্দেশে ক্রিয়াকলাপের বিধান বর্ণিত আছে। উপনিষদ ও দর্শনশাস্ত্র সমূহে যুক্তি ও বিচারসঙ্গত বিজ্ঞান এবং অদ্বৈতবাদের প্রধান শিক্ষা প্রদর্শিত হইয়াছে। মনু, যাজ্ঞবল্ক্য ও অন্য ব্যবস্থাবিদগণ জাতি বিচার ও পারিবারিক, সামাজিক নীতি প্রভৃতির কর্ত্তব্য বিধান করিয়াছেন। এবং ইতিহাস, পুরাণ ও তন্ত্র সকল দেবতার প্রতি ভক্তি ও প্রেমতত্ত্বের বিষয় শিক্ষা দেয়।

বৈদিক গীত বা মন্ত্র।

বেদশব্দের অর্থ জ্ঞান, তাহা ঐশ্বরিক অলিখিত জ্ঞানের উদ্দেশে ব্যবহৃত হয়। বেদ স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মের নিশ্বাস হইতে উৎপন্ন বলিয়া কল্পিত ; স্বয়ং বেদও স্বয়ম্ভূ বলিয়া বিবেচিত হয়, এজন্য বেদকেও কখন কখন ব্রহ্মশব্দে প্রকাশ করা যায়। এই ঐশ্বরিক জ্ঞান 'শব্দ' বলিয়াও উক্ত হয়, সে শব্দ নিত্যস্থায়ী। পবিত্র ঋষিগণ অনন্ত শব্দ বা বাক্য শুনিয়াছিলেন ; এমনও কথিত হয় যে, তাঁহারা অনন্ত বাক্যের দর্শনলাভ করিয়াছিলেন ; এইরূপে ঋষিগণ অতিপ্রাকৃতিকভাবে ঐশ্বরিক প্রজ্ঞার শ্রবণ ও দর্শন-লাভ করিয়াছিলেন। তাহা লিখিত না হইয়া মুখ-পরম্পরায় চলিয়া আসিয়াছিল। যে শিক্ষকগণ এই জ্ঞানের প্রকৃত গ্রহীতা স্বরূপে পুরুষানুক্রমে তাহা রক্ষা ও শিক্ষা দিয়াছিলেন, তাঁহারাই ব্রাহ্মণ নামে খ্যাত হইয়াছেন, তাঁহারা ঐশ্বরিক বাক্য ও প্রার্থনার ভাণ্ডারস্বরূপ ছিলেন। ইহদ্বারা বোধগম্য হয় যে, প্রত্যাদিষ্ট জ্ঞান ক্রমশঃ লিখিত হইয়াছে, কিন্তু তাহার পাঠ সাধারণতঃ নিষেধ ছিল।

বেদ বা প্রত্যাদিষ্ট শ্রুতি তিন অংশে বিভক্ত ; যথা,

১। মন্ত্র, ইহা প্রার্থনা ও স্তুতি, কবিতায় সংগৃহীত।

২। ব্রাহ্মণ, ক্রিয়াকলাপের আদেশ ও উদাহরণ, তাহা গদ্যাকারে লিখিত।

৩। উপনিষদ, ব্রাহ্মণাংশের শেষে সংযুক্ত নিগূঢ় বা গোপনীয় উপদেশ, গদ্য ও পদ্যে লিখিত।

মন্ত্রের অর্থ মনের চিন্তা চালনার উপায় বা যন্ত্র, ইহা প্রত্যাদিষ্ট বাক্য বা পবিত্র উক্তি বুঝায়।

যে সকল গীত, স্তোত্র, সম্বোধন বা প্রার্থনা দেবতারূপ প্রাকৃতিক শক্তির উদ্দেশে প্রয়োগ করা হইয়াছে, তাহাদিগকে মন্ত্র বলা যায়। সেগুলি পাঁচটী সংহিতা বা সমষ্টিতে শ্রেণীবদ্ধ করা হইয়াছে। সংস্কৃত সাহিত্যের একটী অতি শোচনীয় ত্রুটি দৃষ্ট হয় যে, তাহাতে কোন বিশ্বাসযোগ্য ইতিহাস লিখিত

হয় নাই, এজন্য প্রাচীন লেখকদের সময় নিরূপণ করা অসম্ভব বলিতে হয়। তাঁহাদের লিখিত বিষয় কোন্ সময়ে রচিত, তাহা জানিবার কোন উপায় নাই। কেবল ভাষার পরিবর্ত্তনের কাল ধরিয়া এক রকম অনুমান করিয়া লওয়া যাইতে পারে। এইরূপ গণনা অনুসারে অনুমান হয় যে, বেদলেখক কবিগণ খ্রীঃ পূঃ ১৫০০ হইতে ১০০০ বৎসরের মধ্যে বর্ত্তমান ছিলেন।

উপরোক্ত পঞ্চ সংহিতার নাম এই,—ঋক্, যজু (ইহার মধ্যে দুই সংহিতা আছে, তৈত্তিরীয় এবং বাজসনেয়ী), সাম, ও অথর্ব্ব। ঋক্‌সংহিতা বা ঋগ্বেদীয় গীতসংখ্যা ১০১৭। তাহা সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন ও প্রয়োজনীয়। ইহাতে ব্যক্তিরূপে বর্ণিত প্রাকৃতিক পদার্থসমূহের উদ্দেশে গীত ও প্রার্থনা করা হইয়াছে; তদ্দ্বারা কোন প্রকার ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় ক্রিয়াকলাপের সাধন হয় না।

অথর্ব্ব বেদ ঋগ্বেদের অনেক পরে লিখিত, তাহার কতকগুলি গীত ঋগ্বেদের পুনরুক্তিমাত্র, অন্য অনেকগুলি আদিম রচিত। ইহার রচনাকালে লোকদের মনে পৈশাচিক ক্ষমতা বিষয়ক কুসংস্কার ছিল, এমন বোধ হয়; কারণ ইহার শ্লোক ও যাহা ঋগ্বেদ হইতে গৃহীত হইয়াছে, তাহা ভৌতিক অমঙ্গল দূর করণার্থে মায়াবিদ্যার মন্ত্রস্বরূপে ব্যবহৃত হয়। বোধ হয়, এই কারণে অনেকে ইহাকে স্বতন্ত্র একটী সংহিতা গণনা করেন না।

যজুর্ব্বেদ বা যজ্ঞাদি বিষয়ক বেদের তৈত্তিরীয় ও বাজসনেয়ী সংহিতাদ্বয়ের অর্থ কৃষ্ণ ও শ্বেত যজুঃ; তাহাদের অধিকাংশ ঋগ্বেদ হইতে গৃহীত ও তাহা কেবল বলিদানের সময়ে ব্যবহৃত গীত ও শ্লোক। যখন বলিদানের পদ্ধতিতে নানা ক্রিয়াকলাপ যোগ হইয়া জটিলাকার ধারণ করিয়াছিল, তৎসময়ের উপযোগীরূপে সেগুলি প্রস্তুত হইয়াছে। যজুর্ব্বেদসঙ্গত বলিদানাদি যাহারা নির্ব্বাহ করিত, তাহাদিগকে অধ্বর্য্যু পুরোহিত বলা যায়।

সামবেদও ঋগ্বেদের উদ্ধৃত অংশ, তাহা সোমরস সম্বন্ধীয় ক্রিয়াকলাপ শিক্ষা দেয়; উদ্গাত্রী নামধারী পুরোহিতেরা তাহা

সমাধা করিত। ঋগ্বেদের নবম মণ্ডল হইতেই এই সোমলতার ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধীয় প্রশংসা ও উপদেশসমূহ উদ্ধৃত হইয়াছে।

বেদের দেবগণ কাহারা। তদ্বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলে অতি সহজে অনুভূত হয় যে, তৎকালে আর্য্যেরা আপনাদের সাংসারিক জীবনে যে সকল প্রাকৃতিক পদার্থ হইতে উপকার পাইতেন, তাহাদিগেরই উদ্দেশে স্তব ও প্রশংসার গীত গান করিয়াছিলেন, তাহাই কালক্রমে শ্লোকরূপে রচিত হইয়া প্রথমে মনোমধ্যে রক্ষিত, পরে ক্রমশঃ পুস্তকমধ্যে লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। প্রাকৃতিক শক্তিসমূহ তাঁহাদের দৃষ্টিতে অতি ক্ষমতাশালী বলিয়া বোধ হইত। আর্য্যদের নিবাসভূমি, গৃহ, পশুপাল, মনুষ্যাদি বায়ু, অগ্নি, জল, সূর্য্যকিরণ প্রভৃতি প্রাকৃতিক ব্যাপারের গুণে রক্ষিত, বর্দ্ধিত বা বিনষ্ট হইত, ইহার সত্যতা এখনও প্রত্যক্ষ হয়; কিন্তু বর্ত্তমানকালের লোকদের জ্ঞান অপেক্ষা তাহাদের জ্ঞান বিভিন্ন ছিল। সুতরাং এই সমস্ত প্রাকৃতিক ব্যাপারের কতক২ তাহাদের চক্ষে উপকারক, কতক২ বা অনিষ্টকারক দেবরূপে প্রতীয়মান হইয়াছিল। ঈদৃশ দেবগণ কার্য্যানুসারে কখন২ পরস্পরের প্রতিকূল বলিয়া বোধ হইত, ও শ্রেষ্ঠত্বলাভার্থে কখন২ বা পরস্পরের প্রতিযোগী বিবেচিত হইত। ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নয় যে, এমন প্রাকৃতিক শক্তিব্যূহ প্রথমে কবিতার রূপকে বর্ণিত ও কল্পনা-শক্তি-প্রভাবে ক্রমশঃ ব্যক্তিত্বপ্রাপ্ত এবং তন্মত ব্যক্তিত্ব, গুণ ও ক্ষমতায় ভূষিত হইয়া শেষে ভিন্ন ভিন্ন দেবরূপে পূজিত হইয়া আসিয়াছে। এইরূপে বায়ু, বৃষ্টি, ঝটিকা, সূর্য্য বা অগ্নি প্রভৃতি দেবরূপে পরিণত হইয়া উঠিয়াছিল।

খ্রীষ্টের পূর্ব্বে দ্বাদশ বা ত্রয়োদশ শতাব্দাতে ইহারাই আর্য্যদের উপাস্য দেবগণ ও আদিম বিশ্বাস ছিল। দেবরূপে পরিণত প্রথম শক্তিগণকে তাহারা আকাশমার্গে দেখিত। তাহাদিগকে অনিশ্চিত আকারের এক ব্যক্তি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিল; ক্রমশঃ এই একত্ববোধক শক্তি শাখাপ্রশাখাতে বিভক্ত ও নানা ব্যক্তিবোধক শক্তির উপর আরোপিত হইয়াছে। বেদে একমাত্র স্বয়ম্ভূ বিষয়ক অল্পসংখ্যক গীত পাওয়া যায়, আর তৎসমুদয়েও

এক ঈশ্বরবোধক ভাব অতি অস্পষ্ট ও প্রায় অনিশ্চিত। সম্ভবতঃ অতি প্রাচীন ঈশ্বরবোধক শব্দ 'দ্যায়স,' আকাশমণ্ডলকে বুঝাইত; তদুৎপন্ন 'দ্যায়স-পিতর' শব্দের অর্থ স্বর্গীয় পিতা। গ্রীক ও রোমকদের মধ্যে তৎসূচক শব্দ 'জিয়স' বা 'জুপিতর,' একই মূল হইতে উৎপন্ন। দ্যায়স দেবের সহিত ঘনিষ্ঠরূপে সম্বদ্ধ দেবী অদিতি, তদ্দ্বারা অসীম বিস্তৃত বিতান বুঝায়; পরে তাহাকেই দেবগণের মাতা বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে। এই কল্পনা আরও বিকাশপ্রাপ্ত হইলে পর, সুশোভিত আকাশ-মণ্ডলকে 'বরুণ' নামে অভিহিত করা হইয়াছে। বরুণের সহিত সংসৃষ্ট দেবতার নাম 'মিত্র' দিবসের দেবতা (পার্সিক-দের মিথ্র)।

আকাশমার্গের এই সকল অব্যক্তিবোধক দেবগণের জ্ঞান সাধারণ লোকদের মনে কোনরূপ নিশ্চিত বোধদান করে না, এরূপ প্রতীয়মান হইতে লাগিল; এজন্য কিছুকালের মধ্যে সুশোভিত আকাশমণ্ডলকে বিশেষ ক্ষমতা ও গুণধারী ব্যক্তি-রূপে ব্যক্ত করা হইয়াছে। প্রথমতঃ আকাশরাজ্যের জলময় অংশকে 'ইন্দ্র' বলা হইয়াছে; তিনি নিরন্তর আপনার শিশির ও বৃষ্টি প্রদান করিয়া পৃথিবীকে তৃপ্ত করেন। তাঁহার বিরোধী দেবতার নাম 'বৃত্র,' তিনি ইন্দ্রের প্রতিকূলাচরণ করিতে নির-ন্তর রত। দ্বিতীয় দেবের নাম বায়ু, মরুৎ নামেও খ্যাত। এই সময়ে স্বর্গীয় পবিত্র বরুণ সপ্ত দ্বিতীয় শ্রেণীস্থ দেবমধ্যে পরিগণিত হইয়াছেন, তাহাদিগকে 'আদিত্য' বলা হয়। পরে ইহাদের সংখ্যা দ্বাদশ হইয়াছে, তাহা সূর্য্যের ভিন্ন ভিন্ন মাসের বিভিন্ন আকৃতি বোধক। আরও পরবর্ত্তী কালে তাহারা জল-রাশির উপরে কর্ত্তৃত্ববিশিষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে, তাহারা বায়ুরাশি পরিত্যাগ করিয়া পৃথিবীর উপরে অবস্থান করে।

শিশির ও বৃষ্টির অধিপতি ইন্দ্রই সকলের মধ্যে প্রিয় ও পূজনীয় দেব বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। ইন্দ্র বেদের প্রধান দেবতা, যে সকল প্রার্থনা ও গীত ইন্দ্রের উদ্দেশে বেদে লিখিত হইয়াছে, তাহাদের সংখ্যাবাহুল্য দ্বারাও এই প্রাধান্য প্রতিপন্ন হয়।

উত্তাপ ব্যতীত কেবল বৃষ্টিতে কোন বিশেষ হিতসাধন হয় না, বিশেষতঃ যজ্ঞকার্য্যে উত্তাপের নিতান্ত প্রয়োজনীয়তা প্রযুক্ত অগ্নিকে দ্বিতীয় মহাদেব রূপে আর্য্যেরা কল্পনা করিয়াছে, (লাটিন ইগ্নিস); তদ্দ্বারা অগ্নির মূলকারণ সূর্য্যকে উপাসনা করিয়া থাকে। হিন্দুরা সূর্য্যকে আকাশমণ্ডলে বিরাজিত অগ্নির রূপান্তর ও ঐশ্বরিক পুরুষের প্রতিরূপ বোধ করে। হিন্দু কেন, সমস্ত পৌত্তলিক জাতিই প্রথমে সূর্য্যের পূজায় আসক্ত হইয়া তাহাকে সর্ব্বপ্রধান ও উপকারী দেবতা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে।

অতএব ইন্দ্র, অগ্নি ও সূর্য্য বেদের প্রধান ত্রিদেব বলিয়া পরিচিত।

প্রভাতের দেবীকে "ঊষা" বলা হয়, তিনি আকাশের দুহিতা। তদ্ভিন্ন "অশ্বী" নামে সূর্য্যের যমজ পুত্রদ্বয় চিরতরুণ বলিয়া বিবেচিত হন, তাঁহারা উষার প্রাক্কালবর্ত্তী দূত স্বরূপ। তাঁহাদিগকে 'দস্র,' স্বর্গীয় চিকিৎসক বা রোগনাশক নামেও অভিহিত করা হয়, তাঁহারা 'নাসত্য' নামেও খ্যাত হন।

পৃথিবীকেও বেদে সমস্ত প্রাণীর মাতা বলিয়া ঐশ্বরিক সম্ভ্রম প্রদান করে। দ্যায়স ও পৃথিবীর সংযোগে অন্য কতক গুলি দেবের উৎপত্তি হইয়াছে, বেদে তাহারও আভাস পাওয়া যায়। বায়ু, অগ্নি ও জলের ক্ষমতা মানবীয় শক্তির অতীত; কিন্তু পৃথিবী অনেকাংশে মানবের আয়ত্ত বলিয়া ক্রমশঃ পৃথিবীর প্রতি ঐশ্বরিক আদর প্রদর্শন কালক্রমে রহিত হইয়া আসিয়াছিল।

পূর্ব্ববর্ণিত দেবগণের সঙ্গে, মৃত লোকদের আত্মার দেবতা বলিয়া যমের নামও কল্পিত হইয়াছে, তিনি মৃত ব্যক্তিদের বিচারকর্ত্তা, তাঁহারও উদ্দেশে বেদে গীত ও মন্ত্র পাওয়া যায়।

দেশীয় টীকাকারগণ বেদে তেত্রিশ জন ভিন্ন ভিন্ন দেবতার নাম উল্লেখ করিয়া থাকেন। ঋগ্বেদেও এই সংখ্যার উল্লেখ আছে। তিন সংখ্যা হিন্দুদের নিকট পবিত্র সংখ্যা; বেদের ত্রিদেব প্রত্যেকে একাদশ রূপান্তর পরিগ্রহ করেন, তাহাতে ঐ ত্রিদেবই ৩৩ রূপান্তরে পরিণত হইয়াছেন। দেবতাদের বিভিন্ন

নাম প্রযুক্ত বিভিন্ন দেবতা বলিয়া বুঝা উচিত নহে। ইন্দ্র, বায়ু, মরুৎ ও রুদ্র প্রভৃতি পরস্পরের রূপান্তরে একই দেবতাকে প্রকাশ করে। পরে কালক্রমে এই সকল নাম এক ব্যক্তিতে আরোপিত হইয়াছে, ও তিনি শিব নামে খ্যাত হইয়াছেন। তদ্রূপ সূর্য্য, আদিত্য ইত্যাদি অন্য অনেক নাম দ্বারা ব্যক্ত হন, তাহাদের মধ্যে একটী নাম বিষ্ণু, তিনিই ত্রিমূর্ত্তির দ্বিতীয় ব্যক্তি হইয়া উঠিয়াছেন। তদ্রূপ অগ্নি বা উত্তাপ, জীবনের কারণস্বরূপ, যাঁহাকে ঋগ্বেদে 'যজ্ঞের পিতা' নামে অভিহিত করা হয়, উপাসকদের দৃষ্টিতে অন্য সকল অপেক্ষা তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব অধিক বলিয়া তাঁহার নাম পরমপুরুষ হইয়াছে, তিনিই ব্রহ্মা নামে ত্রিমূর্ত্তির প্রথম ব্যক্তি গণিত হইয়াছেন।

বেদের গীতগুলির মধ্যে (ঋক ১০; ১২৯) এমন অস্পষ্ট ইঙ্গিত দৃষ্ট হয় যে, সৃষ্টিকর্ত্তা স্ত্রী শক্তির কার্য্য ও সহকারিতা দ্বারা বিশ্বের উৎপত্তি করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন; এই ভাব হইতেই আকাশ ও পৃথিবীর কল্পিত বিবাহের কথা রচিত হইয়াছে; সাংখ্যদর্শনে প্রকৃতি ও পুরুষ ভাবে তাহার মীমাংসা করা হইয়াছে। এই কল্পনা আরও বিকসিত হইয়া উঠিলে পর প্রত্যেক দেবতার জন্য এক একটী সহকারিণী দেবী কল্পিত হইয়াছে, ও তাঁহারা দেবগণের সঙ্গে সমান ও কোন কোন স্থলে শ্রেষ্ঠ আদরপ্রাপ্ত হইয়াছেন। কিন্তু বেদমধ্যে এরূপ ভাব পূর্ণ বিকাশপ্রাপ্ত হয় নাই, পরন্তু, ইন্দ্রাণী, অগ্নানী, অশ্বিনী, বরুণানী ইত্যাদি প্রধান দেবগণের স্ত্রীগণ পূজনীয়া বলিয়া স্ব স্ব স্বামীগণের সহিত আসনপ্রাপ্ত হইতে পারেন নাই; এমন কি, লক্ষ্মী ও সরস্বতীর নাম উল্লিখিত থাকিলেও তাঁহারা পূজার অধিকারিণী হইতে পারেন নাই।

বেদের একেশ্বরবাদ প্রতিপাদকগণ ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ১২১ তি সংখ্যক সংগীত তাহার যুক্তিযুক্ত প্রমাণ বলিয়া বিবেচনা করেন। উক্ত শ্লোকটীর অনুবাদ এইরূপ. —

বলিদানে আমরা কোন্ দেবের পূজা করি?
তাঁহারই বন্দনা করি, যে স্বর্ণময় কুমার আদিতে—

উদিত হইয়াছেন, যিনি প্রভুরূপে জন্মিয়াছেন—
বর্ত্তমান সকল বস্তুর এক মাত্র প্রভু—যিনি পৃথিবীর
সৃষ্টি করিয়াছেন, আকাশ গঠন করিয়াছেন, যিনি জীবন-
দাতা,

যিনি শক্তিদাতা, দেবগণ যাঁহার আদেশ আদর করেন,
অমরত্ব যাঁহার আবরণ,
যাঁহার ছায়া মৃত্যু; যিনি নিজ পরাক্রমে
শ্বাসধারী, নিদ্রিত, জাগরিত বিশ্ব রাজ্যের রাজা।

* * * *

যিনি দেবগণের শ্বাস ও জীবন,

* * * *

দেবগণের উপরে একমাত্র ঈশ্বর।

কিন্তু হিন্দু-একেশ্বরবাদ ক্রমশঃ অদ্বৈতবাদে পরিণত হই-য়াছে, তাহাও ঋগ্বেদ হইতে সপ্রমাণ হয়। সুপ্রসিদ্ধ পুরুষ সূক্ত (ঋক্ ১০; ৯০, ইহা পরবর্ত্তী কালের প্রক্ষিপ্ত বলিয়া প্রমাণীকৃত হইয়াছে) দ্বারা জানা যায় যে, হিন্দু-একেশ্বরবাদ কিরূপে অদ্বৈতবাদের দিকে অগ্রসর হইয়াছে, তাহাতে যজ্ঞের অভিপ্রায় ও জাতিভেদের বীজমন্ত্রও সন্নিবেশিত আছে। ইংরাজি অনুবাদ হইতে তাহা নিম্নে লিখিত হইল।

সহস্র শিরঃ সহস্রাক্ষ সহস্র চরণধারী আত্মা
চারিদিকে প্রত্যেক পার্শ্বে পৃথিবীকে আবরণ করিয়া আছেন,
অথচ বিঘৎ পরিমিত স্থানও পূর্ণ করেন না।
তিনি স্বয়ংই এই বিশাল বিশ্ব,
অতীত, বর্ত্তমান, ভবিষ্যৎস্থিত সকল বস্তুই তিনি,
অমরত্বের প্রভু।
সমস্ত সৃষ্ট প্রাণী তাঁহার চতুর্থাংশ, তিন চতুর্থাংশ
অমর আকাশ মধ্যে স্থিত।

* * * *

পুরুষকে হব্য স্বরূপে তাহারা যজ্ঞ সাধন করিয়াছিল।

তাঁহাকে বিভক্ত করিতে গিয়া কিরূপে তাঁহাকে কর্ত্তন
করে?
তাঁহার মুখ কি? বাহুদ্বয় বা কি? তাঁহার উরুদেশ ও পদ
কি?
ব্রাহ্মণ তাঁহার মুখ? রাজকীয় সৈনিক
তাঁহার বাহুতে নির্ম্মিত, কৃষক উরুদেশ,
সেবক শূদ্র পদ হইতে নির্গত হইয়াছে।

বেদের গীত ও মন্ত্র সকল যেরূপ উচ্চ ভাবযুক্ত বলিয়া সাধারণতঃ বিবেচিত হইয়া থাকে, এমন উন্নত চিন্তা তন্মধ্যে কিছুই নাই। অধিকাংশ হিন্দুগণ সংহিতাগুলির, বিশেষতঃ ঋক্‌বেদের সম্বন্ধে বলিয়া থাকে, তাহা শ্রেষ্ঠ, ও মহান ও ঐশ্বরিক ভাবে পূর্ণ। কিন্তু তৎসমুদয় একত্র বিবেচনা করিয়া দেখিলে তাহা বালকের মনের উচ্ছ্বাস ব্যতীত আর কিছুই বোধ হয় না। বর্ত্তমান হিন্দু সমাজ যে সকল আপত্তিজনক কার্য্য, কুসংস্কার ও মতের বশীভূত ও যাহা বেদের জ্ঞানাভাব প্রযুক্ত বেদের অনুমোদিত বলিয়া প্রায় সাধারণে বিশ্বাস করে, বেদে তৎসমুদয় কুসংস্কার ও ধর্ম্মের কোন ভিত্তিমূল পাওয়া যায় না। ফলতঃ বেদে আত্মার জন্মান্তর পরিগ্রহ সম্বন্ধে কোন উল্লেখও নাই; কিন্তু তাহা অনন্তর জাত হিন্দু-ধর্ম্ম-বিশ্বাসের প্রধান অঙ্গ বলিয়া গৃহীত হইয়াছে; তদ্রূপ বিধবাবিবাহের অনৌচিত্য, বাল্য বিবাহের আবশ্যকতা, জাতিভেদরূপ দুঃসহ শৃঙ্খলের আদেশ, বিদেশযাত্রা নিষেধ ইত্যাদির সম্বন্ধে বেদ কিছুমাত্র অনুমোদন করে না। যে সকল প্রাকৃতিক শক্তি বেদমধ্যে আহূত ও স্তুত হইয়াছে, তাহা ক্রমশঃ কাষ্ঠ, প্রস্তর ও ধাতুদ্রব্যে মূর্ত্তিত হইয়া সাধারণের পূজার্থে প্রদর্শিত হয়, বেদে ইহার কোন আদেশ বা ইঙ্গিত পাওয়া যায় না। বরঞ্চ ইহার বিরুদ্ধে অতি সুস্পষ্টরূপে প্রমাণ হয় যে, বৈদিক কালে কোনরূপ ঠাকুর, মূর্ত্তি বা মন্দির ছিল না। বৈদিক কালের হিন্দুদের মধ্যে বলিদানপ্রথা প্রচলিত ছিল. তাহারা গো, অশ্ব, প্রভৃতি জীবগণকে বলিদান করিত, তাহাদের মাংস কতক হোম

রূপে দগ্ধ ও অবশিষ্ট আপনারা ভোজন করিত। বর্ত্তমান হিন্দুগণ বৈদিক হিন্দুগণ অপেক্ষা ধর্ম্ম ও সামাজিক নীতি সম্বন্ধে অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছে। তাহারা যাহাকে প্রত্যাদিষ্ট শাস্ত্র বলিয়া মুখে পূজা করিয়া থাকে, ব্যবহারে তাহা পদতলে মর্দ্দন করিয়া স্বেচ্ছাচারীরূপে আপনাদের মস্তিষ্কনিঃসৃত কল্পনার অনুসারী হইয়াছে।

ব্রাহ্মণ ও যজ্ঞ।

বেদের দ্বিতীয় অংশকে ব্রাহ্মণ বলে। ব্রাহ্মণদের আধিপত্য বৃদ্ধি, যজ্ঞকার্য্যের বিশেষরূপ বিস্তৃতি ও নানা ক্রিয়াকলাপে বিশ্বাস বাহুল্য প্রযুক্ত বেদের মন্ত্র-অংশ অপেক্ষা এই ব্রাহ্মণাংশ অধিকতর প্রয়োজনীয় হইয়াছে।

নামেতেই বুঝিতে পারা যায় যে, এই অংশ ব্রাহ্মণদের ব্যবহার্য্য, ফলতঃ যজ্ঞকার্য্যের জটিল ক্রিয়াকলাপের ব্যবহার তন্মধ্যে উপদিষ্ট হইয়াছে। মন্ত্রসমূহ যেমন ঋষিবর্গকে প্রকৃত পূজক বলিয়া নির্দ্দেশ করে, তাদৃশ ব্রাহ্মণদিগের সাধনীয় ক্রিয়াকলাপের মূল বিষয়গুলি ক্রমবিকাশপ্রাপ্ত অবস্থায় ব্রাহ্মণাংশে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, তাহা প্রতীয়মান হয়। মন্ত্রের কালে আর্য্যদের বাসস্থান পাঞ্জাব ও ব্রাহ্মণের কালে তাহাদের নিবাসভূমি উত্তর পশ্চিম প্রদেশ বলিয়া প্রতীত হয়।

প্রত্যেক সংহিতা বা মন্ত্রসমষ্টির স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ব্রাহ্মণ আছে। ঋগ্বেদের জন্য ঐতরীয় ও কৌশিতকী ব্রাহ্মণ (সাঙ্খ্যায়ন)। যজুর্ব্বেদের দুই সংহিতার জন্য তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ ও সতপথব্রাহ্মণ। এই শেষোক্তটী বাজসনেয়ী সংহিতার উপযোগী, সর্ব্বাপেক্ষা পূর্ণাবয়বপ্রাপ্ত। সামবেদের জন্য আট ব্রাহ্মণের মধ্যে প্রসিদ্ধ দুইটী; প্রৌঢ়, (পঞ্চবিংশ, তাণ্ড্য) ও ষড়বিংশ। অথর্ব্ববেদের জন্য গোপথব্রাহ্মণ।

এই সকল পুস্তকের বিষয়সমূহ হিন্দু পুরোহিতদের উপযোগী অকিঞ্চিৎকর মূর্খতা ভি... আর কিছুই নয়; কিন্তু

ব্রাহ্মণত্বের উৎপত্তি, বৃদ্ধি ও যজ্ঞকার্য্যের কিরূপ বিকাসপ্রাপ্তি হইয়াছিল, তৎসমুদয় জানিবার পক্ষে বড় আবশ্যকীয় বোধ হয়।

ঋগ্বেদের পুরুষসূক্তে উল্লিখিত চারি শ্রেণীর জাতিবিভাগ এই কালের পূর্ব্বেই স্থাপিত হইয়াছিল; কিন্তু মনুর ব্যবস্থার নিয়মাদি তখনও প্রচলিত হয় নাই। মন্ত্রাংশ অপেক্ষা ব্রাহ্মণাংশের কালে পরকালের অস্তিত্বের বিশ্বাস দৃঢ়ীভূত হইয়াছিল। কিন্তু হিন্দুধর্ম্মের জন্মান্তরমত তখনও বিকাসপ্রাপ্ত হয় নাই, সতপথব্রাহ্মণে তাহার ইঙ্গিতমাত্র পাওয়া যায়।

সতপথব্রাহ্মণে দেবগণের সম্বন্ধে বলে যে, তাঁহারা পূর্ব্বে মৃত্যুশীল ছিলেন, কিন্তু বলিদান ও তপস্যার গুণে তাঁহারা মহাপুরুষের নিকট হইতে অমরত্বলাভ করিয়াছেন। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণেও উল্লেখ আছে, "বলিদানের গুণে দেবগণ স্বর্গলাভ করিয়াছেন।"

ঋগ্বেদের পুরুষসূক্তে এমন একটী চমৎকার উক্তি পাওয়া যায়, যাহাতে দেবগণ, সৃষ্টিকর্তার সমতুল্য ব্যক্তি আদিপুরুষকে বলিদান করেন বলিয়া উল্লেখ আছে; যথা, 'সমস্ত সৃষ্টির প্রভু (প্রজাপতি) আপনাকে দেবগণের জন্য বলিরূপে উৎসর্গ করিলেন।' সতপথব্রাহ্মণেও এই আদিপুরুষের যজ্ঞের উল্লেখ পাওয়া যায়।

জগতের পাপের জন্য ঈশ্বরের সমতুল্য ব্যক্তি, ঈশ্বরের পুত্র যে, আপনাকে বলি হইতে দিবেন, এই আদিম শ্রুতির চিহ্নরূপে হিন্দুদের বলিদান প্রথাতে তাহার নিদর্শন পাওয়া যায়, ইহা বাস্তবিক অতি বিস্ময়কর বিষয় বলিতে হয়।

পূর্ব্বোক্ত পুরুষ শব্দ নরবলির প্রতি লক্ষ্য করিয়া উল্লেখ হইয়াছে কি না, তদ্বিষয়ে সন্দেহ আছে, ঘটনাক্রমে তৎকালে নিষ্ঠুর নরবলিও প্রদত্ত হইত, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায়। কিন্তু ইহার অনেক পরে তাহা যে রক্তপিপাসু দেবী কালীর উদ্দেশে প্রদত্ত হইত, এবং এখনও কোন কোন স্থানে অতি গোপনভাবে হইয়া থাকে, তাহার নিশ্চিত প্রমাণ আছে। ঐতরেয়ব্রাহ্মণে নরবলির উল্লেখ পাওয়া যায়, কিন্তু ব্রাহ্মণেরা ক্রমে এরূপ বলিদান

অসহনীয় জ্ঞান করিয়াছিল, তাহাও বুঝা যায়। কোন কোন স্থল হইতে নরবলির বিষয় প্রমাণ পাওয়া যায়, কিন্তু ব্রাহ্মণেরা সেই বীভৎস রীতি রহিত করিয়া তাহার স্থানে পশুবলিদানের প্রথা প্রচলিত করিয়াছিল। একে একে অশ্ব, বৃষ, মেষ ও ছাগ বলিদানের প্রথা প্রচলিত হইয়াছিল। কিন্তু শ্বেত যজুর্ব্বেদের বাজসনেয়ী সংহিতায় ২১০ প্রকার জীববলিদানের উল্লেখ আছে। বৈদিক কালে গাভী (অনুস্তারণী) বলিদান করণের প্রথা প্রচলিত ছিল। ঋগ্বেদে অশ্বমেধ যজ্ঞ অতি প্রয়োজনীয় বলিদানপ্রথা বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। ১ম মণ্ডলের ১৬২ ও ১৬৩ গীত এই বলিদানে ব্যবহৃত হইত। সর্ব্বপ্রকার জীববলিদানের মধ্যে অশ্বমেধ শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণিত হইত।

বলিদানের মুখ্য উদ্দেশ্য দেবগণের উদ্দেশে খাদ্য ও পেয় উৎসর্গ করা; তাহা অগ্নিতে ঘৃতাহুতি প্রদান করিয়া ও সোমরস ঢালিয়া উৎসৃষ্ট করা হইত। তাহারা বুঝিত, এইরূপ কার্য্যদ্বারা দেবগণের, বিশেষরূপে ইন্দ্রের পুষ্টিসাধন ও তৃপ্তিলাভ হয়। এইরূপে উৎসৃষ্ট দ্রব্য দেবগণের জন্য প্রয়োজনীয় বোধ করিয়া হিন্দুগণ বলিদান ও আহুতি প্রদান করিয়া থাকে। বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে, বলিদানে দেবগণের পুষ্টিসাধন হয়।

কিন্তু বলিদানদ্বারা যে, প্রায়শ্চিত্তসাধন করা হয়, এ ভাবটিও বৈদিক কালে ক্রমশঃ প্রস্ফুট হইয়াছিল। হব্যপশু নিগূঢ়ভাবে বলিদাতা ব্যক্তির স্বরূপ বলিয়া গণ্য হইত, তাহার বলিকরণ পাপের মূল্য ও পাপ দূরীকরণের উপায় বলিয়া বিবেচিত হইত। তাণ্ড্য ব্রাহ্মণে পাঠ করি:—

"অগ্নিতে উৎসৃষ্ট, হে বলীকৃত পশুর অঙ্গ, তুমি দেবগণের, মনুষ্যদের, ও আমাদের কৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত; আমরা নিদ্রাবস্থায় বা জাগ্রতাবস্থায়, জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে যে কোন পাপ করিয়াছি, তুমি তৎসমুদয়ের প্রায়শ্চিত্ত।"

বলিদানের আরও একটী উদ্দেশ্য ছিল; তদ্দ্বারা বলিদাতা অমানুষিক শক্তির অধিকারী ও দেবগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন অভিলষিত বরের যোগ্য হইতে পারিত। এই বর

তপস্যালব্ধও ছিল; কিন্তু যে সকল সম্পত্তিশালী ব্যক্তি অনেক অর্থব্যয় স্বীকার ও বহুসংখ্যক যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণের ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে পারিতেন, তাঁহারা এতদর্থে বিশেষ বিশেষ বলিদানের (জ্যোতিষ্টোম, অগ্নিষ্টোম, বাজপেয় প্রভৃতি) উপর অধিক নির্ভর করিতেন। একশত অশ্বমেধযজ্ঞ করিতে পারিলে যজ্ঞকর্ত্তা অতি পরাক্রান্ত দেবরূপে উন্নীত হইতে পারে, এমন কি, ইন্দ্রকে পদচ্যুত করিয়া স্বর্গের রাজত্বপদের অধিকারী হয়। কিন্তু যে দেবগণের পুষ্টির জন্য যজ্ঞসাধন হইত, তাঁহারাই আবার যজ্ঞকর্ত্তা নরের প্রতি ঈর্ষান্বিত হইয়া তাহার যজ্ঞে বাধা দিতেন। এইরূপ বাধা সত্ত্বেও বলিদান ও বলিদাতার সংখ্যা ভারতবর্ষে অতিশয় বর্দ্ধিত হইয়াছিল।

হিন্দুধর্ম্মের ব্রাহ্মণপ্রচলিত কালের (খ্রীঃ পূঃ ৮০০—৫০০) মধ্যে জীববলিদান ও আহুতিদানের প্রথা বাস্তবিকই ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের প্রধান ও সার বিষয় ছিল। প্রতিদিন সহস্র সহস্র জীবের প্রাণনাশ হইত। তেমনি ব্রাহ্মণদিগের উপজীবিকার দ্বার অতিশয় সুপ্রশস্ত হইয়াছিল; কিন্তু অসংখ্য জীবের বলিদানে লোকদের প্রাণ বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল।

অনন্তর খ্রীষ্টের পঞ্চ শতাব্দী পূর্ব্বে এই প্রণালীর সংশোধক বুদ্ধের আবির্ভাব হয়। তাঁহার সমকালে ও পূর্ব্বে এমন কতকগুলি বিজ্ঞ ব্রাহ্মণও বর্ত্তমান ছিলেন, যাঁহারা ভিন্ন ভিন্ন রূপ শিক্ষা প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। জীব-বলিদানদ্বারা প্রায়শ্চিত্তসাধন অসম্ভব, আত্মার জন্মান্তরপরিগ্রহ, প্রত্যেক ব্যক্তি স্বকৃত পাপের জন্য, হয় ইহজীবনে, না হয়, পরজীবনে স্বয়ং দণ্ডভোগ করিতে বাধ্য; সর্ব্বজীবের সমানত্ব, জীবাত্মা ও পরমাত্মার সমানত্ব ও জাতিভেদ-প্রথার অন্যায্যতা প্রভৃতি, তাঁহারা সাহস পূর্ব্বক প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। এই নূতন শিক্ষা সহস্র সহস্র লোকের কর্ণে মধুর বোধ হইতে লাগিল, তাহারা সানন্দে তাহা গ্রাহ্য করিল। এই প্রচারকেরা প্রায়শ্চিত্তও বলিদান সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করিতেন; তাঁহাদের মতে প্রত্যেক মনুষ্য যখন ঈশ্বরের অংশ, তখন আর প্রায়শ্চিত্তদ্বারা

তাঁহার সহিত সম্মিলনের প্রয়োজন থাকে না। এইরূপে বলি-দানপ্রথা হিন্দুদের মধ্যে ক্রমশঃ সঙ্কীর্ণ হইয়া আসিয়াছে।

উপনিষদ।

বেদের তৃতীয় অংশের নাম উপনিষদ। বর্ত্তমান শিক্ষিত হিন্দুদের কাছে বেদের মন্ত্র বা ব্রাহ্মণাংশ অপেক্ষা উপনিষদের শিক্ষাই সমধিক আদরণীয়। ভারতীয়েরা বেদকে দুই প্রধান ভাগে বিভাগ করে; ১ম, কর্ম্মকাণ্ড, ইহাতে মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ অনু-যায়ী প্রার্থনা, বলিদান, তপস্যা প্রভৃতি ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধীয় ব্যবস্থাদি সঙ্গত কার্য্য বুঝায়। ২য়, জ্ঞানকাণ্ড, যে অল্পসংখ্যক লোকে সত্যমত সম্বন্ধীয় বিষয় বুঝিতে সক্ষম, তাহাদেরই উপ-যোগী শিক্ষা তন্মধ্যে সংগৃহীত হইয়াছে; ইহাই উপনিষদের বিষয়।

উপনিষদ অদ্বৈতবাদের জটিল শিক্ষাপ্রদান করে। আরণ্য-কের সহিত সংযুক্ত অধ্যায়গুলির নাম উপনিষদ। তাহাতে বিশ্বের উৎপত্তি, দেবত্বের ও মানবাত্মার প্রকৃতি, আত্মা ও জড়ের সংযোগ ইত্যাদি গুরুতর বিষয়ের তত্ত্বনির্ণয় করিতে চেষ্টা করা হইয়াছে।

প্রধান উপনিষদ দশটীর নাম এই এই:—

ইশ্যা, (বাজসনেয়ী সংহিতার চত্বারিংশ অধ্যায়ের সঙ্গে সংসৃষ্ট); কেনা এবং ছান্দোগ্য (সামবেদের); কঠ, প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডুক্য (অথর্ব্ববেদের); বৃহদারণ্যক (সতপথব্রাহ্মণের সহিত সংসৃষ্ট); ঐতরেয় (ঋগ্বেদের অন্তর্নিবিষ্ট); তৈত্তিরীয় (কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদের অন্তর্গত)।

ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের অদ্বৈতবাদ শিক্ষার উদাহরণস্বরূপে নিম্নে ইশ্যা উপনিষদের একখণ্ডের অনুবাদ প্রদত্ত হইল:—

"যে কিছু বিশ্বমধ্যে বিদ্যমান আছে, তৎসমস্তই মহান ঈশ্বরকর্ত্তৃক যেন বস্ত্রের ন্যায় পরিবেষ্টিত রহিয়াছে। বিশ্বমধ্যে

একমাত্র পুরুষ আছেন, তিনি অচল, অথচ মন অপেক্ষা দ্রুতগতিতে বিচরণ করেন। যদিও ইন্দ্রিয়াতীত, তথাপি ইন্দ্রিয়গণ দেববৎ হইয়া তাঁহাকে লাভ করিতে সচেষ্ট। তিনি স্থির, অথচ দ্রুতগতিতে সকলে তাঁহার কাছে পরাস্ত। বায়ুবৎ তিনি সকলের জীবনী শক্তির পোষণ করেন। সচল না হইয়াও চলিতেছেন; দূরে থাকিয়াও নিকটবর্ত্তী, এই বিশ্বেরই অন্তরে আছেন। সজীব প্রাণীমাত্রই তিনি ও তাঁহাতে অবস্থিত বলিয়া যিনি দেখেন,—বিশ্বব্যাপী আত্মা, সর্ব্বময় বলিয়া যিনি দেখেন, তিনি কোন জীবকেই তুচ্ছজ্ঞান করেন না।"

দর্শনশাস্ত্র।

নিম্নে আমরা দর্শনশাস্ত্র প্রণালীর সংক্ষেপে আলোচনা করিতেছি, সেগুলি শ্রুতি বা প্রত্যাদিষ্ট শাস্ত্র বলিয়া পরিগণিত নহে। তাহাদিগকে সত্যশিক্ষার ষট্‌শাস্ত্র বা ষড়্‌দর্শন বলা হয়। খ্রীষ্টের পঞ্চম শতাব্দীর অগ্রে, বর্ত্তমান মনুসংহিতা প্রণীত হইবার পূর্ব্বে সেগুলি বিভিন্ন দর্শনরূপে গঠিত হয় নাই। তাহাদের নাম নিম্নে লিখিত হইতেছে।

১। ন্যায়, গৌতম-প্রণীত।

২। বৈশেষিক, কণাদ-প্রণীত।

৩। সাংখ্য, কপিল-প্রণীত।

৪। যোগ, পতঞ্জলি-প্রণীত।

৫। মীমাংসা, জৈমিনি-প্রণীত।

৬। বেদান্ত, বদরায়ণ বা ব্যাস-প্রণীত।

দর্শনের মূলতত্ত্বগুলি সূত্রাকারে লিখিত হইয়াছিল, পরে তাহাই বিস্তৃত করা হইয়াছে। কোন্ সময়ে এই সকল দর্শনশাস্ত্র প্রণীত হইয়াছিল, তাহা নির্ণয় করা দুরূহ ব্যাপার, অথবা কালানুসারে তাহাদিগকে বিন্যস্ত করাও যায় না। কোন কোন দর্শনে দ্বৈতবাদ শিক্ষা দেয়, অর্থাৎ দুই অনন্তবর্ত্তমান শক্তি বা

মূল নির্দ্দেশ করে। কোনটী অদ্বৈতবাদ অর্থাৎ সর্ব্বপদার্থের একত্ব শিক্ষা দেয়। ছয় দর্শন তিন শ্রেণীতেও বিভক্ত করা যাইতে পারে। ন্যায় ও বৈশেষিকের মধ্যে অল্পই পার্থক্য দৃষ্ট হয়। সাংখ্য ও যোগ এক শ্রেণীস্থ বলিয়া ধরা যাইতে পারে; ফলতঃ সাংখ্য নিরীশ্বরবাদ ও যোগ সেশ্বরবাদ সাংখ্য বলিয়া প্রকাশ করা যাইতে পারে। পঞ্চম ও ষষ্ঠ দর্শনকে হিন্দুরা যথাক্রমে পূর্ব্ব-মীমাংসা ও উত্তর-মীমাংসা বলিয়া থাকেন; পূর্ব্ব-মীমাংসায় ব্রাহ্মণাংশের ক্রিয়াকলাপের বিচার ও উত্তর-মীমাংসায় উপনিষদ-সম্ভূত অদ্বৈতবাদের অবতারণা ও সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। কিন্তু মীমাংসা ও বেদান্তমধ্যে সদৃশ শিক্ষা প্রায় নাই, তবে তাহা-দিগকে কিরূপে একশ্রেণীস্থ দর্শন জ্ঞান করা হয়, তাহা বুঝা যায় না।

খ্রীষ্টের পূর্ব্বে পঞ্চম বা ষষ্ঠ শতাব্দী হইতে তাৎকালিক সভ্য জগতের প্রায় সর্ব্বত্রই চিন্তাশীল মনুষ্যদের মনে এক বিশেষ শক্তির কার্য্য প্রত্যক্ষ হইয়াছিল। তৎকালে ভারতে বুদ্ধের আবির্ভাব হয়, গ্রীসদেশে পিথাগোরসের শিষ্যমণ্ডলীর অনেকে এই শক্তি-প্রণোদিত হইয়া কার্য্যক্ষেত্রে ছিলেন, পারস্যে জোর-য়াস্তর, চীনে কন্‌ফুসিও প্রভৃতি সকলে প্রায় একই সময়ে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। তাদৃশ চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ এই এই প্রকার প্রশ্ন উত্থাপন করিতেন,—আমি কে? আমি কোথা হইতে আসিয়াছি? আমি কোথায় যাইতেছি? আমার চৈতন্য কিরূপে ব্যক্ত করিব? আমার শারীরিক ও আত্মিক প্রকৃতির সম্বন্ধ কিরূপ? আমার বাসস্থান এই যে জগৎ, ইহা কি? প্রকৃতি ও সৃষ্টি-প্রক্রিয়ার নিগূঢ় তত্ত্ব কিরূপে নির্ণয় করিব? ইহা কি কোন সুবিজ্ঞ, পরমদয়াময়, সর্ব্বশক্তিমান ব্যক্তি অসত্তা হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন, অথবা কোন অনন্তবীজ হইতে আপনাপনি সমুদ্ভূত হইয়াছে? কিম্বা নিত্যবিদ্যমান পরমাণুপুঞ্জের দৈব-সংঘটন প্রযুক্তই কি ইহা এরূপ অস্তিত্বপ্রাপ্ত হইয়াছে? যদি ইহা অনন্তজ্ঞানীপুরুষের কার্য্য, তবে ইহার বিরুদ্ধ, অসম অবস্থার কারণ কিরূপে নির্ণয় করিব? ইহাতে ভাল ও মন্দ

সুখ ও দুঃখ বিদ্যমান রহিয়াছে কেন? সৃষ্টিকর্ত্তার কি কোন আকৃতি আছে, না তিনি নিরাকার? তিনি সগুণ কি নির্গুণ?

প্রাচীন আর্য্য কবিগণের বেদোক্ত গীত ও প্রার্থনাসমূহে এই সকল প্রশ্নের কোন সদুত্তর নাই; তাহা 'জ্ঞান' শব্দে বাচ্য হইলেও এই সকল বিষযেব কোনই জ্ঞান প্রদান কবে না; কিন্তু প্রকৃতির অনিশ্চিত জ্ঞানালোকের সাহায্যে মনুষ্য-হৃদয়েব প্রথম অনুসন্ধানের ফল ব্যতীত তাহা আব কিছুই নয়। ক্রিয়াকলাপ-পূরিত ব্রাহ্মণও ঐ সকল গূঢ়প্রশ্নের কোন মীমাংসা করে নাই। তৎসমুদয় কেবল যাগ-যজ্ঞের আবশ্যকতা প্রতিপন্ন করিতে গিয়া নানা নিস্ফল কুসংস্কারের অবতাবণা করিযাছে ও এক শ্রেণী মানবকে দেবতা ও অপব সাধাবণ মনুষ্যকুলের মধ্যস্থ স্বরূপে দাঁড় কবাইয়া তাহাবই গৌবব বর্দ্ধন কবিযাছে। কিন্তু ঐ সকল মানব-চিন্তা-প্রসূত প্রশ্নেব মীমাংসার্থে চিন্তাশীল ব্যক্তি-বর্গের মন সর্ব্বদাই চিন্তা ও কল্পনামার্গ অবলম্বন কবিযা ধাবিত হইযাছে। তাহা শ্রুতি বা কল্পিত ক্রিযা-পদ্ধতিতে তৃপ্ত থাকিতে পারে নাই। প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তি নিজ জ্ঞানেব সাহায্যে জীবনেব সমস্যা-রূপ প্রশ্নগুলিব মীমাংসা কবিতে সচেষ্ট হইতে লাগিল। এইরূপে গূঢ় তত্ত্বপূর্ণ, মানব-চিন্তা-প্রসূত উপনিষদগুলি বিরচিত হইযাছে। তথাপি তাহাদেব অধিকাংশ প্রত্যাদেশেব (বেদ) বিরুদ্ধ নহে, তাহাব সহকাবীরূপে বিবচিত হয। সম্ভবতঃ ব্রাহ্মণেতব জাতিগণকে উপনিষদ পাঠ হইতে বঞ্চিত কবণার্থেই তাহাদিগকেও বেদ বলিয়া ধরা হই-য়াছে। কোন ব্রাহ্মণ বেদের প্রভুত্ব বক্ষা কবিযা যাহা কিছু লিখিয়াছেন, তাহা বেদের বিষয় বলিয়া গ্রাহ্য হইয়াছে, তাঁহার স্বাধীন চিন্তাস্রোত শাস্ত্রবিরুদ্ধ বলিযা দোষীকৃত হয় নাই। কিন্তু যখন বুদ্ধের ন্যায কোন স্বাধীন-চেতা ব্যক্তি ব্রাহ্মণ ভিন্ন অপর শ্রেণীস্থ ব্যক্তিকেও দর্শনশাস্ত্রের শিক্ষকস্বরূপে দেখাইয়া স্বীয় স্বাধীন চিন্তা প্রচার করিয়াছেন ও ব্রাহ্মণের চিরদাসত্ব হইতে মুক্তি পাইবার উপায় দেখাইয়াছেন, তখনই তাঁহাকে পাষণ্ড, ভ্রষ্ট, নাস্তিক ইত্যাদি তীব্র কটূক্তিদ্বারা বিদ্ধ করা হইয়াছে।

এই স্বাধীন-চেতা ব্যক্তিগণের সংখ্যা শীঘ্রই ভারতবর্ষে বহুল হইয়া উঠিল। হিন্দুধর্ম্মে ঘাতপ্রতিঘাত চলিতে লাগিল। বৌদ্ধ ধর্ম্মের এত বিস্তৃতির কারণ ভারতের জাতিভেদ ও ব্রাহ্মণদের অত্যাচার ব্যতীত আর কিছুই নয়। সুদীপ্তমনা গৌতমের সমতা প্রচার শুনিয়া ব্যক্তিগণ অতি আনন্দসহকারে তাহা গ্রাহ্য করিতে লাগিল।

কিন্তু বেদ ও ব্রাহ্মণদের প্রাধান্যাধীন গোঁড়া দার্শনিকগণ সরলতার মস্তকে পদাঘাত পূর্ব্বক প্রকৃত শিক্ষাতে বহুদূরে গিয়াও মুখে বেদের প্রাধান্য স্বীকার করে; তথাপি ষড়্‌দর্শনের বৈশেষিক ও সাংখ্য দর্শনে আত্মা ও জড়ের অনন্ত পার্থক্য শিক্ষা দিয়া বৌদ্ধ ধর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে ধাবিত হইয়া তাহার ন্যায় শ্রেষ্ঠ, প্রজ্ঞাবান সৃষ্টিকর্ত্তার অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়াছে।

যে সকল দার্শনিক চিন্তা উপনিষদ হইতে উৎপন্ন ও বর্ত্তমান শিক্ষিত হিন্দুদের নিকট সাদরে গৃহীত হইয়া থাকে এবং যাহা মনুর ব্যবস্থাপুস্তকেও দৃষ্ট হয়, আমরা তন্মধ্যে কতকগুলি নিম্নে লিখিতেছি।

১। আত্মা চিরস্থায়ী—অনাদি ও অনন্ত।

দুই প্রকার আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়:—

(১) শ্রেষ্ঠ বিশ্বব্যাপী আত্মা, যাঁহাকে পরমাত্মা, ব্রহ্ম, পুরুষ প্রভৃতি নামে ব্যক্ত করা হয়।

(২) সচেতন প্রাণীদিগের পৃথক পৃথক আত্মা, যাহা জীবাত্মা নামে কথিত। কোন বস্তুকে চিরস্থায়ী বলিলে তাহার আরম্ভ থাকিতে পারে না; আরম্ভ ধরিলে তাহার অবশ্যই অন্ত থাকিবে; অতএব বিশ্বব্যাপী অথবা ব্যক্তিবিশেষের আত্মা নির্ব্বিশেষে অনাদি ও অনন্ত, তাহা পূর্ব্বে ছিল ও পরেও থাকিবে।

২। জড়পদার্থ (matter) চিরস্থায়ী, যাহার সংযোগে ও বিয়োগে বিশ্বরাজ্যের বিকাস হইয়াছে।

৩। আত্মা চিন্তা ও জ্ঞানময়, তাহা যখন বাহ্য পদার্থের সহিত সংস্পৃষ্ট, শরীর ও মনের সহিত সংযুক্ত হয়, তখনই কার্য্য-

ক্ষম, ইচ্ছাবিশিষ্ট, চিন্তাশীল, সচেতন, অনুভূতিবিশিষ্ট ও জাগ্রতাবস্থ হইয়া থাকে।

৪। শরীর ও আত্মার সংযোগই জীবাত্মার বন্ধন ও দুঃখের কারণ।

এইরূপে সংযুক্ত যে আত্মা, তাহাই পৃথক ব্যক্তিত্ব ও আত্মবোধবিশিষ্ট হইয়া সুখ ও দুঃখবোধ করিতে সক্ষম হয়। তখন হইতে তাহার কর্ম্ম ক্ষমতা জন্মে; কিন্তু ভাল, মন্দ এবং কার্য্যই আত্মার বন্ধনের কারণস্বরূপ হয়; যথা; "অবশ্যমেব ভোক্তব্যম্ কৃতমকর্ম্ম শুভাশুভং," অর্থাৎ ভাল মন্দ সকল কর্ম্মের ফল অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে।

৫। কর্ম্মের পরিণাম বা কর্ম্মবিপাক প্রযুক্ত আত্মাকে পুরস্কার বা শাস্তির স্থানে যাইতেই হইবে; কিন্তু এই উভয় স্থান শেষ বা চূড়ান্ত নহে, তাহা সাময়িক পুর্গেটারি সদৃশ। আত্মা তৎস্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক আবার শরীরী হইয়া গুণানুসারে উচ্চ বা নিম্ন শ্রেণীতে আনীত হয়; অধিকন্তু তাহা যে পরিমাণে মুক্তির দিকে অগ্রসর হয়, সেই পরিমাণে ক্রমশঃ সুখাবস্থার চারি বিশেষ অবস্থা বা ক্রম দিয়া গতি করে; যথা,* ১, সালোক্য, অর্থাৎ ঈশ্বরের সহ স্বর্গবাসী; ২, সামীপ্য, ঈশ্বরের নিকটবর্ত্তী; ৩, সারূপ্য, ঈশ্বরের সম্পূর্ণ সাদৃশ্য লাভ; ৪, ও সর্ব্বশেষ বাঞ্ছনীয় সংযোগ অর্থাৎ সাযুজ্য, পরমাত্মার সহিত সম্পূর্ণ একীভূতরূপে সংযুক্ত হওয়া সংঘটিত হয়।

৬। আত্মার জন্মান্তর, এই শিক্ষা জগতে মন্দের অস্তিত্বের কারণ নির্দ্দেশ করে, যৎপ্রযুক্ত আত্মাকে অসংখ্য দেহাভ্যন্তর দিয়া গতি করিতে হয়।

সাধারণতঃ লোকে বিশ্বাস করে যে, প্রত্যেক প্রাণীকে ৮৪ লক্ষ বার জন্ম পরিগ্রহ করিতে হয়।

মনুষ্যদের মধ্যে যে নানাবিধ ক্লেশ, পীড়া, অভাব, সম্পত্তির অসমতা, ভাল মন্দ স্বভাব দৃষ্ট হয়, তাহা আত্মা কোন পূর্ব্বজন্মে স্বেচ্ছানুসারে যে কার্য্য করিয়াছে, তাহার ফল বলিয়া বিবেচিত হয়; সেই পূর্ব্বজন্মের কার্য্যফল আত্মার উপরে অনিবার্য্য

ক্ষমতা প্রকাশ করে; এই ক্ষমতাকে 'অদৃষ্ট' কহে, যাহা অনুভূত, কিন্তু দৃষ্ট হয় না। এইরূপে আত্মা আপন কর্ম্মফল অনিবার্য্যরূপে নিতান্তই ভোগ করিতে বাধ্য হয়। পূর্ব্বজন্মে কৃত সেই কার্য্য কি, তাহা না জানিয়াও তাহার শাস্তি বা পুরস্কার ভোগ করিয়া থাকে।

উপরোক্ত ছয় সূত্র হইতে অনায়াসে জানা যায় যে, হিন্দু দর্শনের উদ্দেশ্য ভাল মন্দ, প্রিয়অপ্রিয়, সকল প্রকার কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হওয়া। কারণ শরীর আত্মার শৃঙ্খল, তন্মোচনদ্বারা বিভিন্ন ব্যক্তিবোধক জ্ঞানের লোপ হয় ও আত্মা বিশুদ্ধ অবস্থায় পুনরানীত হয়, তাহাই 'প্রমা' বা সত্য জ্ঞান উৎপাদন করে, ইহাই ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের চরম লক্ষ্য। তাহাই প্রকৃত সুখ, তদ্দ্বারা পৃথক অস্তিত্বের বিনাশসাধন ও একমাত্র পরমপুরুষের 'সাযুজ্য' লাভ হয়; তিনি কর্ম্ম-শৃঙ্খলমুক্ত ও নির্গুণ এবং পবিত্র জীবন, পবিত্র চিন্তা ও পবিত্র আনন্দ সম্ভোগ করেন বলিয়া সচ্চিদানন্দ নামে খ্যাত।

সকল দর্শনই বেদের কর্তৃত্ব স্বীকার করে, কোনটীই প্রকাশ্যরূপে তাহা আক্রমণ বা অস্বীকার করে নাই; কিন্তু কোন কোন দর্শনকার তাহা কিরূপ সরলতার সহিত স্বীকার করিয়াছেন, তাহা নির্ণয় করা কঠিন। হিন্দুদের মন দুই সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ মতই এককালে ধারণ ও বিশ্বাস করিতে এমন পটু ও অভ্যস্ত যে, আর কোন জাতিকে তাহাদের তুল্য বলিয়া পাওয়া যায় না। হিন্দু দর্শনশাস্ত্রগুলি পরস্পর এত বিরুদ্ধ যে, তাহা চিন্তাশীল পাঠকের দৃষ্টি কোনও মতে অতিক্রম করিতে পারে না। এই কারণেই এক এক দর্শনকার ও তাঁহাদের অনুগামীগণ অন্য অন্য দর্শনকারদের সহিত মতভেদ প্রকাশ করিয়া পরস্পরকে আক্রমণ করিয়া থাকে। এইরূপে তর্কচূড়ামণি শঙ্করাচার্য্য, নৈয়ায়িককে শৃঙ্গ ও লাঙ্গুলবিহীন বৃষের সহিত তুলনা করিয়াছেন; তাহার অর্থ,—নৈয়ায়িক বৃষের সমস্ত অজ্ঞানতায় ভূষিত অথচ সমরে অক্ষম। তদ্রূপ সাঙ্খ্যকার বৈদান্তিকের উক্তিকে বালকের অথবা পাগলের নিরর্থক বাক্য-

ন্যায় বলিয়া দোষারোপ করিয়াছেন; এবং মীমাংসা, বেদান্তকে ছদ্মবেশী বৌদ্ধমত বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন। পদ্মপুরাণে বলে, ছুইটীর মধ্যে চারিটী দর্শন নাস্তিকতা ব্যতীত আর কিছুই নয়। এইরূপ পরস্পর বিরুদ্ধ হইলেও সেগুলি হিন্দুশাস্ত্রের বিশুদ্ধ শিক্ষা বলিয়া গৃহীত হইয়াছে।

ন্যায়।

এই দর্শনের উদ্ভাবক ঋষি গৌতম, তিনি ব্রহ্মার কন্যা অহল্যার পাণিগ্রহণ করেন, ইন্দ্র ইহারই সঙ্গে ব্যভিচার করাতে এমন ভয়ানক ঘৃণিত দণ্ড পাইয়াছিলেন যে, তাহা এখানে উল্লেখ করা যায় না।

'ন্যায়' শব্দের অর্থ, "কোন বিষয়ের মধ্যে গমন করা," বা বিষয়টী অংশক্রমে বিচার করা, বুঝায়। দার্শনিক বিষয়ের অর্থাৎ মানবীয় বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য ও তত্ত্ব অনুসন্ধানেব প্রকৃষ্ট উপায় ইহাদ্বারা নির্ণীত হয়। ইহার মধ্যে তর্ক-প্রক্রিয়া ও চিন্তার নিয়মাদি নিরূপণ করা হইয়াছে।

মনোমধ্যে বস্তুর সত্য তত্ত্ব ও প্রকৃত জ্ঞান উৎপাদনের চারি-প্রকার বিভিন্ন উপায় বা পদ্ধতি আছে:—

১। প্রত্যক্ষ — ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞান।

২। অনুমিতি — উপলব্ধিদ্বারা যে জ্ঞান জন্মে।

৩। উপমিতি — তুলনাদ্বারা যাহা পাওয়া যায়।

৪। শব্দ — বাক্যপ্রমাণ, বিশ্বাসযোগ্য সাক্ষ্য, বৈদিক প্রত্যাদেশ ইহার মধ্যে গণ্য।

অনুমিতির পঞ্চ অবয়ব, যথা,

১। প্রতিজ্ঞা বা প্রস্তাব।

২। হেতু বা কারণ।

৩। উদাহরণ বা দৃষ্টান্তদ্বারা নির্দেশ করণ।

৪। উপনয় — যুক্তিপ্রয়োগ।

৫। নিগমন বা উপসংহার, প্রতিজ্ঞা সাধিত বলিয়া পুনরুক্তি।

একটী উদাহরণদ্বারা ইহার প্রয়োগ দেখান যাইতেছে: —

১, পর্ব্বত অগ্নিময়; ২, কারণ ধূম নির্গত হইতেছে; ৩, যাহা হইতে ধূম নির্গত হয়, তাহা অগ্নিযুক্ত, যথা, পাকশালা; ৪, এই পর্ব্বত হইতে ধূমোদ্গম হইতেছে; ৫, তজ্জন্য এই পর্ব্বত অগ্নিময়।

ন্যায়ের দ্বিতীয় প্রস্তাব 'প্রমেয়' কথিত হয়, অর্থাৎ 'প্রমা' বিষয়ক প্রস্তাব, কি না, যে সকল বিষয়ের যথার্থ তত্ত্ব নির্ণয় করা আবশ্যক; তাহা এই এই: —

১, আত্মা, ২, শরীর, ৩, ইন্দ্রিয় ৪, অর্থ, ৫, বুদ্ধি, ৬, মন, ৭, প্রবৃত্তি, ৮, দোষ, ৯, প্রেত্যভাব (জন্মান্তর), ১০ ফল (ভাবিফল), ১১, দুঃখ, ১২, অপবর্গ (মুক্তি)।

ন্যায়ের অন্য চতুর্দ্দশ বিষয় বা প্রস্তাব তত দর্শন সম্বন্ধীয় প্রসঙ্গমধ্যে গণ্য করা যায় না; বরঞ্চ তাহা নিয়মিত বাদানুবাদের ক্রম বলিয়া গণনা করা যায়। তাহার ১ম অবস্থাকে বিচার্য্য বিষয়ের 'সংশয়' বা সন্দেহ কহা যায়। ২য়, বিচারের 'প্রয়োজন।' ৩য়, ও ৪র্থ, 'দৃষ্টান্ত,' যদ্দ্বারা সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। ৫ম, আপত্তিকারির আনীত 'অবয়ব,' যে অবয়বের সম্বন্ধে পুর্ব্বে লিখিত হইয়াছে। ৬ষ্ঠ, 'তর্ক' বা আপত্তিখণ্ডন। ৭ম 'নির্ণয়,' অর্থাৎ প্রস্তাবিত বিষয়ের প্রকৃত অবস্থা স্থির করা। কিন্তু ইহাতেই হিন্দুর বাদেচ্ছা পরিতৃপ্ত হয় না; প্রশ্নের সকল দিক বিবেচিত হওয়া উচিত, ও প্রত্যেক প্রকার সম্ভাব্য আপত্তি উল্লেখ করিতে হয়। অতএব, ৮ম, 'বাদ,' বা প্রস্তাবিত বিষয় লইয়া বাদানুবাদ আরম্ভ হয়। ৯ম, 'জল্প' বা যাহা বিবাদ উত্থাপন করে; তদনুবর্ত্তী ১০ম, 'বিতণ্ডা' বা মিথ্যা আপত্তি। ১১শ, 'হেত্বাভাস' বা ভ্রমাত্মক আপত্তি। ১২, 'ছল' অর্থাৎ দ্ব্যর্থ কথা বা শ্লেষ। ১৩শ, 'জাতি' বা নিষ্ফল উত্তর। ১৪, 'নিগ্রহস্থান,' এখানে বিচারের শেষ করা

হয়, তদ্দ্বারা বিচার্য্য বিষয়ে আপত্তিকারির হেতুবাদে অক্ষমতা ব্যক্ত করা হয়।

অনন্তর গৌতম দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, সর্ব্বদুঃখের মূলে ভ্রান্তমত রহিয়াছে, কারণ এই ভ্রান্তমত হইতে কোন বিষয়ে অনুরাগ, অননুরাগ বা অস্পৃহতার দোষোৎপত্তি হয়, এই দোষ হইতে কার্য্যশীলতা জন্মে ও এই ভ্রান্তকার্য্যশীলতা হইতে কার্য্যোৎপত্তি, তাহা গুণযুক্ত বা অগুণযুক্ত হইতে পারে। এই গুণ বা অগুণ মনুষ্যকে শাস্তি বা পুরস্কারের জন্য বহুবিধ জন্মান্তরের অধীন করে, এই সকল জন্মই দুঃখদায়ক। অতএব দুঃখের মূলে যে ভ্রান্তমত অবস্থিত, তাহার নিবারকরণ বা সংশোধন করাই দর্শনের উদ্দেশ্য।

গৌতমের সূত্র সকলের মধ্যে একবারমাত্র ঈশ্বরের নামোল্লেখ হইয়াছে ; কিন্তু তাঁহার কোনরূপ নৈতিক গুণ বা কর্ত্তৃত্ব সম্বন্ধে কিছুই বলা হয় নাই। ন্যায়মতে সৃষ্টিকার্য্য অনন্ত পরমাণুপ্রক্রিয়াতে রচিত ; পরমাণুসমূহ অসৃষ্ট। আত্মা বহুবিধ, তাহাও পরমাণুর ন্যায় নিত্য, পরন্তু তাহা মন হইতে স্বতন্ত্র। ঈশ্বরের সেবাকার্য্য সম্বন্ধে ন্যায় নীরব, কিছুই শিক্ষা দেয় না ; কিন্তু বেদের শিক্ষা ও পূজার অনুমোদন করে।

বৈশেষিক

বৈশেষিক দর্শনকে ন্যায়ের পরিশিষ্ট, অথবা ন্যায়ের শাখা না বলিয়া বিকাশ বলিলে সঙ্গত হয়। ইহার প্রণেতার নাম কণাদ বা কণভুক। এই দর্শন সম্বন্ধীয় অনুসন্ধান-প্রণালী সপ্ত পদার্থে বিভক্ত ; নৈয়ায়িকেরা প্রকৃত ন্যায়ের বিষয় অপেক্ষা বৈশেষিক সঙ্গত এই সপ্ত পদার্থ সচরাচর গ্রহণ করিয়া থাকেন। নিম্নে সে গুলি লিখিত হইতেছে ;—

১, দ্রব্য, ২, গুণ, ৩, কর্ম্ম, ৪, সামান্য, ৫, বিশেষ, ৬, সমবায়, ৭, অভাব।

এই সপ্ত পদার্থের প্রায় সকলগুলি অনেকানেক উপভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে।

এই দর্শনমতে সৃষ্টিকার্য্য পরমাণুসংহতিদ্বারা সংঘটিত হইয়াছে। পরমাণু সকল নিত্য; তৎসমুদয় অদৃষ্ট শক্তিবশে চিরকাল হইতে সংযুক্ত ও বিযুক্ত হইয়া আসিতেছে। পরমাণু শব্দে অনন্ত, কারণবর্জ্জিত, ও অস্তিত্ববিশিষ্ট কিছু বুঝায। তাহা অতি সূক্ষ্ম অপেক্ষাও সূক্ষ্ম, অদৃশ্য অস্পৃশ্য, অবিভাজ্য, ইন্দ্রিয়ের অগোচর। প্রত্যেক পরমাণু বিশেষ বা নিত্য বস্তুবিশিষ্ট। দুটী দুটী করিয়া তাহারা প্রথমে সংযুক্ত হয়, এরূপ সংযুক্ত তিনটী একত্রিত হইলে তাহাকে 'ত্রসরেণু' কহে, তাহা সূর্য্যালোকে প্রত্যক্ষ হয়।

কণাদেব দর্শনমধ্যে 'ঈশ্বর' নামও পাওয়া যায় না। জগতের নির্ম্মাণ অদৃষ্টের (যাহা দৃশ্যাতীত) কার্য্য, সম্ভবতঃ ইহা তাঁহার সিদ্ধান্ত। এই শক্তি হিন্দুদর্শনেব এক দেব বলিযা বর্ণিত হয়। কিন্তু পরবর্ত্তী নৈয়ায়িকেরা পরমাত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস স্থাপন কবিয়াছেন, তাহা মানবীয় আত্মা বা জীবাত্মা হইতে বিভিন্ন। তাঁহাদের বর্ণনানুসাবে এই পবমাত্মা অনন্ত, অবিকাব, সর্ব্বশক্তিমান, নিরাকার, সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বজ্ঞ, ও বিশ্বস্রষ্টা।

তাঁহারা ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির আত্মা বা জীবাত্মা অনন্ত, নানারূপী, পরস্পর অনন্ত বিভিন্ন, শবীর, ইন্দ্রিয় ও মন হইতে পৃথক বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকেন; তথাপি তাহা বিবেকসম্পন্ন; ইচ্ছা, সঙ্কল্প, ঘৃণা, আনন্দ, দুঃখ, গুণ, অগুণবিশিষ্ট। তদ্ভিন্ন দার্শনিকেরা জীবাত্মাকে অসীম, সর্ব্বত্রস্থায়ী, স্থানমাত্রেই পরিব্যাপ্ত বলেন, অর্থাৎ মানুষের আত্মা এককালে লণ্ডন ও কলিকাতায় অবস্থিতি করে, যদিও স্বীকার করেন যে, আত্মার আধার শরীর যেখানে বিদ্যমান, জীবাত্মা কেবল সেই স্থানে উপলব্ধি ও কার্য্যাদি সাধন করিতে সক্ষম হয়।

মন সম্বন্ধে ন্যায়ের মত এই, মন অন্তরিন্দ্রিয়, তাহা আত্মার সদৃশ দ্রব্য অথবা অনন্ত পদার্থ; কিন্তু আত্মার মত

সর্ব্বস্থলে ব্যাপ্ত নয়; তাহা মৃত্তিকা, জল, অগ্নি, বায়ু, প্রভৃতির ন্যায় আণবিক। এককালে একই চিন্তা মনে স্থান পাইতে পারে। যদি মন আত্মার ন্যায় অসীম হইত, তাহা হইলে সমস্ত প্রকার বোধ ও চিন্তা একই সময়ে মনোমধ্যে স্থিতি করিতে পারিত; কিন্তু তাহা অসম্ভব।

জগৎ সৃষ্টি সম্বন্ধে স্পষ্ট বোধ হয়, বৈশেষিক মত দ্বৈতবাদ, অনন্ত পরমাণু ও তাহার পার্শ্বে অনন্ত আত্মা সমূহ, অথবা বিশ্বের পরমাত্মা স্থিত হইয়া জগতের সৃষ্টিকার্য্য সাধিত হইয়াছে। অপবিত্র ও মন্দ জগৎ পবিত্র ও সিদ্ধ পরমাত্মা হইতে উৎপন্ন, বৈশেষিক মত তাহার বিরুদ্ধ। জড় ও আত্মার মধ্যে নিশ্চিত সম্বন্ধ কি, এই দর্শনের দ্বারা তাহার কোন নিষ্পত্তি হয় নাই।

সাঙ্খ্য।

এই দর্শনের প্রণেতা কপিল, তিনি ব্রহ্মার মন জাত সপ্ত ঋষির একজন। এই দর্শনের মত দ্বৈতবাদ; অর্থাৎ দুই আদিম কর্ত্তৃ শক্তিদ্বারা সমস্ত বিরচিত হইয়াছে। তাহার একটি নিত্য বিদ্যমান পদার্থের নাম 'প্রকৃতি,' তাহা হইতে যাবতীয় বস্তুর উৎপত্তি হইয়াছে,অপরটীর নাম আত্মা বা পুরুষ।

নিম্নলিখিত সাঙ্খ্যসূত্রদ্বারা এই দর্শনের ভাব কতক বুঝা যায়;—"মূলে মূলের অভাব হইতে সকল বস্তুর মূল মূলহীন।"

"কতকগুলি কারণপরম্পরা বর্ত্তমান থাকিলেও ক্রমশঃ পশ্চাদ্দিকে গেলে কারণের অসদ্ভাব দৃষ্ট হয়; অতএব সকল উৎপন্ন দ্রব্যের আদিম মূল 'প্রকৃতি' নামমাত্র।"

অসত্তা হইতে কোন সত্তার উদ্ভব অসম্ভব। যাহা নাই, তাহা অস্তিত্বে পরিণত হইতে পারে না। যাহা নাই, তাহা হইতে কিছু উৎপন্ন হওয়া অসম্ভব, যথা, মনুষ্যমস্তকে শৃঙ্গের উৎপত্তি। কোন বস্তুর বিকাশপ্রাপ্তির পূর্ব্বে তাহার উপাদান গুলির সত্তা প্রয়োজন।"

প্রকৃতির ত্রিবিধ মূলতত্ত্ব, তাহা গুণ নামে খ্যাত, যদ্দ্বারা আত্মাকে বন্ধন করা যায়, তাহাদের নাম সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ। এই গুণত্রয় সকল পদার্থেই আছে, তাহাদের পরিমাণের অল্পাধিক্য প্রযুক্ত পদার্থাদির বিভিন্ন প্রকার রূপ ও ধর্ম্ম দৃষ্ট হয়; যাহাতে যে গুণ বেশী, তাহাতে সেই গুণের আধিক্যযুক্ত স্বভাব হইয়া থাকে।

আত্মা অগণ্য, তাহা বিভিন্ন, জ্ঞানসম্পন্ন, নিত্য, অপরিবর্ত্তনীয়। প্রকৃতি যাহা করে, তাহা আত্মারই জন্য করে। আত্মা স্বয়ং নির্গুণ, প্রকৃতির সহিত সম্মিলিত হইয়া গুণসম্পন্ন হয়; তাহা এইরূপ দৃষ্টান্ত দ্বারা ব্যক্ত করা হয় — খঞ্জ ব্যক্তি অন্ধের স্কন্ধ আরোহণ করিলে, একের দ্বারা অন্য চালিত ও উভয়ে কার্য্যক্ষম হইয়া উঠে; কিন্তু একাকী প্রত্যেকে কার্য্যাক্ষম। এই দর্শনে ঈশ্বরের কোন উল্লেখ নাই, তজ্জন্য হিন্দুদের নিকট ইহা 'নিরীশ্বর সাঙ্খ্য' নামে অভিহিত। কিন্তু সাঙ্খ্য দর্শনকার মূলগ্রন্থে 'ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণীকৃত হয় না,' এইরূপ স্বীকার করিয়াছেন; অতএব সাঙ্খ্যকারকে 'নাস্তিক' (Atheist) না বলিয়া 'ঈশ্বর জ্ঞান শূন্য' (Agnostic) বা 'অজ্ঞেয়বাদী' বলা যায়।

আত্মা ব্যতীত আর সকলের মূল প্রকৃতি, তাহা উৎপন্না নয়, কিন্তু উৎপাদিকা; বুদ্ধি, অহঙ্কার, তন্মাত্র প্রভৃতি অষ্ট সূক্ষ্ম উৎপাদক উৎপন্ন করে। তদ্দ্বারা ১৬ বিকার উৎপন্ন হয়, তন্মাত্রসম্ভূত প্রথম উৎপন্ন পঞ্চ মহাভূতের নাম ক্ষিতি, অপ, তেজঃ, মরুৎ ও ব্যোম। দ্বিতীয় উৎপাদক অহঙ্কারকর্ত্তৃক একাদশ ইন্দ্রিয়ের উৎপত্তি হয়; যথা, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও মনঃ। এই শেষোক্তটী বোধ, ইচ্ছা, ও কার্য্যের অন্তরিন্দ্রিয়। পূর্ব্বোক্ত অষ্ট উৎপাদক, পঞ্চ স্থূল মহাভূত ও একাদশ ইন্দ্রিয় সহযোগে প্রকৃত ভৌতিক পদার্থ ও দৃশ্য জগতের উপযোগী পদার্থসমূহ সংস্থাপিত হয়। উৎপাদক সকলের মধ্যে 'অহঙ্কার' বা আত্মজ্ঞান সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয়। সাঙ্খ্যের মতে সমস্ত বাহ্য জগৎ যেন এই অহংসম্ভূত; কিন্তু

এই অহং আত্মা হইতে ভিন্ন; কারণ আত্মাতে প্রকৃত বিভিন্ন ব্যক্তিত্ববোধ নাই।

সাঙ্খ্য দর্শন দৃঢ়রূপে ব্যক্ত করে, "অসত্তা হইতে অসত্তার উৎপত্তি হয়।" প্রকৃতি ও আত্মার সংযোগে বিশ্বের উৎপত্তি হইয়াছে। দর্শনবেত্তার মতে বর্ত্তমান অস্তিত্ব দুঃখভোগমাত্র, মুক্তিলাভই জীবনের শ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য। জ্ঞানমার্গদ্বারা এই মুক্তি পাওয়া যায়; যখন জ্ঞানলাভ করিয়া আত্মা প্রকৃতির সহিত স্বীয় বন্ধনশৃঙ্খল মোচন করিতে সক্ষম হয়, তখনই দুঃখ-ভোগের নিবৃত্তিলাভ হয়।

যোগ।

পতঞ্জলি এই দর্শনের উদ্ভাবক, কিন্তু ইহা সাঙ্খ্যদর্শনের শাখা বলিলেও হয়, ইহাকে সেশ্বরবাদ সাঙ্খ্য বলা যায়। সাধারণ মূলতত্ত্বে সাঙ্খ্যের সহিত এক হইলেও ইহা ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করাতে অনেক পরিমাণে প্রচলিত মতানুযায়ী দর্শন বলা যায়। যোগের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি অন্য সকল আত্মা হইতে ভিন্ন পরমাত্মা; কর্ম্মাদি মন্দের দ্বারা তাঁহার কোনরূপ বিকৃতি হয় না, তাহা অপর আত্মাগণে হইয়া থাকে। 'ওম' এই নিগূঢ় শব্দে তাঁহাকে ব্যক্ত করা হয়। তিনি সর্ব্বজ্ঞ, অসীম, সময়ের অতীত। জীবাত্মা কিরূপে, বা কি উপায়ে পরমাত্মার সহিত সম্পূর্ণ-রূপে সংযুক্ত হইতে পারে, যোগ তাহাই শিক্ষা দেয়। অন্য সর্ব্বপ্রকার চিন্তা ও জ্ঞানবর্জ্জিত হইয়া সম্পূর্ণ ধ্যান ও মনো-যোগের সহিত কোন পদার্থে অভিনিবিষ্ট হইলে উদ্দিষ্ট ফললাভ হয়; ধ্যানের বিষয় যাহাই হউক, তাহাতে ক্ষতি নাই, কেবল তাহারই ধ্যানে মগ্ন হইয়া অন্য সকল চিন্তা দূর করিতে হয়। এইরূপ সাধন করিলে যোগী প্রকৃত জ্ঞানলাভ করিতে সক্ষম হয়। যোগের অর্থ একতাসাধন, পরমাত্মার সহিত একতাসাধন করাই যোগের উদ্দেশ্য।

যোগসাধনার্থে মানসিক ভাবের একীকরণের অষ্ট উপায় এই :—

১, যম, বহির্বৃত্তি নিবৃত্ত করণ। ২, নিয়ম, পাপপ্রবৃত্তি উন্মূলনার্থে ইন্দ্রিয়দমন। ৩, আসন,—উপবেশন। ৪, প্রাণায়াম—নিয়ন্ত্রিত শ্বাসক্রিয়া। ৫, প্রত্যাহার,—ইন্দ্রিয়-সংযমন। ৬, ধারণ,—চিত্তের একাগ্রতা। ৭, ধ্যান,—অন্য চিন্তা পরিহার পূর্ব্বক ধ্যেয় বস্তুরই চিন্তা। ৮, সমাধি—গভীর ধ্যানযোগ, একদৃষ্টে নাসিকার অগ্রভাগে চক্ষুর দৃষ্টি স্থির করিয়া সংজ্ঞাশূন্য হওয়া বুঝায়।

যোগসাধনে 'আসন' বিষয়ে মনোযোগ অতি প্রয়োজন, পূর্ব্বকালে ৮৪ বিভিন্ন প্রকার আসনের বর্ণনা আছে, এক্ষণে তন্মধ্যে দশ প্রকারে বিশেষ মনোযোগ দেয়, তাহার কয়েকটী এইরূপ :—

পদ্মাসন—দক্ষিণপদ বাম উরুদেশে ও বামপদ দক্ষিণ উরুর উপর স্থাপন, হস্ত ঢেরাকৃতি করিয়া তদ্দ্বারা দুই পদের বৃদ্ধাঙ্গুলিধারণ, বক্ষোপরি চিবুক আনয়ন, চক্ষুর্দ্বয়ে নাসিকার অগ্রভাগদর্শন।

গোমুখাসন—দক্ষিণগুল্ম বামবক্ষঃস্থলে ও বামগুল্ম দক্ষিণ বক্ষঃস্থলে স্থাপন পূর্ব্বক উপবেশন।

বিহঙ্গাসন—পদ্মাসনে অবস্থিত হইয়া হস্তদ্বয় উরু ও জানুর মধ্য দিয়া মৃত্তিকাতে স্থাপন পূর্ব্বক তাহাতে ভর দিয়া শরীর মৃত্তিকার উর্দ্ধে সংস্থাপন করা।

ধন্বাসন—হস্ত দিয়া দুই পদের বৃদ্ধাঙ্গুলি টানিয়া কর্ণে সংলগ্ন করণ।

ফলতঃ, সর্ব্বপ্রকার চিন্তাবর্জ্জিত হওয়াই যোগ।

মীমাংসা বা পূর্ব্বমীমাংসা।

জৈমিনীর মীমাংসা বেদান্তদর্শনের সহিত সংসৃষ্ট হইয়া কখনং পূর্ব্বমীমাংসা বলিয়া কথিত হয়, ও বেদান্তকে উত্তর-

মীমাংসা বা ব্রহ্মমীমাংসা বলা হয়। মীমাংসা দর্শনমধ্যে গণিত না হইয়া দর্শনপ্রণালী অনুসারে বেদের ব্যাখ্যা বলিলেও চলে। জৈমিনীর মতে বেদই সর্ব্বেসর্ব্বা, বহিঃস্থ প্রমাণসাপেক্ষ নয়, আপনি আপনার প্রমাণ, বেদের ধ্বনির অস্তিত্ব চিরকাল হইতে বর্ত্তমান। বেদের আদেশ মান্য করাই মানবীয় কর্ত্তব্যের সার বিষয়। জৈমিনী ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করেন নাই; কিন্তু ঈশ্বরের কোনরূপ ক্ষমতা না রাখিয়া বেদকেই বাস্তবিক ঈশ্বর করিয়াছেন।

বেদান্ত।

বেদান্তের প্রণেতা ব্যাস বা বাদরায়ণ; কিন্তু ব্যাস নামক ব্যক্তি সম্ভবতঃ কল্পিত গ্রন্থকার মাত্র। এই দর্শনের প্রধান পক্ষপাতী মহাত্মা শঙ্করাচার্য্য খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি অহিন্দু ধর্ম্ম দূর করিয়া হিন্দু-ধর্ম্মের উন্নতি করণার্থে তিনি অসাধারণ ক্ষমতা প্রকাশ করিয়াছিলেন।

বেদান্তের মূল প্রতীতিবাক্য অতি সংক্ষিপ্ত, তাহা ছান্দোগ্য উপনিষদ হইতে গৃহীত, যথা, 'একমেবাদ্বিতীয়ম,' অর্থাৎ একই অদ্বিতীয়! তাহা এইরূপেও ব্যক্ত হয়,— "ব্রহ্মই সত্য, ব্রহ্মই আত্মা, ব্রহ্মই বিশ্ব; তাঁহা হইতে বিশ্ব নির্গত ও তাঁহাতেই লীন হয়, ইহার শ্বাসপ্রশ্বাস তাঁহাতেই, প্রত্যেকে ধীর ভাবে তাঁহার পূজা করুক।"

বেদান্তে জগতের উৎপত্তির বিভিন্ন কারণ দৃষ্ট হয়; ন্যায় অনুসারে অনন্ত পরমাণু সমষ্টির সংঘটন ক্রমে জগৎ রচিত হইয়াছে। সাঙ্খ্য মতে প্রকৃতি নামক সৃষ্টিশক্তি আত্মাসহ সংযুক্ত হইয়া সৃষ্টিকার্য্য সাধন করে; কোন কোন মত অনুসারে ইহাতে পরমাত্মার কার্য্যও আরোপিত হয়। কিন্তু বেদান্তের মতে পরমাত্মা বা সার্ব্বভৌম আত্মা ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তিগত

আত্মার অস্তিত্ব নাই। এই কারণ ইহা 'অদ্বৈতদর্শন' নামে আখ্যাত হয়। জগতের অস্তিত্ব কেবল ঐ অনন্ত পদার্থের জনন ভিন্ন আর কিছুই নয়, প্রকৃত পক্ষে তাহা মায়াময়।

বাদরায়ণের প্রথম সূত্রের নাম 'ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা,' এই একই বাক্যে তাঁহার দর্শনের মর্ম্ম বুঝিতে পারা যায়। দ্বিতীয় সূত্রে ব্রহ্মের এইরূপ অর্থ করা হইয়াছে, "যাঁহা হইতে এই দৃশ্য বিশ্বের উৎপত্তি হইয়াছে।"

অন্যান্য সূত্র হইতে প্রতিপন্ন করা হইয়াছে যে, কার্পাসের সহিত বস্ত্রের, দুগ্ধের সহিত সরের, মৃত্তিকার সহিত ঘটের, বা স্বর্ণের সহিত বলয়ের যেরূপ সম্বন্ধ, ব্রহ্মের সহিত বিশ্বের সেইরূপ সম্বন্ধ। তিনিই স্রষ্টা ও সৃষ্ট পদার্থ, কর্ত্তা ও কার্য্য তিনিই অস্তিত্ব, জ্ঞান ও আনন্দ বা "সচ্চিদানন্দ" কিন্তু তিনি অংশবর্জ্জিত, গুণে অবদ্ধ, কার্য্য, গতি বা চেতনবিরহিত, আদি, অন্ত ও পরিবর্ত্তন তাঁহাতে নাই। বেদান্তের এইরূপ বর্ণনানুসারে ব্রহ্মরূপে দর্শিত পরমপুরুষ কিছুরই মধ্যে গণ্য নহেন।

বৈদান্তিকের প্রতীতিবাক্য এই কার্য্যতঃ 'জগৎ কেবল মায়া ময়' নহে। যথার্থ বৈদান্তিক যদিও বলে, 'ব্রহ্মই সত্য;' তথাপি প্রকৃত পারমার্থিক ও মায়াময় প্রাতিভাসিক অস্তিত্ব হইতে বিভিন্ন আত্মা, জগৎ ও ঈশ্বরের ব্যবহারিক অস্তিত্ব স্বীকার করে। আর বাস্তবিক যখন আমরা প্রতি মুহূর্ত্তে বাহ্য পদার্থের সত্তা দর্শন ও অনুভব করিতেছি, তখন কিরূপে তাহা সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করা যাইতে পারে? কিন্তু এক নির্ম্মল আত্মিক সত্ত্বা হইতে কি ঈদৃশ এক অশুচিতাপূর্ণ জগতের উৎপত্তি সম্ভব? এই দুরূহ সমস্যার উত্তর দিতে গিয়া এরূপ কল্পনা করিতে হইয়াছে যে, পরমপুরুষ অনাদিকাল হইতে আত্ম-বিনোদনার্থে মায়া-জড়িত হইয়া আপনা হইতে পৃথক আত্মা ও দৃশ্য পদার্থসমূহ নির্গত হইতে দিয়াছেন, কিন্তু সেগুলি তাঁহার পূর্ণ পবিত্র সত্তা হইতে জাত প্রকৃত পদার্থ নয়, দৃশ্য ছায়ার ন্যায় মাত্র। আত্মা (ব্যক্তিসূচক), ঈশ্বর, বাহ্যজগৎ

প্রভৃতি অপর সমুদয়ই বৈদান্তিক বাস্তবিক 'মায়া' বা 'অবিদ্যা' সম্ভূত বলিয়া বর্ণনা করে। অবিদ্যা বা ভ্রান্তজ্ঞান যে দুই বিভিন্ন আকারে কার্য্য করে, তাহা 'আবরণ' ও 'বিক্ষেপ' বলা যায়। আবরণশক্তি ব্রহ্মের সহিত আত্মার একত্ব সংগোপন করে, এবং বিক্ষেপ শক্তির বশে আত্মা বহিঃস্থ জগতের আকার উপলব্ধি করে। অবিদ্যার বশে প্রত্যেক ব্যক্তির জীবাত্মা বাহ্য জগৎ ও নিজ শরীর, মন প্রকৃত বস্তু বিবেচনা করিয়া ভ্রান্ত হয়, যাদৃশ তমসাবৃত নিশাতে সামান্য রজ্জুকে সর্প-বোধে ভ্রম জন্মে। বেদান্তের শিক্ষানুসারে যেই ব্যক্তিগত আত্মার প্রকৃত জ্ঞানোদয় হয়, সেই অজ্ঞানতা বিদূরিত ও মায়া তিরোহিত হইয়া যায়, এবং পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার ও সমগ্র দৃশ্য জগতের ঐকত্ব সম্বন্ধ পুনঃস্থাপিত হয়।

জীবাত্মাগণ পরমাত্মা হইতে পৃথক অবস্থান থাকে; যেমন পলাণ্ডু কয়েকটী ভিন্ন আবরণে বেষ্টিত, জীবাত্মার অবস্থা তাদৃশ প্রতীয়মান হয়।

বেদান্ত শিক্ষায় কার্য্যাদির নৈতিক বিভিন্নতা লোপ করা হইয়াছে; যেহেতুক কেবলমাত্র ব্রহ্মের অস্তিত্ব স্বীকার করাতে, ও "অহম ব্রহ্ম" সূত্রের অনুসরণক্রমে পাপকার্য্য অসম্ভব ও পাপের অস্তিত্ব লোপ হইয়াছে। বাহ্য জগতে পাপবৎ কিছু দৃষ্ট হইলেও তাহা মরীচিকার ন্যায় মায়াসম্ভূত বিষয় ভিন্ন আর কিছুই নয়। প্রকৃত জ্ঞানী ব্যক্তি হত্যা করিলেও তাহা প্রকৃত পক্ষে হত্যা নয়। হিন্দুর এইরূপ বিশ্বাস বশতঃ তাহার ফল অতি মন্দে পরিণত হইয়াছে। বেদান্তের শিক্ষানুসারে মনুষ্যের কর্ত্তব্য কার্য্যের বোধ লোপ হয়, ধর্ম্ম, নীতি প্রভৃতি রহিত হয়, শারীরিক, মানসিক ও আত্মোন্নতিকর পরিশ্রমে মনুষ্য বীত-রাগ হইয়া উঠে। সকলই যখন ঈশ্বর, তখন আমি, তুমি ও সে পৃথক পৃথক নয়, একই; তখন আত্মা বা অন্যের উন্নতির জন্য সচেষ্ট হই কেন? আমাদের সকলই সাধারণ সম্পত্তি ভিন্ন আর কিছুই নয়; এইরূপ বোধ মনুষ্যকে বাস্তবিক নিতান্ত নিশ্চেষ্ট করিয়া তুলে। বৈদান্তিকের নিকট সমস্ত ধর্ম্মই

অনর্থক ; নম্রতা, বিনয়-ভাব, ঈশ্বর-প্রেম, প্রার্থনা, বাধ্যতা, পাপজন্য অনুতাপ, প্রতিবাসীকে প্রেম করা প্রভৃতি সমস্তই বিরুদ্ধ ও অসম্ভব।

অদ্বৈতবাদ ঈশ্বর ও জগতকে একত্র মিশ্রিত করিয়া দিয়াছে, সৃষ্টিকর্ত্তা ও সৃষ্টির মধ্যে কোন ভিন্নতা নাই, বিশ্বরাজ্যে যেন ঈশ্বরকে সমাহিত করিয়াছে। অদ্বৈতবাদ বিজ্ঞানমাত্র, তদ্দ্বারা মনুষ্য নাস্তিকতায় পতিত হয়। এই বিজ্ঞান মনুষ্যের ধর্ম্মের স্থলীয় হইলে, ইহা আর অদ্বৈতবাদ না থাকিয়া বহুদেববাদে পরিণত হয়, প্রকৃতির শক্তিসমূহে দেবত্ব আরোপণ করে, ঈশ্বরকে নানাবিধ আকারে প্রদর্শন করে, নানা দেবতার অবতার কল্পনা করে। হিন্দুধর্ম্মের এইরূপ অবস্থা অনুসারে হিন্দু আপন দেবশ্রেণীর সংখ্যা এত বৃদ্ধি করিয়াছে যে, জগতের প্রাচীন ও আধুনিক তাবৎ জাতিই এ বিষয়ে হিন্দুর নিকট পরাস্ত হইয়াছে।

দর্শনগুলতে নিম্নলিখিত মৌলিক ঐক্য দৃষ্ট হয়ঃ—

১। মীমাংসা ব্যতীত অন্যগুলি মুক্তিলাভের উপায়, অথবা শরীর ও ইচ্ছা হইতে আত্মার মুক্তির পন্থা শিক্ষা দেয়।

২। অজ্ঞানতাই আত্মার বন্দীত্বের মুখ্য কারণ।

৩। কিন্তু ভাল বা মন্দ কার্য্যও আত্মাকে বন্দীত্বে আবদ্ধ করে। উত্তম কার্য্যজনিত গুণ আত্মাকে ভোগাধীন করে, এবং কুকার্য্যজনিত অগুণ আত্মাকে দুঃখের অধীন করে। যেখানে সুখ বা দুঃখের ভোগ আছে, সেখানে সত্য মুক্তি নাই ; মুক্ত আত্মাতে সুখ ও সন্তাপের কোন বোধ নাই।

৪। প্রকৃত বোধ বা তত্ত্বজ্ঞান মুক্তিলাভের উপায়। আত্মা যে, শরীর, ইন্দ্রিয়াদি হইতে স্বতন্ত্র, তাহার বোধ পাওয়া আবশ্যক।

৫। আত্মা নিত্যস্থায়ী, তাহার আদি ও অন্ত নাই।

৬। আত্মা বহুবিধ জন্মান্তরের পর মুক্ত হইবে।

৭। বাহ্য জগতের উৎপত্তির কোন স্থূল কারণ বিদ্যমান আছে, যাহা হইতে ইহার উৎপত্তি হইয়াছে।

৮। জগৎ চিরকালাবধি বিদ্যমান আছে, তাহা অনেকবার মৌলিক মহাভূতে পরিণত হইয়াও কোন না কোন আকারে চির বিদ্যমান রহিয়াছে।

ভগবদ্গীতা।

ভগবদ্গীতা হিন্দুদিগের নিকট উপাদেয় ধর্ম্মশাস্ত্র বলিয়া পরিচিত। ইহার রচয়িতার নাম জানা যায় না, অথবা কখন্ ইহা মহাভারতের মধ্যে সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে, তাহাও বলা যায় না। এই গীতা মহাভারতের পঞ্চবিংশ অধ্যায়ের ৮৩০শৎ পংক্তিতে আরম্ভ হইয়া তাহার ১৫৩২শৎ পংক্তি পর্য্যন্ত গিয়া শেষ হইয়াছে। বাস্তবিক ইহা উক্ত মহাকাব্যমালাতে পরিপাটীরূপে জড়িত হইয়া মুক্তার ন্যায় শোভমান হইতেছে। ইহার লেখক নামমাত্র বৈষ্ণব শ্রেণীর ব্রাহ্মণ, কিন্তু তিনি একজন অসঙ্কীর্ণ-মনা দার্শনিক পণ্ডিত ছিলেন। বোধ হয়, খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় শতাব্দীতে তিনি জীবিত ছিলেন। তাঁহার সময়ে প্রচলিত ভিন্ন ভিন্ন দর্শনের কোন একটীতে বিশ্বাস করিতে তাঁহার অভিমত হয় নাই, অথচ তাঁহার চতুর্দ্দিকে বিদ্যমান সঙ্কীর্ণ-মনা ব্রাহ্মণদের বিকৃত শিক্ষাতেও তাহার অভিরুচি ছিল না; অতএব অন্য সকল দর্শন হইতে নির্ব্বাচন করিয়া আপনার মনোমত এই দর্শনের প্রণয়ন করেন। ভগবদ্গীতা অতি পরিচ্ছন্ন সুললিত ভাষায় লিখিত হইয়াছে। সাঙ্খ্য, যোগ ও বেদান্তের সুরঞ্জিত শিক্ষার সহিত কৃষ্ণভক্তি ও জাতিভেদের কঠোর মত (ধর্ম্ম নামে অভিহিত) সংযোজিত হইয়া ইহা হিন্দুর চক্ষুতে অপূর্ব্ব রূপ ধারণ করিয়াছে; গ্রন্থকার সাঙ্খ্য দর্শনের পক্ষপাতী হইয়া তাহারই শিক্ষা প্রধানতঃ অবলম্বন করিয়াছেন।

শঙ্করাচার্য্য ভগবদ্গীতার টীকাকার। যেরূপ উপনিষদগুলি হইতে ষড়্দর্শনের উৎপত্তি হইয়াছে, শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের সহিত ভগবদ্গীতার সেইরূপ সংস্রব রহিয়াছে। উভয়ের

উদ্দেশ্য একই, কিন্তু কোন্‌টী প্রথমে, কোন্‌টী বা পরে রচিত, তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদখানি অপেক্ষাকৃত আধুনিক গ্রন্থ। উভয়ের উদ্দেশ্য ভিন্ন ভিন্ন দর্শনের বিরুদ্ধ মতগুলির সামঞ্জস্য প্রদর্শন করা, ফলতঃ সাঙ্খ্য ও যোগ দর্শনদ্বয় বেদান্তের শিক্ষার উপর সংস্থিত করিয়া তাহাদের পরস্পর-বিরুদ্ধ-বাদের সম্মিলন করিতে বিশেষ প্রয়াস করা হইয়াছে। সাঙ্খ্য দর্শনের সৃষ্টিপ্রক্রিয়া উভয়ে অনুমোদন করিয়াছে, অথচ উভয়ে বিশ্বরাজ্যে পরমাত্মার কর্তৃত্ব স্বীকার করে। পরমাত্মা গীতার কৃষ্ণরূপে মূর্ত্তিমান হইয়া সমস্ত পদার্থের মূল ও পরিণাম; কিন্তু সৃষ্ট বস্তু হইতে সম্পূর্ণ পৃথকভাবে আপনাকে প্রকাশ করেন, উভয় গ্রন্থমধ্যে এই শিক্ষা দৃষ্ট হয়।

ভগবদ্গীতার নায়কদ্বয় মহাভারতের সুপ্রসিদ্ধ অর্জ্জুন ও কৃষ্ণ। অর্জ্জুনই মহাভারতের বীরচূড়ামণি বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন, পাণ্ডবগণের মধ্যে তিনি বীরাগ্রগণ্য, অথচ কোমলহৃদয় ছিলেন। বিষ্ণু কৃষ্ণের রূপ ধারণ করিয়া ভগবদ্গীতায় আপনাকে পরমপুরুষ বলিয়া দেখাইয়াছেন। তিনি পাণ্ডুপত্নী কুন্তীর সহোদর বসুদেবের ঔরসে ও দেবকীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সুতরাং সম্বন্ধে তিনি পাণ্ডবগণের মামত ভাই ছিলেন। ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডুর ভ্রাতা, এই উভয় ভ্রাতার সন্তান ক্ষত্রিয় বীরগণ প্রভুত্বলাভের জন্য যে সমরে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহাই মহাভারতবর্ণিত কুরুপাণ্ডবদের যুদ্ধ বলিয়া প্রসিদ্ধ। কৃষ্ণ অস্ত্রধারণ পূর্ব্বক যুদ্ধক্ষেত্রে অবতরণ করিয়া কোন পক্ষই অবলম্বন করিতে চাহেন নাই, অথচ অর্জ্জুনের সারথী ও মন্ত্রণাদাতা-রূপে সাহায্য করিয়াছিলেন। গ্রন্থের আরম্ভ এইরূপ সূত্রে হইয়াছে ;—যখন পরস্পর প্রতিপক্ষ সৈন্যনিবহ যুদ্ধার্থে সম্মুখীন হইয়াছে, তখন অর্জ্জুন বিরুদ্ধ-পক্ষের যোদ্ধৃদলে আত্মীয় স্বজনবর্গ, গুরু অধ্যাপকগণকে সমবেত দেখিয়া ও তাঁহাদেরই রক্তে পৃথিবী প্লাবিত করিয়া রাজ্যলাভ করিতে হইবে, এই চিন্তায় হৃদয়ে মর্ম্মান্তিক ব্যথিত ও সমরে অনিচ্ছুক হইয়া কৃষ্ণকে কহিলেন, রাজ্যলোলুপ হইয়া তাঁহাদের

সঙ্গে যুদ্ধ করণাপেক্ষা বরং আমি তাঁহাদের হস্তে নিহত হইতে শ্রেয়ঃ জ্ঞান করি; আমাদের আত্মীয়বর্গকে স্বহস্তে সংহার করিতে হইবে, এই চিন্তায় আমার হস্ত পদাদি অঙ্গসমূহ অবশ হইয়াছে। এই বলিয়া তিনি হস্তস্থিত গাণ্ডীব দূরে নিক্ষেপ করিয়া রথোপার বসিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। অনন্তর কৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বলুন, আমার জন্য মঙ্গলের কার্য্য কি?

কৃষ্ণের প্রদত্ত উত্তর এই গ্রন্থে বর্ণিত সুললিত বিষয়—'ভগবানের গীত' বা ভগবদ্গীতা' বলিয়া কথিত হয়; ভারতীয় সাহিত্যের মধ্যে তাহা অতি পবিত্র বলিয়া বিবেচিত। বাস্তবিক তাহা সুললিত ও মনোহর ভাষায় লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহার সন্দেহ নাই। এই কাব্যগ্রন্থে বর্ণিত বিষয় ও ভক্তিমার্গের মত প্রায় ১৫০০ বৎসরাধিক কাল ভারতবাসীর মন অধিকার করিয়া রাখিয়াছে। স্বস্ব জাতির কর্ত্তব্যকর্ম্ম ও আত্মীয় বন্ধু-বান্ধবের কর্ত্তব্যকার্য্য সাধনার্থ তন্মধ্যে বিশেষ শিক্ষা প্রদত্ত হইয়াছে। অর্জ্জুন যোদ্ধৃশ্রেণীর পুরুষ বলিয়া যোদ্ধার কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে তাঁহাকে বিশেষ আদেশ দেওয়া হইয়াছে। যুদ্ধের শোচনীয় পরিণামফল বা আত্মীয়দের নিধনকার্য্য তাঁহাকে স্বহস্তে সাধন করিতে হইবে, তাহার কোন চিন্তা না করিয়া যুদ্ধকার্য্যে ব্রতী হইতে তাঁহাকে বারম্বার আদেশ করা হইয়াছে।

সমস্ত কাব্যখানি তিন প্রকরণে, ও প্রত্যেক প্রকরণ ছয় ছয় অধ্যায়ে বিভক্ত ও তন্মধ্যে সর্ব্বসমেত ৭০০ পদ রচিয়াছে। প্রত্যেক প্রকরণের দার্শনিক শিক্ষা কিছু কিছু পৃথক আকারে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। প্রথম প্রকরণে বিশেষরূপে যোগদর্শনের উপকারিতা বর্ণিত আছে, ইহাতে বৈরাগ্য ও আত্মসংযম-কার্য্যের বিধি রহিয়াছে; বিশেষতঃ তৎসঙ্গে মনুষ্য স্ব স্ব জাতীয় কর্ত্তব্য পালনে যেন পরাঙ্মুখ না হয়, অথচ আত্মদমনের মুখ্য উদ্দেশ্য ও বাঞ্ছনীয় বিষয় যে নিজের পৃথক ব্যক্তিত্বের বিনাশ সাধন পূর্ব্বক

সর্ব্বপদার্থে ঈশ্বর দর্শন ও ঈশ্বরে সর্ব্বপদার্থ দর্শন করিতে হয়, তৎপ্রতি মনোযোগী হইতে শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে।

অর্জ্জুন স্বজনবর্গের বিনাশকার্য্য সাধন করিতে সন্তপ্ত হইয়াছিলেন; কিন্তু কৃষ্ণ প্রমুখাৎ জীবাত্মার চির-অস্তিত্ব সংবাদ শুনিয়া সান্ত্বনা প্রাপ্ত হন। তদ্বিষয়ে কৃষ্ণের উক্তি এইরূপ:—

"বিজ্ঞ পুরুষেরা মৃত বা জীবিত ব্যক্তিদের জন্য শোকসন্তপ্ত হন না। আমি, তুমি বা তাহারা কখন ছিলাম না, এমন কোন কাল নাই, এবং আমরা সকলে বর্ত্তমান থাকিব না, এমন সময়ও কখন হইবে না। যেমন দেহী জীবাত্মা শৈশব, যৌবন ও বার্দ্ধক্যের মধ্য দিয়া শীঘ্রই গত হয়; তাদৃশ তাহা অন্য অন্য আকৃতির মধ্য দিয়াও চলিয়া যাইবে, তজ্জন্য কোনরূপ শোক প্রকাশ করার আবশ্যক নাই। সুখদুঃখে, শীতউত্তাপে যাঁহার ভেদাভেদ নাই, তিনি অমরত্বের যোগ্য ব্যক্তি। যাহা ছিল না, তাহার অস্তিত্ব হইতে পারে না; যাহা আছে, তাহার বিলয় নাই। নিশ্চিত জানিয়া রাখ, এই বিশ্ব ব্যাপিয়া যে পুরুষ আছেন, তিনি অবিনাশী, কে অবিনাশ্যের বিনাশ সাধন করিতে সক্ষম? অনন্ত, অননুসন্ধেয়, অমর আত্মাকে ঘেরিয়া আছে যে দেহ, তাহার পতন আছে। কিন্তু যে ভাবে, আত্মাকে বিনষ্ট করিতে পারে, বা যে আপনাকে আত্মার বিনাশকারী গণ্য করে, তাহারা উভয়েই ভ্রান্ত। তাহা বধ্য নয়, তাহার জন্ম নাই, কদাচ মরেও না। তাহার সমক্ষে অতীত বা ভবিষ্যৎ নাই। তাহা অস্পৃষ্ট, অপরিবর্ত্ত্য, অসীম। ইহা জানিয়া কে তাহার বিনাশ সাধনে সক্ষম হইতে পারে। মনুষ্য যাদৃশ নূতন বসন পরিধান করণ মানসে পুরাতন জীর্ণ বসন পরিত্যাগ করে, তাদৃশ আত্মা নিজ জীর্ণ দেহ পরিহার পূর্ব্বক নূতন দেহ ধারণ করে। তীরে তাহা বিদ্ধ হয় না, অগ্নিশিখা তাহা ভস্ম করিতে পারে না, জলে সিক্ত হয় না, অথবা অনলোত্তপ্ত মরুৎ তাহা শুষ্ক করে না। তাহা অবিনাশ্য, উত্তাপে বা আর্দ্রতায় অবিকৃত, অনন্ত, দৃঢ়, অচল ও নিত্যস্থায়ী, অথচ অস্পৃশ্য, বোধাতীত, অক্ষয়, অমর ও চিন্তাতীত।"

পুস্তকের দ্বিতীয় ও ষষ্ঠ অধ্যায়ে যোগসাধন করিবার অথবা পরমপুরুষের উপর মনের একীকরণ পূর্ব্বক এতদূর নিবিষ্ট হইবার উপদেশ দেয়, যতক্ষণ সমস্ত অন্য চিন্তাবর্জ্জিত হইয়া পূর্ণ শান্তির সহিত পরমাত্মাতে নিমগ্ন না হয়। এখানে কৃষ্ণকে ঐ পরমপুরুষ বলা হইয়াছে। যোগী পুরুষের গুণ ও অবস্থা এইরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে:—

সাধু যোগী কূটস্থ হইয়া দণ্ডায়মান থাকেন। তিনি পার্থিব ও পারমার্থিক তাবৎপ্রকার জ্ঞান-সম্পন্ন হইয়া ক্ষুধা ও ইন্দ্রিয় সংযত করিয়াছেন; তাঁহার সমক্ষে মৃত্তিকা, প্রস্তর ও সুবর্ণে কোন পার্থক্য নাই; শত্রুমিত্র, ভাল মন্দ, আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, স্বপক্ষ বিপক্ষের বিশেষত্ব নাই; তিনিই পরমাত্মার সহিত সাযুজ্যলাভ করিয়াছেন। যিনি সাযুজ্যলাভের প্রয়াসী হন, তাঁহাকে খাদ্য, নিদ্রা, জাগরণ, কার্য্য, পরিশ্রম, পরিভ্রমণাদি সর্ব্ব-বিষয়ে মিতাচারী হইতে হয়; আপনার সমস্ত সম্পত্তি ও বাসনায় জলাঞ্জলি দিয়া প্রগাঢ় ধ্যানযোগ সহকারে ঈশ্বরের অন্বেষণ করা উচিত। এতদ্ভিন্ন আসন, উপবেশন, অঙ্গ সংস্থাপন, মন ও ইন্দ্রিয়াদির বশীকরণের আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে।

এই কাব্যের দ্বিতীয় ভাগে বিশেষরূপে বেদান্ত-প্রতিপন্ন অদ্বৈতবাদ শিক্ষার উপর বেশী জোর দেওয়া হইয়াছে। কৃষ্ণ আপনাকে এই বিশ্ব-পরিব্যাপ্ত আত্মারূপে বর্ণনা করেন, যিনি সকলের মধ্যে অবস্থিত হইয়া সমস্ত ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন:—

হে অর্জ্জুন, তুমি ভোজন পান, দান, বলিদান, শোক, তাপ, যাহা কিছু কর, সমস্তই আমার উদ্দেশে সাধন কর; আমিই সেই অনাদি প্রাচীন পুরুষ, সমস্তের ধারণকর্ত্তা, সমস্ত পদার্থের অনন্তকালীন বীজস্বরূপ; জনক, জননী, পতি ও পূর্ব্বপুরুষের জীবন হইয়া রহিয়াছি। নয়ন ও মুখ চারিদিকে ফিরাইয়া সমস্ত বিশ্ব আমি পর্য্যবেক্ষণ করিতেছি। প্রজ্ঞা হইয়া সকলের অন্তরে অবস্থিতি করি, সাধুর হৃদয়ে আমি সৎ হইয়া রহিয়াছি, আমি চিরকালের আদি, মধ্য ও শেষ, সকলের জন্ম ও মৃত্যু

আমি। আমার এক অংশে আমি সকলের সৃষ্টি করিয়াছি। পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, ব্যোম, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার আমার এই অষ্টবিধ প্রকৃতি, কিন্তু এগুলি আমার নিকৃষ্ট প্রকৃতি, আমার অন্য উৎকৃষ্ট প্রকৃতি চৈতন্য, যদ্দ্বারা এই বিশ্বরাজ্য রক্ষিত ও ধৃত রহিয়াছে।

১০ম অধ্যায়ে কৃষ্ণ এইরূপে আত্মপরিচয় দেন :—

"আমি দেবগণের মধ্যে ইন্দ্র, যক্ষ ও রক্ষদের মধ্যে ধনেশ্বর, নাগদের মধ্যে আমি অনন্ত। সজীব ও নির্জীবদের মধ্যে আমা ছাড়া কিছুই নাই।"

আমার উপর নির্ভর করিলে অধম ও নীচ জাতীয়েরাও (নারী, বৈশ্য, শূদ্র, ইত্যাদি) পরমসুখের পথে আনীত হয়, তবে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ ও তোমার (অর্জ্জুন) তুল্য সাধু সৈনিক ক্ষত্রিয় কত অধিক পরিমাণে তাহা পাইতে যোগ্য হইবে? তুমি শোকার্ত্ত হইও না, আমিই তোমাকে সমস্ত পাপ হইতে উদ্ধার করিব। আমার উপর বিশ্বাস রাখ, আমার পূজা ও আরাধনা কর ও ধ্যানে আমাতে সংযুক্ত থাক। এইরূপে, হে অর্জ্জুন, তুমি আমার নিকটে আসিতে সক্ষম হইবে, আমার অত্যুন্নত বাসস্থানে উঠিতে পারিবে। তথায় সূর্য্য চন্দ্রের কিরণের প্রয়োজন নাই, আমারই তেজে তাহারা দেদীপ্যমান হইয়া থাকে।

ইহার একাদশ অধ্যায়ের নাম 'বিশ্বরূপ দর্শন।' অর্জ্জুন কৃষ্ণ প্রমুখাৎ তাঁহার বিশেষ পরিচয় পাইয়া সবিস্ময়ে সারথীকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিতেছেন :—

হে মহাপরাক্রান্ত প্রভো, আপনার নিগূঢ় তত্ত্ব এবং নিত্য-স্থায়ী আত্মার সহিত আপনার একত্বের পরিচয় দিয়া আপনি আমার মায়ারূপী কুজ্ঝটিকা নাশ করিয়াছেন, এক্ষণে আপনার দিব্যমূর্ত্তি আমার প্রত্যক্ষ করুন, যদি সাহস পূর্ব্বক তাহা দেখিতে সক্ষম হই।

প্রত্যুত্তরে কৃষ্ণ বলিলেন,—

হে পাণ্ডুতনয়, তুমি মানব-চক্ষে আমার দিকে দৃষ্টি করিতে সক্ষম হইবে না; আমি তোমায় দিব্য দর্শন দিতেছি, আমাকে

শত সহস্র আকারে, মূর্ত্তিতে, বর্ণে ও অসংখ্য ভঙ্গিতে পরিদর্শন কর।

এই বলিয়া কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে আপনার অপরূপ রূপ দর্শন করাইতেছেন ; যথা,

"পরাক্রান্ত প্রভু অসংখ্য মুখ, অসংখ্য চক্ষু, সর্ব্বদিকে ব্যাপ্ত, অগণ্য মুখমণ্ডল, অসংখ্য আশ্চর্য্য মূর্ত্তি বিশিষ্ট, স্বর্গীয় বসন, ভূষণ, মালাশোভিত, ও স্বর্গীয় সুগন্ধপূর্ণ হইয়া দণ্ডায়মান হইলেন, তাহাতে সহস্র সূর্য্যের রশ্মি ও সমস্ত বিশ্বরাজ্যের প্রভা যাবতীয় দেবগণের ঈশ্বরে সমীকৃত হইল।"

অর্জ্জুন স্বীয় সারথীর ঈদৃশ অপরূপ রূপ দর্শন করিয়া বিস্ময় ও ভয়াকুলিত চিত্তে, রোমাঞ্চিত শরীরে, করযোড়ে, সসম্ভ্রমে কহিতে লাগিলেন :—

হে জীবমাত্রের পরাক্রান্ত প্রভো, আমি তোমার অসংখ্য মূর্ত্তি সন্দর্শন করিলাম, চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত তোমার নির্ম্মল জ্যোতিঃরাশি অবলোকন করিলাম। সূর্য্য সদৃশ সগৌরবে তুমি স্বর্গ ও পৃথিবী পরিপূর্ণ করিয়া অবস্থান করিতেছ, তুমি অমিত, অসীম ; আদি, মধ্য ও অন্ত বিহীন, অবিনাশ্য বিধাতা, সনাতন পুরুষ। তোমার এই সুমহৎ, অবর্ণনীয় আকৃতি দর্শনে ত্রিজগৎ ভয়াকুলিত হইয়াছে। হে দেবাদিদেব, অনুকম্পা কর ; তোমার মহিমার সম্মুখে বিশ্ব বাস্তবিকই চমকিত হইয়াছে, যোগ্যরূপে তব সমীপে প্রণত হইতেছে। তুমি সমীপস্থ হইলে মন্দাত্মাগণ আকাশের বায়ুরাশিতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। সিদ্ধগণের মণ্ডলী তোমায় পূজা করে। তুমি আদি স্রষ্টা, দেবগণের প্রভু, প্রাচীন পুরুষ, বর্ত্তমান অবর্ত্তমান সকলের আধার, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বপরিচিত, সকলের ধারণকর্ত্তা, তুমিই সব। প্রবলা স্রোতস্বতীগণ যেরূপ বারিধির সহিত আসিয়া মিশ্রিত হয়, পৃথিবীর বীরাগ্রগণ্যগণ তাদৃশ তোমাতেই আসিয়া বিলীন হয়। * * * * * আমি তোমার গৌরব অজ্ঞাত থাকিয়াই তোমাকে বন্ধু সম্বোধন করিতে দুঃসাহস করিয়াছি, বিনয় করি, আমার মার্জ্জনা কর। আমার কথা কহনে, যে সকল ত্রুটি হইয়াছে,

তাহা মার্জ্জনা কর, আমার সমতুল্য বন্ধু ভাবিয়া তোমায় সম্বোধন করিয়াছি। তুমি দেবগণের অতুল্য ঈশ্বর, তোমার চরণে প্রণত হইয়া পড়িতেছি। তুমি সজীব, নির্জীব সকলের জনক, আমার প্রতি সদয় হও; পিতা যেরূপ পুত্রকে সহ্য করেন, অথবা দয়ালু ব্যক্তি প্রতিপাল্যকে যেরূপ বহন করেন, আমাকে তাদৃশ অনুকম্পা কর। আমি তোমার স্বরূপ সন্দর্শন করিলাম, হে মহাপ্রভো, সদয় হও, বিশ্ববিধাতা, আর একবার তোমার মানবমূর্ত্তিতে আমার সম্মুখীন হও।

অর্জ্জুন ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম যেন পালন করেন, এজন্য কৃষ্ণ তাঁহাকে উত্তেজক বাক্যে কহেন, পরিণামফলের বিষয় বিবেচনা না করিয়া তোমার জাতীয় ধর্ম্ম পালন করিতে তৎপর হও। তোমার নির্দ্দিষ্ট কার্য্য সাধন কর, ও প্রত্যেক কার্য্যে আমার আনুকূল্য প্রার্থনা কর; মন, প্রাণ আমাতে অর্পণ করিয়া কর্ত্তব্য সাধনে প্রবৃত্ত হও, তখন তুমি আপনার ফল পাইবে ও যাবতীয় ক্লেশ হইতে মুক্ত হইবে।

অর্জ্জুনের প্রদত্ত উত্তর পুস্তকের ঐতিহাসিক অংশের সমাপ্তি বলিয়া বিবেচিত হয়; যথা,

হে অনন্ত প্রভো, তোমার মহিমা এইমাত্র দর্শন করিয়া আমার মনের সমস্ত মায়া অন্তর্হিত হইয়াছে, তোমার দয়ায় আমার বিবেক পরিষ্কৃত হইয়াছে, এক্ষণে তোমার আদেশ শিরোধার্য্য করত নির্ভয়ে সমর সজ্জা করিতেছি।

কৃষ্ণ আপনার সম্বন্ধে অর্জ্জুনকে আরও বলেন, অনেকবার আমার জন্ম হইয়া গিয়াছে, তোমারও বহুবার জন্ম হইয়াছিল, আমি সে সকলই জানি, কিন্তু তুমি তাহা জান না। ধর্ম্ম স্থাপন ও অধর্ম্ম নাশ করিতে আমি সময়ে সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকি। জ্ঞানী ব্যক্তি সমস্ত ধন অপেক্ষা আমাকে প্রিয় জ্ঞান করেন, এমন জ্ঞানী আমারও প্রিয়। কিন্তু অজ্ঞান, অবিশ্বাসী ও সন্দেহী জন নিতান্ত বিনষ্ট হয়। আমি মানবজন্ম গ্রহণ করিলে ভ্রান্ত মনুষ্যগণ আমাকে তুচ্ছজ্ঞান করিয়া থাকে। সমস্ত বেদে আমার পরিচয় পাওয়া যায়।

কাব্যের তৃতীয় প্রকরণের দুইটী অধ্যায়ে বিশেষরূপে সাঙ্খ্য ও বেদান্ত দর্শনদ্বয়ের শিক্ষা একত্র সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। বিশ্বের আদি ও মূল স্বরূপে পরমাত্মার অস্তিত্ব ইহাতে স্বীকৃত হইয়াছে, তাঁহা হইতে প্রকৃতি ও পুরুষ অর্থাৎ মূল ও নিত্য পদার্থ (Element) ও আত্মা উভয় নির্গত হইয়াছে। ইহাতে পৃথক পৃথক আত্মা ও শরীর এবং সমস্ত সচেতন জগৎ প্রকৃতি হইতে বিকাশপ্রাপ্ত হইয়াছে, এরূপ শিক্ষা দেয়। এই বিকাশ-প্রাপ্তি সাঙ্খ্য দর্শনানুযায়ী বুদ্ধি, অহঙ্কার প্রভৃতি পঞ্চ সূক্ষ্ম উপাদান ও পঞ্চ স্থূল উপাদান এবং মন সমেত একাদশ ইন্দ্রিয়ের নিয়মিত প্রক্রিয়া দ্বারা সাধিত হইয়াছে।

অর্জ্জুনকে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে প্রবৃত্ত করণার্থে কৃষ্ণ যে যুক্তি প্রদর্শন করেন, তাহা যে ভ্রান্তি-সঙ্কুল, তাহা সহজেই উপলব্ধ হয়; মনে কর, যদি কোন নরঘাতক বিচারকের সম্মুখে আত্ম দোষ স্বীকার করিয়া কৃষ্ণের উক্তি লইয়া বলে, "নরহত্যাই অসম্ভব, জীবাত্মা হনন করিতে বা হত হইতে পারে না, কারণ তাহা অবিনাশ্য, এক দেহ হইতে বিতাড়িত হইয়া তাহা দেহা-ন্তর গ্রহণ করে, মৃত্যু বা জন্ম কিছুই নয়।" বিচারক কি নরঘাতকের এই যুক্তি অনুসারে তাহাকে নির্দ্দোষী গণনা করি-বেন? কখন না। গীতার ঈশ্বর মানব অর্জ্জুনের জন্য যে নীতি প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা অপর মানবের পক্ষেও পালনীয় হইলে কিরূপে মানবসমাজ রক্ষিত হইতে পারে? নরঘাতক গীতার উক্তিসমূহ লইয়া বৃথা শব্দাড়ম্বর করিতে পারে, সুললিত ভাষায় অযথা যুক্তি প্রদর্শন করিতেও পারে; কিন্তু সমাজের নৈতিক জ্ঞান অনুসারে সকলেই তাহাকে দণ্ডনীয় বলিয়া নিরূ-পণ করিবে, সন্দেহ নাই।

গীতার শিক্ষানুসারে ঈশ্বরই জগতের প্রাণ, ইহার উপাদান ও নিমিত্ত কারণ; বিশ্ব তাঁহার দেহ, তাঁহাদ্বারা ও তাঁহাতেই রচিত হইয়াছে। এই মতানুসারে ঈশ্বরই সকল বস্তু ও সকলেতে আছেন, পদার্থমাত্রেই তাঁহার অংশ ও সমস্ত কার্য্যই তাঁহার কৃত; সমুদয় কাব্যখানি এই শিক্ষাতে পূর্ণ। অতি নিকৃষ্ট

প্রাণীও কেবল যে ঈশ্বরের সৃষ্ট তাহা নয়, কিন্তু ঈশ্বরের ভৌতিক আকৃতির অংশ বলিয়া ঐশ্বরিক। মনুষ্যেরা যে সকল অতি অধম দুষ্কার্য্য করে, তাহা স্ব স্ব ইচ্ছা ও স্বাধীনতার কার্য্য ভাবিলেও তাহা গীতার ঈশ্বরের অনুমোদিত কার্য্যমাত্র নহে, বাস্তবিক তাঁহারই কৃত কার্য্য, যেহেতু তাঁহারই শক্তি ও ইচ্ছাতে তৎসমুদয় কার্য্য সাধিত হয়, ও কার্য্যের সাধনকর্ত্তা তাঁহারই অংশ। গীতার শিক্ষানুসারে পরমপুরুষের কার্য্যে পাপ ও পুণ্যের মধ্যে ভেদাভেদ নাই। যাহা পাপ বলিয়া বোধ হয়, তাহা পরমপুরুষের লীলা ভিন্ন আর কিছুই নয়। এই বিষময় শিক্ষা দ্বারা হিন্দু আপন পাপ-ভারাক্রান্ত বিবেকের তাড়না হইতে শান্তিলাভ করিতে যত্নবান হইয়াছে; পাপের শাস্তি এড়াইবার জন্য সকলই ঈশ্বরের কার্য্য বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছে। এই মত তাহাদের পক্ষে মিথ্যার আশ্রয় স্থান হইয়াছে, ইহাতে আশ্রিত হইয়া সর্ব্বপ্রকার মারাত্মক পাপকার্য্য ঈশ্বরানুমোদিত স্বীকার করিয়া ঈশ্বর ও মানব, পাপ ও পুণ্য, পবিত্রতা ও অপবিত্রতা, স্বর্গ ও নরকের মধ্যে কোন বিভিন্নতা নাই, এই বুঝিয়া আপন আপন বিবেক ও আত্মাতে শান্তিলাভ করিতে অমূলক প্রত্যাশা করে।

ভগবদ্গীতায় পরস্পর-বিরুদ্ধ অনেক কথা পাওয়া যায়, এজন্য বহু-ঈশ্বর-বাদী, দ্বৈতবাদী, অদ্বৈতবাদী ও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী ব্যক্তিগণ পরস্পর বিরোধী মতাবলম্বী হইলেও গীতা হইতে আপন আপন মতের সমর্থন করিতে পারিয়াছেন।

ভগবদ্গীতার মধ্যে এমন অনেক বাক্য দৃষ্ট হয়, যাহা নূতন নিয়মের সহিত মিলে। ডাক্তার লরিন্সার অধ্যাপক ওয়েবার (Dr. Lorinser, Professor Weber) প্রভৃতি সংস্কৃত সাহিত্যানুরাগী পণ্ডিতগণ বোধ করেন, বাইবল হইতে অনেক কথা ইহার মধ্যে গৃহীত হইয়াছে। তৃতীয় শতাব্দীর মধ্যেই ভারতবর্ষে বাইবল শাস্ত্র আনীত হইয়াছিল, এবং ভারতের অনেক স্থানে খ্রীষ্টীয়ান লোকেও বাস করিত, এমন প্রমাণ বিদ্যমান আছে। ইহা কোন মতেই অসম্ভব নয় যে, খ্রীষ্টীয়

ধর্ম্মশিক্ষা বিকৃত ভাবে হিন্দুধর্ম্মের মধ্যে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে; ও চিন্তাশীল হিন্দু দর্শনবেত্তাদের মনোভাব অনুসারে তাহা আবার বিশেষরূপে সুসজ্জিত আকার ধারণ করিয়াছে। তদ্ভিন্ন জগতের ধর্ম্মপ্রণালী সকল যতই ভ্রষ্টাবস্থায় উপনীত হউক না কেন; প্রত্যেকের মধ্যেই সত্যের কিছু কিছু নিদর্শন রূপান্তরিত অবস্থায় দৃষ্ট হয়; হিন্দুধর্ম্মের মধ্যেও এমন অনেক উপদেশ ও শিক্ষা দেখিতে পাওয়া যায়। রোমীয় দর্শনবেত্তা সেনেকা, এপিক্‌-টিটুস্‌, মার্কস্‌ অরিলিউস্‌ প্রভৃতির লেখাতেও এরূপ সাদৃশ্য বাহুল্যরূপে দৃষ্ট হয়। খ্রীষ্টীয় শিক্ষা হিন্দু ধর্ম্মের মধ্যে বিকৃতভাবে কতদূর আশ্রয় পাইয়াছে, তাহা আমরা নিশ্চিত বলিতে না পারিলেও, ইহা ত নিতান্ত সত্য কথা যে, হিন্দুধর্ম্ম বিস্তৃত মহাসমুদ্র তুল্য, ইহাতে নানা দিক দিয়া বহুসংখ্যক ধর্ম্মরূপ স্রোতস্বতী আসিয়া ইহাকে এমন বহুরূপী করিয়া তুলিয়াছে যে, সকল ধর্ম্মেরই কোন না কোন অবয়ব ইহার মধ্যে পাওয়া যায়। এই সুযোগ অবলম্বন করিয়া দেশীয় বা বিদেশীয় যে সে ব্যক্তি হিন্দুধর্ম্মের দোহাই দিয়া স্বকপোল-কল্পিত কোনও রূপ ভ্রষ্ট শিক্ষার প্রতি অধীন-চেতা হিন্দুর মন অনায়াসে আকর্ষণ করিতে সক্ষম হয়।

সমাপ্ত।